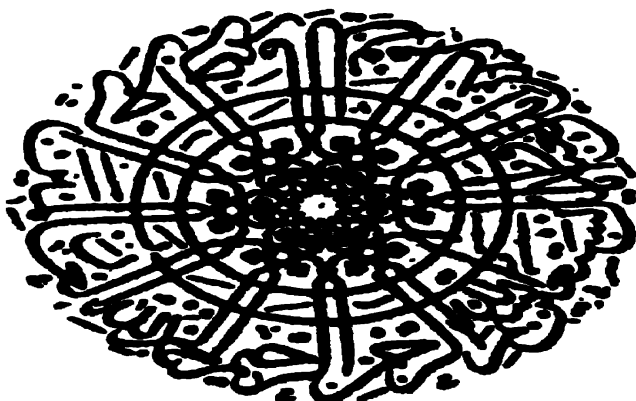


বিসমিল্লা-হির-রহ-নির-রহীম

পরম করুণাময় কৃপাণিধান আল্লাহার নামে
আরম্ভ করছি

সাহিত্য সমাজনদীর প্রশান্ত সলিল
জীবনের সুক্ষ্মাতীত বাস্তব দলিল।
এ বিশ্ব বিচিত্র ফুলে সাহিত্যবাগান
বিশ্বের বিশুদ্ধ ফুল পবিত্র কোরয়ান।
দেখিয়া ফুটন্ত ফুল প্রিয়তমা প্রিয়া
হৃদয় ফুলেরই ন্যায় উঠে বিকশিয়া।
ও-ফুলে ভ্রমর-রূপে সম চিত্ত মন।
আলিঙ্গন আহরণে রহে অনুক্ষণ।

ইসলামি সাহিত্য

যে কলম বক্ষে নিয়ে জগৎ মহত্ত্ব
কালের গতিকে দিয়ে চরম গুরুত্ব
নূতন পদক্ষেপে রাখিয়া বীরত্ব
অন্তরে আন ক'রে ইসলামি তত্ত্ব
আগাতে সাহায্য করে সকলে সতত—
সে-লেখা সর্বকালের ইসলামি সাহিত্য।

যে-কলম করিল দান মানবে মাহাত্ম্য
যে-কালি প্রতিষ্ঠা করে শান্তি-সত্য,
যে-কলম সুন্দর যাহা করিয়া স্বীকার
ধরিল-সমাজ বুকে গতি-দুর্নিবার।

যে-কলম আপসহীন আল্লার একত্বে
দাঁড়াল বীরের বেশে আপন কীর্তিতে
ঘুঁচাতে অন্ধরাশি রহিল জাগ্রত
সে -কলম বিশ্ববুকে ইসলামি সাহিত্য

যে-কলম আল্লার দান বুঝিয়া গুরুত্ব
রাখিল কালির মান কলসে সতীত্ব
সমগ্র জীবন জুড়ে সকাল ও সন্ধ্যা
রচিল গাহিল গান—লা-শরীফ আল্লাহ্।
যে -কলম উদয় দেখে, জানে না অস্ত
শাশ্বত সে কলম, 'ইসলামি সাহিত্য'।

—কাব্যকানন

ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি

আবু কাশ্‌শাফ্‌ ইব্‌নে ইউনুস

ডক্টর ওস্‌মান গনী, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট্‌
বিভাগীয় প্রধান
অধ্যাপক, ইস্‌লামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগিতায়
শওকৎ আরা গনী (সেতারা)।

রত্নাবলী

১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন ❑ কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২৪১-৮১২

প্রচ্ছদ শিল্পী
সোমনাথ ঘোষ

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২৪১-৬৯৮৯



জে. এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
দূরভাষ : ২৪১-৬৪৭০/২৪১-৭৫১৯

মুদ্রণে
নিউ রেনবো ল্যামিনেশন
৩১এ, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২৪১-২৯০৯

উৎসর্গ

দানবীর হাজী আতর্ আলী (রহঃ) (১৮৭১-১৯৪৩ খ্রীঃ)

(পাণ্ডুয়া সুলতানিয়া হাইমাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ—১৯৩৭ খ্রীঃ)

আল্লার আদেশ নবীর ফরমান্
শিক্ষনীয় সকল খাতে
যেথায় থাকো, সেথায় করো
জ্ঞান আহরণ দিনে রাতে।
বালক-বালিকা নাই ভেদাভেদ
পুরুষ-রমণী নির্বিশেষে
জ্ঞান আহরণ 'ফরজ্' হলো
সর্বকালের সকল দেশে।
জগৎসভায় পেতে আসন
মেনেছি মেরাতির ফরমান্
তুমি আল্লাহ্ বিজ্ঞানময়
বৃদ্ধি করো মোদের জ্ঞান।
সারা বিশ্বের দাতা তুমি
জ্ঞান জগতে দাও বৃদ্ধি
জ্ঞানই যখন মহাসম্পদ
জ্ঞান গরীমায় চাই সিদ্ধি।
নবীর প্রিয় কাজটি ছিল
'জ্ঞান বিতরণ, কলম ও কালি'
সেই নবীকে সম্মান দিলেন
দানবীর হাজী আতর আলী।
জাতির ভাগ্য জাতিরই হাতে
কেহ দিবে না তার উত্থান।
বুঝিয়া নবীর দর্শন ভেদ
গড়লে তুমি প্রতিষ্ঠান।
আপন দৌলতে বিলিয়ে দিয়ে
মানলে নবীর মহা ফরমান।
জ্ঞান-জগতের অবসর প্রদীপ
জ্বাললে যাহা অনির্বাণ
তোমার তরে করছেন দোয়া
সিদ্ধ সূফী শাহ সুলতান
বেহেস্তী তুমি, তোমাকে আল্লাহ
ফেরদৌসে দিলেন স্থান।

ভূমিকা

দূর অতীতের বহু স্মৃতিবিজড়িত কাজ ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি হাতে পড়েছিল। থিসিস জমা দিয়ে পি-এইচ.ডি পাওয়ার পর স্বর্গত মাস্টার মশাই আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আচার্য সুকুমার সেন আমাকে বললেন, কাজটা পরে ছেপে দিও। তাঁদের কথা মাথাতে ছিল সর্বক্ষণ। দীর্ঘদিন পর ছাপার জন্য কাজটি হাতে নিলাম। আজকের দিনে এই ধরনের গবেষণামূলক বিশাল পাণ্ডুলিপি ছাপা যে কোন প্রকাশের জন্য কষ্টকব। তাই বাধ্য হলাম মুসলিম পুঁথি সাহিত্যের বিশাল অধ্যায়টিকে বলতে গেলে বিন্দুতে আনতে। অথচ ওই অধ্যায়টিই ওই যুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যের দেহ ও প্রাণ দুই-ই। সুযোগ পেলে মূল গ্রন্থ পরে ছাপা যাবে।

বাংলার মুসলিম পুঁথি সাহিত্য সেদিনের সমাজ জীবনের একটি অপূর্ব ছবি তুলে ধরেছে। এ সম্পর্কে পূর্বাভাসে দুধের স্বাদ কিছুটা ঘোলে মেটাবার চেষ্টা করেছি। গ্রন্থমাঝেও কিছু আলোচনা আছে। এখানে একটি কথা সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে যাবো, এই গ্রন্থটি একটি বিলুপ্ত প্রায় যুগের বেদনাবিধুর সঠিক স্মৃতি নয়, স্মৃতির প্রহরী মাত্র।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যাঁদের সরাসরি সাহায্য পেয়েছিলাম, তাঁদের আজ কেউ নেই। তাই ভাব হৃদয়ে কামনা করি তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি। যারা আজ পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও ভাইপো—সেতারা-মণি-চুনি ও মন্টু।

'রত্নাবলী'-র সুনীল ভট্টাচার্য এবং সুমন চট্টোধ্যায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বইটি ছাপাতে এগিয়ে এসেছেন। তাদের জানাই আন্তরিক মুবাবকবাদ। হে আল্লাহ্ তুমি তাদের মাথাতে 'রহমত' দিও, রুণিতে 'বরকত' দিও। সবশেষে বলি—সব প্রশংসাই তোমারই।

ওসমান গণী

সূচীপত্র

অবতরণিকা

আমার এই কাজের পেছনে যদি কোনও মূল লক্ষ্য বা মহৎ উদ্দেশ্য থেকে থাকে, তা এক হতে একাধিক। বাংলা ভাষার দুর্দিনের ইতিহাসটি ও তার দুঃসময়ের সকরুণ কাহিনীটিকে সুদিনের প্রাঙ্গণে একবার তুলে ধরা। নচেৎ বাংলা ভাষার ইতিহাসের অবমূল্যায়ন ও অমর্যাদা করা হয়। মনে রাখতে হবে যে কোনও জিনিসের ইতিহাস—ইতিহাসই। সে দুর্দিনের হোক বা সুদিনের হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। বিকৃত বা খণ্ডিত ইতিহাস, ইতিহাসই নয়। ইসলামি বাংলা সাহিত্য ব্যতীত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস খণ্ডিত ও বিকৃত ইতিহাস।

দ্বিতীয়, দূর অতীতের ইসলামী বাংলা সাহিত্যের অধুনা বিস্মৃতপ্রায় যে বিশাল ধারাটি একদিন বাংলাভাষার মরা গাঙ্গে বান এনেছিল, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিপুল সংখ্যক জনগণের রস-পিপাসা নিবৃত্ত করেছিল, তা আমাদের দূর ভবিষ্যতের প্রজন্মরা একটু-আধটু জানার সুযোগ পাক। সুদূর অতীতে তাঁদের প্রপিতামহরা কিরূপ সাহিত্য রচনা করতেন, কি ভাবে সান্ধ্য-আলো জ্বেলে দিয়ে অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় দালিজ বাড়ি ও বৈঠকখানা বাড়িতে তা শোনার জন্য সাগ্রহে সকলেই একত্রিত হতেন, বাংলা ভাষা-ভাষি ছেলে-মেয়েদের সেটা জানা তো দরকার।

বাংলার পুঁথি সাহিত্য একদিন তামাম বাঙ্গালীকে যেভাবে আনন্দদানে সহ-অবস্থানে মুগ্ধ ও মোহগ্রস্ত করে তুলেছিল, আজও তার কোন তুলনা নাই। সে এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। দিবাবসানে মানুষ পেয়েছিল শান্তি ও স্বস্তি। প্রভাতে পেয়েছিল কর্ম-স্পৃহা। জানি না, কবে আবার কোনও সাহিত্যধারা বঙ্গ-জননী তার সন্তানদের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও নিবিড় বাহু-বন্ধনে একটি স্থানে একত্রিত করবে! বঙ্গ জননীর ওই ভালবাসা, ওই শ্রদ্ধা ও স্নেহ, ওই প্রেম ও প্রীতি, ওই রাগ ও অনুরাগের স্পর্শমাখা পরিবেশ যারা একবার দেখেছে, কোন দিনই ভুলবে না, এইটাই তো স্বর্গীয় পরিবেশ। মানুষের জন্য মর্তলোকে এর চেয়ে বড় দান আর কি হতে পারে। এর পেছনে ছিল পুঁথি সাহিত্যের একক মাহাত্ম্য। যে সাহিত্যের মাহাত্ম্য মানুষকে করে মিলনসুখী। সুখে-দুখে মানুষকেই ভাই বলতে শেখায়। পরকে ঘর করে, অপরকে আপন করে, আত্মাকে করে প্রশস্ত, অন্তরকে করে উদার। তা কতই উত্তম সাহিত্য। বাংলার মুসলিম পুঁথি সাহিত্য সেই চির উত্তম সাহিত্য। ইসলামি বাংলা সাহিত্য তারই জননী স্বরূপ। এইভাবে ইসলামি বাংলা সাহিত্য একদিন জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে গড়ে তুলেছিল একটি শিশির ধোয়া শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দর পরিবেশ।

তৃতীয়, আগামী প্রজন্ম আরও জানুক। কিভাবে চাষা, চামার, চণ্ডাল, মুচি, মেথর ও ইতরের ভাষা, বাংলা ভাষাকে মুসলিম রাজা-বাদশাহগণ সরাসরি একদিনেই বীরের প্রাণ দান করলেন। বর্তমান বাংলা ভাষার উন্নতি তা অতীতের মুসলিম বিজয়ের নিকট চিরঋণী। তারা আরও জানুক, কিভাবে সেদিন এই বাংলা ভাষা যাঁদের হাতে নবজন্ম লাভ করল। তিনিই তো সম্রাট হোসেন শাহ। এই নব-জন্মেরই সোনার ফসল ইসলামি বাংলা সাহিত্য। এবং এই ইসলামি বাংলা সাহিত্যই তার আরব ও পারস্য হতে আমদানীকৃত বহু সাহিত্য সম্ভার দ্বারা জীর্ণ ও শীর্ণকায় এক-জেলে বাংলা সাহিত্য ও ভাষাটিকে বহু শাখা-প্রশাখায় একটি বিশাল মহীরুহতে পরিণত করল। এ কার দান! জান্নাতবাসী সম্রাট হোসেন শাহ।

চতুর্থ, বাংলাভাষার স্বাধীনতা ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে শুধু তখনকার রাজবাদশাহগণই নন, বর্তমান বিশ্বেও কেবলমাত্র একটি ভাষাকে কেন্দ্র করে যাঁদের দ্বারা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠল, তাঁরা তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী মুজাহিদ মুসলমান। তাঁদের ভাষা আন্দোলন চরম সফলতা লাভ করল। বিশ্ব-মানচিত্রে একটি নূতন রাষ্ট্র জন্ম নিল—বাংলাদেশ। সেদিনের মুসলমান রাজা বাদশাহ্ হতে আজকের সাধারণ মুসলমান পর্যন্ত মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার জন্য জীবন-মরণ পণে যে ত্যাগ ও তিতিক্ষা স্বীকার করলেন বিশ্ব-ভাষা-ইতিহাসে ইহা একটি নজীরবিহীন ঘটনা। আজও পর্যন্ত তা কোন অমুসলিম, কি বাঙ্গালী, কি অবাঙ্গালী কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাঙ্গালী মুসলমান বাংলা ভাষার জন্য অকাতরে প্রাণ দিল। অবলীলায় ইজ্জত দিল, তাই বাংলাভাষা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে প্রাণ পেল, ইজ্জত পেল, আব্রু পেল।

পঞ্চম, আজ সারা বিশ্বজুড়ে, যত মানুষ বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলছেন, সেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠের মর্যাদা লাভ করেছেন। (যদিও এখনও কানে পড়ে, মুসলমানরা কি বাংলায় কথা বলে!) এই সংখ্যা গরিষ্ঠের দল বর্তমানেও বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে এবং ইসলামি চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের পটভূমিকায় ইসলামি বাংলা সাহিত্যে এনেছেন রেনেসাঁস। কেননা ইসলাম চিরন্তন, চিরবহমান এবং ইসলামি বাংলা সাহিত্যও চিরচলমান।

ইসলামি সাহিত্য ও কোরআন

বিশ্ব সাহিত্য গড়ল ইরান
মরু-বেদুঈন আরব জাহান
পশ্চাতে যার জোগাল কালি
শক্তি দিল মহা কোরআন।
কোন্ নদীতে এলো জোয়ার
বিশ্ব-সাহিত্যে নূতন বাঁক্
কোন দেশেতে জাগল ওঠে
জ্ঞান জগতে মাছের ঝাঁক।
ইসলামই একা আনল ডেকে
বিশ্ব-সাহিত্যে নব-চেতনা।
নতুন দিকে নতুন পথে
বিশ্ব-পেল নব প্রেরণা।
বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কৃর্তী
স্রষ্টার দান মহা কোরআন।
ধরলো হাতে রাখলো মাথায়
আনলো বুকে এক ঈমান।
এঁরাই ছিলেন নবীর সাহাবা
নাম হলো এক মুসলমান।
কলম দিল যাঁদের হাতে
শক্তি দিল মহাকোরআন।
বিশ্ব সাহিত্য করল খাড়া
শত মনীষার অমর দান।
পশ্চাতে তার জোগাল কালি
মহানবীজীর হাদিস কোরআন।
উত্তাল যবে তরঙ্গাভিঘাত
সন্তরণে রহিব অটল
মহা সমুদ্রেও ভাসাব তরী
পাই যদি তব নিত্য-বল।
সাহিত্য হবে সর্বকালের
তোমার নামের জয় নিশান
বইবে যাহা সবার তরে
চিরদিনের চিরকল্যাণ।
ইসলাম তারে বলে না সাহিত্য
নাই যেথা কোন নৈতিকজ্ঞান
নাই যেথা কোন সংযমতা

শাস্ত্রবিহিত শৃঙ্খলাবিধান।
গড়িতে স্বদেশ তুলিতে সমাজ
করিতে মানুষ চরিত্রবান
বিশ্ব-সাহিত্যের সেরা নমুনা
আল্লার দেওয়া মহা কোরআন।
একচোখে মোর তোমার নবী
অন্য চোখে তুমি রহমান
চলছে ছুটে, চলবে ছুটে,
এই সাহিত্য চির বহমান।

—কাব্যকানন

প্রথম অধ্যায়

পূর্বাভাস

কোন সাহিত্য কখন ইসলামি

আমার স্বর্গত মাস্টারমশাই শতাব্দীর স্বনামধন্য মনীষী-গবেষক আচার্য সুকুমার সেন বলেন—'এখানে, পশ্চিমবঙ্গে, দু'জনের গবেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইসলামি বাংলা সাহিত্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে পি-এইচ. ডি. উপাধি পেয়েছেন ওসমান গনী, আর বারাসত বসিরহাট অঞ্চলের পীব প্রমুখ মহাজনদের কীর্তিগাথা নিয়ে আলোচনা করে পি-এইচ. ডি. উপাধি পেয়েছেন শ্রী গিরীন্দ্রনাথ দাস। তাঁদের গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়।'

ইসলাম : আল্লার একত্ববাদ, মানুষের মনুষ্যত্ববাদ, সমাজের সাম্যবাদ, সামাজিক শান্তিবাদ, মানুষের জীবনের (স্বাভাবিক ও সহজাত অর্থাৎ দৈহিক ও মানসিক ক্ষুধার) বাস্তববাদ।

ইসলাম : একটি মহান বিপ্লব, একটি আদর্শ আন্দোলন, অন্যায় অত্যাচার পাপাচার এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম, জীবনের ভারসাম্য রক্ষাকারী তরী, নানাদিকের মাঝে সঠিক দিক-নির্ণয়কারী যন্ত্র, সহজাত স্বাভাবিক ধর্ম, জ্ঞান আহরণে প্রকৃতির পাঠশালা, নিরাশার মাঝে আশার আলো। সুখে-দুখে মহান আশ্রয়, আত্মোন্নতির প্রথম ও শেষ সোপান, মানব-আত্মার বিলোপ ও বিলীন নয় বরং প্রকাশ ও বিকাশ, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের প্রশান্ত বুকভরা শান্তি, গোধূলি লগ্নের স্বপ্নশেষের বেলাভূমি, সবার উর্ধ্বে বিবেকের বোধোদয় এবং জীবন সংগ্রামের বড়ই হিতার্থী বন্ধু।

দেহগত : ১। কালেমা, ২। নামায, ৩। রোযা, ৪। যাকাত ও ৫। হজ।

ইসলাম : একটি মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে দেহ ও প্রাণ দুয়েরই সমন্বয়ে। একটি অন্যটি হতে সরে গেলে দুটোই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সাধারণত প্রাণটিই সরে যায়। তখন দেহ ভার বা বোঝা রূপে পড়ে থাকে। তাই কর্মক্ষেত্রে দুটোরই সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং লক্ষ্য রাখতে হবে কোনটিই যেন একাকী না হয়ে পড়ে। প্রাণহীন ধর্ম এবং দেহহীন ধর্ম কোনটিরই ইসলাম জগতে স্থান নেই।

সাহিত্য : সাহিত্য সমাজ নদীর প্রশান্ত সলিল
জীবনের সূক্ষ্মাতীত বাস্তব দলিল।—*কাব্যকানন*

সাহিত্য মানব-মনের আয়না, সমাজের দর্পণ। সমাজের পরোক্ষ ইতিহাস, সাহিত্য একটি যুগের ছবি। আমরা রবীন্দ্র সাহিত্যে, নজরুল সাহিত্যে, শরৎ সাহিত্যে সে যুগের একটি অনাবিল ছবি দেখতে পাই। সাহিত্য সমাজের দেহ স্বরূপ। একটি দেহকে দেখে একটি প্রাণী বা মানুষকে যেমন অনেকটা বোঝা যায়, অনুরূপভাবেই একটি দেশের সাহিত্যকে দেখেও সেদেশের সামাজিক অবস্থাকেও সম্যকভাবে বোঝা যায়।

নিঃসন্দেহে সাহিত্য ব্যক্তিমানুষের মনের লীলাক্ষেত্র। ওই ব্যক্তি মানুষের ভাব-অনুভাব, অনুভূতি-অনুভব সকল কিছুই প্রথম ব্যক্তিমানসে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। পরে লেখনীর মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। ওই প্রকাশ সাবলীল স্বচ্ছ ও সহজ হয়ে উঠলে সকলেরই আগ্রহের বস্তু হয়ে ওঠে। ব্যক্তিজীবনের বহিঃপ্রকাশ তখন সমষ্টি জীবনের সম্পদে পরিণত হয়।

সাহিত্য কেবলমাত্র মনের আয়না ও সমাজের দর্পণই নয়, পরিবেশ ও পরিস্থিতিরও দর্পণ। কোন্ পরিবেশে শিশু জন্ম নিল, কোন্ পরিস্থিতিতে শিশু বড় হল একথা যে-কোন কবি ও সাহিত্যিকের জীবনেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পরিবেশ-পরিস্থিতি তাকে আলোড়িত করতে থাকে। আন্দোলিত হয় তার দেহ ও প্রাণ। সমাজের বিভিন্ন ঘটনারাশি নানা তরঙ্গে তার মনের ঘাটে আছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন মনের মাঝে অন্তহীন জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হতে থাকে। এখানে পরিস্থিতি ও পরিবেশের অবদান কম নয়। তাই যে-কোন দেশের প্রকৃত সাহিত্য সেদেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতিরও স্পষ্ট ছাপ। তার জ্বলন্ত প্রমাণ বিদ্রোহী কবি নজরুল ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

সাহিত্য কি, এ সম্পর্কে শেষ কথা, সমগ্র সৃষ্টজগৎই মহান স্রষ্টার লীলাভূমি মাত্র। কোটি কোটি মানুষের মনে কতই না অযুতভাবের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু ওই ভাবের যথাযথ বহিঃপ্রকাশ ঘটে মাত্র কয়েক জনের মধ্যে। বাকি লাখে লাখে নীরব-নিশ্চুপ। তাহলে এ কেমন রহস্য। ইচ্ছা করলেই তো কবি বা সাহিত্যিক, সাধক ও সিদ্ধপুরুষ হওয়া যায় না। তাহলে কার ইচ্ছাবলে (কবি বা সাহিত্যিক বা লেখক) হওয়া যায়? তিনি কে? কোন মহাশক্তি পশ্চাতে দাঁড়িয়ে? অলক্ষ্যে বসে স্থির লক্ষ্যে এক একজনকে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কেউ কবি, কেউ সাহিত্যিক, কেউ লেখক, কেউ দার্শনিক, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ ঐতিহাসিক, আরও কত কি! বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনিই শুধু একমাত্র যন্ত্রী, বাকি সকলেই যন্ত্র। এই যন্ত্রীটিই আল্লাহ, ঈশ্বর, ভগবান বা রহমান। তাই সাহিত্যের সর্বশেষ কথা—সাহিত্য মহান স্রষ্টার অপূর্ব বহিঃপ্রকাশ ও লীলামাত্র। তিনি যাঁর দ্বারা যতটুকু করাবার করিয়ে নেন।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য :

আমরা সাধারণত বলে থাকি যে, সাহিত্য কল্পলোকের এবং সমাজ প্রাণচেতনার সহজ দোলায় দোল দেওয়া পুরুষ ও নারী হৃদয়ের দুই বৃন্তে বাঁধা দুটি সত্তা। সাহিত্যে কল্পনার লীলাবিলাস, সমাজ শাস্ত্রবিহিত শৃঙ্খলাবিধান। সাহিত্য যখন সমাজের দর্পণ, তখন সেই দর্পণটি যাতে স্বচ্ছ ও সুন্দর হয় সেটা দেখাও সাহিত্যের প্রয়োজন। অধিকাংশ সাহিত্য বর্তমান সমাজের পরিস্থিতি ও পরিবেশের জোয়ারে ও ভাটাতে বইতে থাকে। ও-গুলো সাহিত্য নয়, সাহিত্য নামের আবর্জনা। প্রকৃত সাহিত্য তাই-ই, যা দেশে নতুন পরিস্থিতি ও পরিবেশের জন্ম দেয়। যে পরিস্থিতি ও পরিবেশ দেশকে সুশৃঙ্খল সমৃদ্ধ ও উন্নত পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করে, যে সাহিত্য দেশের উত্তাল যৌবনকে সুসংহত করে, তাদের উদ্দাম শক্তিকে দেশের অগ্রগতিতে নিয়োজিত করে।

মানুষের নৈতিকতাকে অনৈতিকতার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া কোন সাহিত্যেরই উচিত নয়। প্রাক্-ইসলামি যুগে এমন অনেক সাহিত্য আরবে জন্ম নিয়েছিল, যাদের সাহিত্যগুণ অনেক উচ্চমানের, উৎকর্ষে ভরা, কিন্তু ওই সাহিত্য আরব জাতিকে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা দান করেছিল। তাদের বিশাল শক্তিকে সুপথে সুসংহত না করে বিপথে বিদীর্ণ করে তুলেছিল। খেলাধুলারও একটি উদ্দেশ্য থাকে, শরীরচর্চা। যাঁরা বলেন—Art for Arts Sake, সাহিত্যের জন্য সাহিত্য করা, মানবজীবনও মানব সমাজের জন্য একথা তো একেবারেই অর্থহীন। যে-চিন্তা, যে-কথা ও যে-কাজ উদ্দেশ্যহীন, তা তো মানবজীবনের পক্ষে খুবই অনিষ্টকারী। কেননা মানুষের জীবনে সময় বড়ই অমূল্য ধন। মৃত্যু আগত হলে বিশ্ব মিলিতভাবেও কাউকেই এক মিনিটও সময় দিতে পারে না। সুতরাং উদ্দেশ্যহীন কাজ সময় নষ্ট ব্যতীত আর কিছুই নয়।

সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষকে জীব শ্রেষ্ঠর আচরণে প্রতিষ্ঠিত করা। মানুষকে খেয়াল-খুশির দাস বানান নয়। তাকে লজ্জাহীনতার মধ্যে উলঙ্গ করা নয়ই। তাকে সু-আচরণের পোশাকে আবৃত করা। তাকে মহৎ চিন্তায় ও মহৎ বেদনাবোধে সতত উদ্বুদ্ধ করা। যে সাহিত্য এইসব মহান দায়িত্ব পালনে অক্ষম, তাকে শুঁড়িখানার মুখরোচক চাটনি ছাড়া আর কি বলব।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য থাকবে ঠিকই, তবে সাহিত্য যেন নিছক বিজ্ঞাপনেও পরিণত না হয়। এদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সাহিত্যের মূলগত উদ্দেশ্য যাই হোক, সাহিত্য-রস যেন উদ্দেশ্যের ওপর বইতে থাকে। নচেৎ সাহিত্য প্রাণহীন হয়ে পড়ে। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের উদ্দেশ্য (সন্তান) যাই হোক, মিলনের মধুরতাকে যেন উদ্দেশ্য মলিন করে না দেয়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য হোক মানব চরিত্রের উন্নতি এবং মানব চরিত্রের লক্ষ্য হোক সমাজের উত্থান। সমাজের উদ্দেশ্য হোক সর্ব মানুষের কল্যাণ এবং সর্ব মানুষের মন্ত্র হোক মনুষ্যত্বের জয়গান, মানবতার উত্তরণ। এইটাই হবে সাহিত্যের শেষ কথা। শিশুর দল দলে-দলে খেলা করে। উদ্দেশ্য থাকে মহানন্দ লাভ, নিরামিষ আনন্দ উপভোগ। এই টুকুতেই শিশুরা থাকে বিভোর। কিন্তু অভিভাবকগণ এটা জেনেও অন্তরে শান্তি পান আরও একটি অন্য কথা মেনে, শিশুরা শরীরচর্চা করছে করুক, স্বাস্থ্য ভাল হবে। অনুরূপভাবে সাহিত্য একটি সমাজচর্চা, যার ফলে সমাজ দেহটিও উন্নতি লাভ করে। মানুষের জন্য সাহিত্যের আড়ালে এ লাভটিও তো বড় লাভ।

ইসলামি সাহিত্য :

ইসলামি বাংলা সাহিত্য বা ইসলামি সাহিত্য আলোচনার পূর্বে ইসলাম কি এটা জানা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনটুকু মেটানোর জন্য এই প্রবন্ধের প্রথমে আমি সংক্ষেপে ইসলাম কি, তার একটি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এবার লক্ষ্য করব, ইসলামি সাহিত্য কি এবং তার বৈশিষ্ট্যই বা কি।

ইসলাম সত্য ও সুন্দরের পথে একটি সমুন্নত জীবন ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থাপনায় দ্বীন ও দুনিয়ার অবস্থান পাশাপাশি। এবং এই দুনিয়ার মধ্যে বৈধ যা কিছুই আছে, সে সকলকেই সাদবে বরণ করেছে। বাজনীতি-অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শাসন-প্রশাসন, বিবাহ-সংসার, আরাধনা-উপাসনা, সাধনা-গবেষণা, বিজ্ঞান, বিবিধ জ্ঞান, এককথায় এ সংসাবে বৈধ যা কিছুই আছে, সব কিছুকে নিয়েই ইসলামের জয়যাত্রা। সে শুধু প্রাণ দিয়ে বাদ সাধে ওই সাহিত্যের যে সাহিত্য উৎসাহ দেয় বিবাহে নয় ব্যভিচারে, মসজিদে নয় পতিতালয়ে, আচারে নয় অনাচাবে, শৃঙ্খলতায় নয় উচ্ছৃঙ্খলতায়, ন্যায়ে নয় অন্যায়ে, সংযমে নয় অসংযমতায়, বস্ত্রে নয় বিবস্ত্রে, পর্দায় নয় উলঙ্গ নারীদেহের আঙ্গিনায়। সুন্দর আসরে নয় অবৈধ বাসরে, যা জীবনকে একদিন নাচ-গানের মাধ্যমে, অপসংস্কৃতির মাধ্যমে নিয়ে আসে অধঃপতনের আঁস্তাকুড়ে।

মানুষ যখন আপন আচরণের মধ্য দিয়ে অধঃপতনের নিকৃষ্ট এক আস্তানাতে হাজির হয়, তখন সে হারিয়ে ফেলে তার মানবিক গুণরাশি ও মনুষ্যত্ব এবং বিচরণ করে পশুত্বে। যে সাহিত্য পশুত্বের সৃজনীশীল শক্তি জোগায়, সে সাহিত্য ইসলামি সাহিত্য নয়। মনুষ্যত্ব যেখানে নির্বাক হয়, মানবতা যেখানে সম্পূর্ণ মুমূর্ষু ব্যক্তির রূপ নেয়, সে সাহিত্য ইসলামি সাহিত্য নয়।

পবিত্র কোরআন সারা বিশ্বের সংক্ষিপ্তসার সংবিধান। এই সংবিধানটিই মুসলমানদের জীবন-সংবিধান। এই সংবিধানটিকে সম্মুখে রেখেই মুসলমানগণ জীবনের পথে বিবিধ পদক্ষেপ রাখে। সেই সমস্ত পদক্ষেপের মধ্যে সাহিত্যও একটি পদক্ষেপ মাত্র। এটা নতুন কিছুই নয়। এই কোরআন যার দিকনির্ণয় যন্ত্র নয়, তিনি জীবনের যে প্রাঙ্গণে যে নির্দেশেই দেন না কেন, ইসলামে তার মূল্য আধ-পয়সাও নেই। পবিত্র কোরআন শুধু বিশ্ব-সংবিধান নয়, বরং সারা বিশ্বের এক অতুলনীয় অচিন্ত্যনীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার। একথাও সকল সাহিত্যিককেও স্মরণ রাখতে হবে। সারা বিশ্ব একত্র হয়েও পবিত্র কোরআনের ৬৮৬০টি আয়াত বা বাক্যের মধ্যে একটি অনুরূপ বাক্যরচনা করতে আজও বিশ্বজগৎ ব্যর্থ। ২ : ২৪। তাহলে কোরআন কত বড় সাহিত্য! এই কোরআনের মহাস্রোত জগৎ-কল্যাণে ভরপুর, তার দুই তীর মানবতা ও মনুষ্যত্বের অমর পাথরে চির পাষাণবত।

কিছু মানুষের ধারণা, মুসলমানের হাতে তৈরি হলেই সেটি ইসলাম সাহিত্য এবং অসুলমানদের হাতে রচিত হলে সেটি অনৈস্লামিক সাহিত্য। এটা ভুল ধারণা। শাশ্বত কোরআনের আলোকে কোন সাহিত্য সৃষ্টি হলে তা ইসলামি সাহিত্য এবং অনৈতিক কোন সাহিত্য হলে তা অনৈস্লামিক। এখানে কার হাতে রচিত হল এটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল কি রচিত হল। এই জন্যই একজন অমুসলমানের হাতে ইসলামি সাহিত্য রচিত হতে পারে, আবার একজন মুসলিমের হাতেও অনৈস্লামিক সাহিত্য গড়ে ওঠতে পারে। মনে রাখতে হবে মুসলিম সাহিত্য ও ইসলামি সাহিত্য এক নয়। যেমন মুসলিম রাজত্ব ও ইসলামি রাজত্ব এক নয়। মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) হতে হযরত আলি (কঃ) পর্যন্ত (৬২২-৬৬১ খ্রীঃ) ইসলামি রাজত্ব। বাকি ৬৬১-৭৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত উমাইয়া অর্থাৎ মুসলিম রাজত্বকাল এবং ৭৫০ হতে ১২৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত আব্বাসীয়া অর্থাৎ আবার মুসলিম রাজত্বকাল। আজ পর্যন্ত প্রকৃত ইসলামি রাজত্ব ইসলামের ইতিহাসে আর কখনও ফিরে আসেনি। অনুরূপভাবেই ইসলামি সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য কোনদিনই একই সাহিত্য বা এক নয়।

ইসলাম সারা বিশ্বের জন্য। ইসলামের সমস্ত কিছুই সারা বিশ্বমানবের জন্য। ইসলামি সাহিত্যও সারা জগতের কল্যাণের জন্য। কেউ যেন দয়া করে এটা না বোঝেন যে, ইসলামি সাহিত্য মানেই অজু-গোসল-নামায-রোযা-যাকাত ও হজ এবং মিলাদ-মহফিল, বিবি তালাক, চারটি বিয়ে, কিয়াম আজগোবী কাহিনী প্রভৃতি। ইসলামের আগমন ঘটেছিল দুর্গত মানবতার উদ্ধারের জন্য, ভাল কাজে আদেশ করার জন্য এবং মন্দকাজে নিষেধ করার জন্য, অন্যায়-অবিচারকে রুখে দেওয়ার জন্য, অত্যাচার ও অত্যাচারীকে স্তব্ধ করার জন্য, অসহায়কে সাহায্য করার জন্য, এককথায় সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ওপর সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এই সকল কল্যাণমুখী কাজগুলি যে লেখনীতেই স্থান পাক, তা বিশ্বকল্যাণের জন্য এবং যা বিশ্বমঙ্গলের জন্য, তাই-ই ইসলাম অনুমোদিত বা ইসলামি কাজ বা ইসলামি সাহিত্য।

একদিন পারস্যের অমর কবি ওমর খৈয়াম, মহাকবি ফেরদৌসি, সাদী, রুমী, নিজামী, খাকানী প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত কবিগণ তাঁদের অমর লেখনী দ্বারা সারা বিশ্বের অমোঘ কল্যাণ সাধন করে গেছেন। ঠিক অনুরূপভাবেই সেক্সপিয়র, টলস্টয়, গ্যেটে, ইলিয়ট, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বার্নার্ডশ, কিট্‌স, শেলী প্রমুখ অমর কবিগণ বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমর লেখনী দ্বারা বিশ্বকল্যাণের প্রভূত দিক উন্মোচন করে গেছেন। বিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁর অসংখ্য গজলগানে ইসলামে কম অবদান দেননি। বিশেষ করে একই যুগে একই দেশে আধ্যাত্মিকতার এই দেশে দাঁড়িয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও মহাকবি আল্লামা ইকবাল যে অপরিসীম দান দিয়ে গেলেন, তা এককথায় ইসলামি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা। এককথায় ইসলামি মূল্যবোধের ওপর দাঁড়িয়ে যে যাই সৃষ্টি করেন, সবই ইসলামি সাহিত্য।

ইসলামি সাহিত্যের রূপরেখা :

ইহকাল ও পরকাল : ইসলাম সাধারণত মানুষের সম্মুখে দুটো কাল তুলে ধরেছে। একটি ইহকাল এবং অন্যটি পরকাল। এই দুইকালের সর্মবিশ্বাসের সমন্বয় ইসলাম। তবে ইসলামের স্বীকৃতি শুধু বিশ্বাসে নয়, কর্মেও। আল্লার একত্ববাদ সম্পর্কে ইসলাম একেবারেই আপসহীন। ইসলামি সাহিত্যের মূল্যবোধ এখান থেকেই শুরু হয়। মানুষের যেমন দুটি হাত, দুটি কান, দুটি চোখ, দুটি পা ইত্যাদি নিয়েই মানবদেহ, ইসলামেরও ইহকাল ও পরকাল—এ দুটিকে নিয়েই তার দেহজগৎ গঠিত। কেবল পরকাললাভের জন্য ইহকালকে ত্যাগ করলে চলবে না, আবার ইহকালের বস্তুজগতে পড়ে পরকালকে ভুলে গেলেও চলবে না। জীবনে দুয়েরই সম-মূল্যায়ন হতে হবে। এই নিরপেক্ষ মূল্যায়নটুকু যে সাহিত্যে নিয়মিতভাবে ফুটে উঠবে, তাই-ই ইসলামি সাহিত্য।

বস্তুবাদের বিষফল :

আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ ধনরূপে। তাকে পশুত্বে নামিয়ে দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার উত্তরোত্তর উত্থানের জন্য। মানুষ যখনই কেবল ইহকালটিকে আঁকড়িয়ে ধরে বসে। তখন সে নিছক 'বস্তুবাদের' যন্ত্রে পরিণত হয়। যার ফলে লক্ষ্য করা যায়, ওইরূপ জীবনের জাগতিক আশা-আকাঙক্ষার কোন শেষ থাকে না। জীবনের কোন অখণ্ড দর্শনও থাকে না। জীবন গতিশীল থাকে না। পশুজীবনের মতো ইহকালেই সে যেন তার দুর্লভ মানবজীবনের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ইসলামি আদর্শ, ইসলামি মূল্যবোধ এর একেবারেই বিপরীত। ইহকাল ও পরকাল নিয়ে ইসলামি মূল্যবোধটিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কি সুন্দরভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

'স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।'

—নৈবেদ্য, ৯০

রবীন্দ্রনাথ ইহকাল ও পরকালকে মায়ের কোলে মায়ের বুকে দ্বিস্তনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মৃত্যু সেখানে এক স্তন হতে অন্য স্তনে গমন মাত্র। বিধাতার দু স্তনই (ইহকাল ও পরকাল) মানুষের জন্য সুধাভাণ্ডার। সে পশুর মতো জড়বাদী না হয়ে ওই সঞ্জিবনী সুধার অন্বেষণ করুক। ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে এইটাই হবে ইসলামি জীবনবোধ। এই বোধের ওপর যে ইমারত গড়ে উঠবে, তাই-ই ইসলামি ইমারত। কারিগর যিনিই হোন, তাতে কিছু আসে যায় না। মুসলিম কারিগর মন্দির গড়লে, তা মন্দিরই এবং অমুসলিম কারিগর মসজিদ গড়লে তা মসজিদই।

মানবজাতি :

আল্লাহ পৃথিবীতে মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরআন এই জাতিকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করেছে—সৎ এবং অসৎ। ভাল এবং মন্দ। সতের জন্য নির্দিষ্ট আছে জান্নাত বা স্বর্গ এবং অসতের জন্য নির্দিষ্ট আছে জাহান্নাম বা নরক। কোরআন বারবার ঘোষণা করেছে—তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। মানব জাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ২ঃ২১৩, ৪ঃ১, ৭ঃ১৮৯, ১০ঃ১৯, ১১ঃ১১৮, ১৬ঃ১৩, ২১ঃ১২, ২৩ঃ৫২।

কোরআন আবার বলে—'নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতিরই অবস্থার পরিবর্তন করেন না। যতক্ষণ তারা আপন অবস্থার নিজে পরিবর্তন না করে।' ১৩ঃ১১, ৫৩ঃ৩, ৮৯ঃ৫৩। আল্লাহ কোন মানুষের বা জাতির পক্ষেও নন, বিপক্ষেও নন। যারা সৎশীল, তিনি তাদেরই পক্ষে। এইটাই জাতি সম্পর্কে ইসলামের মূল্যবোধ। জাতি সম্পর্কে এই মূল্যবোধকে যে সাহিত্য সম্মান জানায়, তাই ইসলামি সাহিত্য।

পুরুষ ও নারীর যৌনজীবন :

পবিত্র কোরআন আবার এই মানবজাতিকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে। পুরুষ ও নারী যুবক ও যুবতী। ছেলে ও মেয়ে। প্রকৃতির আপন বিধানে পশু-পক্ষী জীব-জন্তু সকলেরই দুটো বিভাজন আছে—স্ত্রী ও পুরুষ। এই দুই শ্রেণীকেই বংশবৃদ্ধি বা রক্ষার জন্য যৌনশক্তি, কামনা ও বোধ দেওয়া হয়েছে। এই যৌন বিভাজনে একটি চমৎকার জিনিস লক্ষ্য করছি। মানুষ এবং পশু-পক্ষী উভয় কুলকেই যৌনশক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই দেওয়ার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করছি। পশুকে যৌনশক্তি দেওয়া হয়েছে। কেবল মাত্র বংশরক্ষা করার নিমিত্ত। কুকুর, বিড়াল সারা বছর একবার মাত্র যৌনক্রিয়া করে বংশরক্ষা করার জন্য। বাকি সময় যৌনক্রিয়া বন্ধ রাখে। গাভী বা ওই জাতীয় পশুগুলো প্রায় দু'বছর পর একবার তাদের যৌনক্রিয়া সম্পাদন করে। এখানে বংশরক্ষা করা ব্যতীত যৌনক্রিয়ার আর যেন কোন উদ্দেশ্যই নেই।

কিন্তু মানবজাতির জন্য এই যৌনপ্রথা বা প্রণালী মোটেই প্রয়োজ্য নয়। মানুষের যৌনজীবন নিছক দৈহিক মিলন ও বংশবৃদ্ধি বা রক্ষাই দাবি করে না, এর উর্ধ্বে বহু কিছু দাবি রাখে। ওই দাবি রাখার মধ্যেই মানবজাতির মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব নিহিত আছে। এই মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের জন্যই তার যৌন জীবন কোন সময়ের সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। এখানে তার অবারিত দ্বার। বিধাতার এই অবারিত অনুমতির পেছনে নিশ্চয় মানুষের জন্য কোন মহান ধারা লুকিয়ে আছে। নিশ্চয় মানুষকে, এই অফুরন্ত অনুমতির দ্বারা অবিরাম যৌন-উন্মাদনা সৃষ্টি করতে বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, সুষ্ঠু সমাজ জীবন গড়ে তুলতে। যে সমাজজীবন বা পারিবারিক জীবনে থাকবে—এক চিরন্তন সঙ্গলাভ, আন্তরিক সংযোগ লাভ, আত্মিক সম্পর্কলাভ, জীবনের এক অদ্বিতীয় ও অভিন্ন সঙ্গী বা সঙ্গিনী লাভ। সুতরাং মানুষকে যে অধিকতর যৌন পরিচালনার অফুরন্ত সময় ও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তার উদ্দেশ্য মোটেই এরূপ নয় যে, মানুষ দিবারাত্রি যৌনসাগরে ভাসতে থাকবে। এর উদ্দেশ্য একটিই—মানুষ গড়ে তুলবে একটি পবিত্র পরিচ্ছন্ন পারিবারিক জীবন। তৈরি করবে উন্নত মানব সমাজ। সুতরাং মানুষের যৌনজীবন যতটা বংশরক্ষা করার জন্য, তা অপেক্ষা দশগুণ পারিবারিক ও সমাজজীবন গঠন করার জন্য। মানুষের যৌনজীবন সম্পর্কে এইটাই কোরআনের বা ইসলামের ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ।

বিবাহ :

ইসলাম মানুষের এই যৌনজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক পেশে কোন বিধান দেয়নি। সে বলে তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। সে বিবাহে উৎসাহ দান করে, কিন্তু ব্যভিচারে কঠোর শাস্তি প্রদান করে। (২ঃ২২১, ২৩৫, ৪ঃ৩, ১৫-২৫, ২৩, ২৪, ২৫, ১২৯, ৫ঃ৫, ১৭ঃ৩২, ২৩ঃ৫, ২৪ঃ২, ৩২, ৩৩, ২৮ঃ১০, ৬০, ৩৩ঃ৩০, ৫০, ৬০ঃ১০, ৭০ঃ২৯-৩০)

আমাদের মানবসমাজের কোন কোন গোষ্ঠী বিবাহকে স্বীকৃতি না দিয়ে প্রকৃতির ধর্ম বা বিধানকে অস্বীকার করেছেন। প্রকৃতিকে বাধা দিয়ে বা অস্বীকার করে কোন সমাজ বা কোন মানুষই পরিত্রাণ পায়নি। আমাদের ভারতবর্ষেও পায়নি। এবং বিদেশেও পায়নি। পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানী লেকেভ (LECKEV) তাঁর 'ইউরোপীয় নৈতিকতার ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেন—(*History of European Morals*–Vol. II) "ব্যভিচার মধ্যযুগে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। পাদ্রীগণ দিবালোকে আপন আপন মেয়েদের সঙ্গে অবৈধ যৌনমিলন করতেন। পাদ্রীগণের বিবাহ না করার প্রথা আস্তে আস্তে তীব্র রূপ লাভ করেছিল। কিন্তু বাস্তবজীবনে (যৌনতাড়িত) ব্যভিচার চরম আকার ধারণ করেছিল। তাদের কাজ তাদের চিন্তা ও কথার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিল।" এ সম্পর্কে বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর বিবাহ ও নৈতিকতা (*Marriage and Morals*) গ্রন্থে বলেন— "মধ্যযুগের ঐতিহাসিকগণের অধিকাংশই গির্জার মধ্যে পাদ্রীগণের এমন সব কক্ষের উল্লেখ করেছেন, যেগুলো আসলে ছিল ব্যভিচারের আড্ডাখানা। এই কক্ষগুলোর চার দেওয়ালের মধ্যে অসংখ্য মানব শিশুর প্রাণনাশ ঘটানো হত। বারবার নির্দেশ দেওয়া হত যে, পাদ্রীগণ যেন বিশেষ করে তাঁদের মা-বোনদের সঙ্গে যৌন-সঙ্গম না করেন। কিন্তু এ নির্দেশের কোন মূল্য থাকত না।"

এই লাগামহীন যৌনজীবনের অশুভ পরিণতিকে শুভ পরিণয়ে পরিণত করে একটু সুস্থ পরিবার-জীবন ও একটু সুষ্ঠু সমাজজীবন গড়ার নিমিত্ত ইসলাম মানুষকে বিবাহে দেয় উৎসাহদান। সারা বিশ্ব জুড়ে যে সমাজজীবন গড়ে ওঠেছে তার মূলে তো একটিই বস্তু। যার নাম বিবাহ। এই বিবাহ বন্ধনটিকে শিথিল করলে বা তুলে দিলে মানুষের সমাজজীবনের সুদূর পরিণতি কোথায় দাঁড়াবে, সে কথা চিন্তা করলেও তো শরীর অবশ হয়ে আসে। বিবাহপ্রথা বিদ্যমান থাকার পরও বর্তমানে যা চলছে, তাও তো অবর্ণনীয় ব্যাপার। তুলে দিলে হবে অচিন্ত্যনীয়। বর্তমানে পাশ্চাত্য জগৎ তার একটি জ্বলন্ত নজির। তাই বিবাহ ইসলামের একটি চরম মূল্যবোধ।

এই বিবাহকে কেন্দ্র করেই কোরআন ঘোষণা করেছে, পুরুষ ও রমণীগণ পরস্পর পরস্পরের পোশাক। ২ঃ১৮৭, ৭ ঃ ২৬। পোশাক এই অর্থে যে উভয় উভয়ের গুপ্তাঙ্গকে (অবৈধ গমন হতে) হেফাজত বা রক্ষা করে। বেআব্রু হতে দেয় না। উভয়ই উভয়েরই প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়। আবার ব্যাপক অর্থে—পোশাক যেমন মানুষের শরীরকে শীতে ও তাপে রক্ষা করে এবং আরাম দেয়। স্বামী স্ত্রীও অনুরূপভাবে এক অন্যকে রক্ষা করে, আরাম দেয়। কেবলমাত্র যৌন-অনাচার থেকে রক্ষা করে না। কেবলমাত্র যৌন-আরামও দেয় না। মানুষের যৌনজীবন অতিক্রান্ত হলেও স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের কাছে চির মহাসম্পদ, মহা-আশ্রয়, আল্লার অসীম রহমত। জীবনে এমন একটি সময় আসে, তখন উভয়েই উভয়ের কাছে উত্তাল যৌবন অপেক্ষা আরও যেন দশ গুণ বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। জীবনের বেলাভূমিতে ও জীবন সায়াহ্নে এই অনিবার্য ও অপরিহার্য প্রয়োজনকে সে মেটায়। সেটি নর-নারীর জীবনে বিবাহ নামক লিখিত ও অলিখিত একটি পবিত্র সেতুবন্ধন। এই সেতুবন্ধনটি ইহলোকের মূল্যবোধ। এই বোধের ওপর ভিত্তি করে যে যাই কিছু সৃষ্টি করুন, তা ইসলামি সাহিত্য, বাকি অনৈস্লামিক।

ইসলামে অশ্লীলতা নেই :

ইসলামে বহু কিছুর স্থান আছে। কিন্তু অশ্লীলতার মোটেই স্থান নেই। স্বয়ং মহানবীজী হযরত মহম্মদ (দঃ) বলেন—"সারা বিশ্বের নৈতিকতাকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমার আগমন।" আবার বলেন—"লজ্জা শরম ঈমানের অঙ্গবিশেষ।" অর্থাৎ যাব লজ্জা নেই, তার ঈমান নেই। মহানবীজী নৈতিকতার কত উর্ধ্বজগতে অবস্থান করতেন, সে সম্পর্কে স্বয়ং কোরআনই বলে—"নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লার রসুলের মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ। ৩৩ঃ২১। নিশ্চয় তুমি সুমহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ৬৮ঃ৪।

সুতরাং ইসলামে অশ্লীলতার বিন্দু-বিসর্গও স্থান নেই। কানাকড়িরও মূল্য নেই। এই অশ্লীলতা ঢাকার জন্য ইসলামের পর্দাপ্রথা বা শালীনতাব প্রচলন। ইসলামের পর্দাপ্রথা কোন অবরোধ প্রথা না। এটা শুধু শালীনতা রক্ষা। সমাজজীবনে এইটাই ইসলামের মূল্যবোধ। সাহিত্যে এইটাই ইসলামের নির্দেশনা।

অশ্লীলতাকে ইসলাম কেন এত ঘৃণার চোখে দেখে। হাজার হাজার বছর ধরে আমরা একবার যদি অতীতের ইতিহাস লক্ষ্য করি তা হলে দেখতে পাব—ব্যাবিলনের স্বর্গোদ্যান, মিশরীয় প্রাচীন সভ্যতা, গ্রীস সভ্যতা, রোম সভ্যতা আরও বহু প্রাচীন সভ্যতা যে কয়েকটি কারণে ধ্বংস হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রধান কারণ ছিল—অত্যাচার, অপচয় ও অশ্লীলতা। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে অহঙ্কার অপব্যয়-অপচয়, অত্যাচার ও অশ্লীলতা একেবারেই নিষিদ্ধ বস্তু। এই মূল্যবোধেই ইসলামি সাহিত্য গড়ে উঠবে।

ইসলামে প্রেম-প্রীতি :

ইসলাম প্রেম-প্রীতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেছে। বিবাহের মাধ্যমে তাকে প্রাণবন্ত করেছে। 'কাম' মানুষের জীবনের এক মহাশক্তি। কোন মানুষই একে অর্জন করেনি। সে মানবজীবনের এক মহাক্ষণে আবির্ভূত হয় এবং এক মহাক্ষণে নিঃশব্দে অন্তর্ধান করে। মানুষের জীবনে অনেক শক্তি মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে। কিন্তু একমাত্র 'কাম' একটি নির্দিষ্ট সময়ে আসে, আবার নির্দিষ্ট সময়ে চলে যায়। তাকে যেমন তিন বছর বয়সে জোর করে আনাও যায় না, তেমনি ৯৩ বছর বয়সে জোর করে রাখাও যায় না। তাই কামের আগমন ও অন্তর্ধান কোন মানুষেরই আয়ত্তাধীন নয়। এটা আল্লার মহাদান, ঠিক সময়ে আসে, আবার ঠিক সময়ে চলে যায়। যে জিনিসটিকে জোর করে আনা যায় না এবং (এলেও) জোর করে রাখা যায় না। তার সম্পর্কে চিন্তা করা খুবই দরকার। মানবজীবনে

বহু জিনিস আসে, কিন্তু কোনটিই কামের মতো নয়। পশুপক্ষীর জীবনেও এটা একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসে যায়। এবং এই কামশক্তি হতেই বিশ্বজুড়ে সৃজনের জাল দুর্বার গতিতে বিস্তার লাভ করছে। স্রষ্টা কোনদিনই তাঁর সৃষ্ট জগৎকে একটি বারও বলছেন না যে, তোমরা আমার সৃষ্টিকুলকে বাঁচিয়ে রাখো। বরং সৃষ্টিকুলই তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিনিয়ত হুঁশহারা।

আগুন হতে জগতের সমস্ত ভাল খাদ্যগুলো তৈরি হচ্ছে। আবার ওই আগুন হতেই সভ্যতার শত দীপ শতকলায় সর্বযুগেই জ্বলে উঠেছে। কিন্তু ওই আগুনকে পরিমিতভাবে ব্যবহার করতে না জানলে সবই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কামও মানুষের একটি মহা আগুন। কোরআন এই আগুনকে বারবার সংযত করতে বলেছে। ব্যভিচার করা তো বহুদূরের কথা, তার নিকটে যেতেও নিষেধ করেছে। ৪ ঃ১৫, ১৯, ১৭ঃ৩২, ২৫ঃ৬৮। অর্থাৎ কামকে সংযত করতে বলেছে। তাই বলে যুবক-যুবতীর পরিচ্ছন্ন প্রেম-প্রীতিকে কোথাও বাধা দেয়নি। সেখানে বিবাহের জন্য উৎসাহ দিয়েছে। কিন্তু বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছে। প্রেমের অজানা গর্তে পড়ে অন্ধ হতে নিষেধ করেছে। পাগল বা উন্মাদ হতে বারণ করে। কামকে কামাতুর হয়ে ভোগ করতে নিষেধ করেছে। কামকে জয় করে তাকে দাস রূপে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। তার গোলাম হয়ে যেতে ইসলাম নিষেধ করেছে। একবার দাস-দাসী হয়ে গেলে কামই মানুষকে ভোগ করে, মানুষ তখন ভোগ্য হয়ে যায়। ইসলাম এটাকে নিষেধ করে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে সতর্কবাণী তো এরই জন্য। ১২ঃ২৪।

মানুষ কিভাবে কামাতুর বা কামাতুরা হয়ে যায়, সেটাও পবিত্র কোরআন সুরা ইউসুফে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছে। এবং সেখানে সংযত হওয়ার উপদেশ দান করেছে। কিন্তু বিশাল কোরআন একটি বারও মানুষকে প্রেম-প্রীতি পরিত্যাগ করতে বলেনি। বরং বারবার উল্লেখ করেছে, নর-নারী উভয়ই উভয়ের জন্য শান্তির সোপান স্বরূপ। কোথাও রমণী পুরুষের শান্তির জন্য প্রশান্ত সাগর, কোথাও স্ত্রী গমনের অবাধ অনুমতি, কোথাও স্ত্রীকে শস্যখেতের সম্মান দান। স্বামী রূপ কৃষক যেন খেতের প্রতি যত্নবান থাকে। এ সবই তো কোরআনেরই নির্দেশ। ২ঃ১৮৭, ২২৩, ২৫ঃ৭৪।

স্বয়ং কোরআনই যখন মানুষের প্রেমময় জীবনের ওপর একটি সম্পূর্ণ সূরা (ইউসুফ) নাজেল করেছে, সেখানে ইসলামে প্রেমে কোন বাধা নেই। নরনারীর জীবনে বিবাহের পূর্বে কাম কাঁচা মাংস বা অবৈধ খাবার রূপে থেকে যায়। বিবাহ তাকে বৈধ বা পরিশুদ্ধ করে। প্রেম-প্রীতি সম্পর্কে এইটাই ইসলামের মূলনীতি। ইসলামি সাহিত্য এইটুকুই অনুমতি দেয়। ইসলাম মানুষকে যেমন প্রেম-প্রীতি থেকে দূরে থাকতেও বলে না, তেমনি কামকে নিয়ে কামড়াকামড়ি করতেও দেয় না। ইসলাম কাম ও প্রেমের মধ্যে ভারসাম্য টেনেছে।

মুসলিম সাহিত্য ও ইসলামি সাহিত্য :

এ সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা পূর্বে করেছি। মুসলিম রচিত সাহিত্য ও ইসলাম সাহিত্য এক নয়। যে-কোন মুসলমান কোন সাহিত্য সৃষ্টি করলে, তা মুসলিম সাহিত্য এবং ইসলামি মূল্যবোধের ওপর কোন সাহিত্য রচিত হলে, তা ইসলামি সাহিত্য। মুসলি কর্তৃক রচিত সাহিত্য ইসলামি সাহিত্য হলে কিছুদিন পূর্বে সলমন রুশদি নামক তথাকথিত মুসলমান যে সাহিত্য (*স্যাটানিক ভার্সেস*) রচনা করলেন, তা ইসলামি সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করত, কিন্তু তা করেনি। বাংলাদেশের তসলিমা নাসরিন নামক জনৈক মহিলা কিছু সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, তাও ইসলামি সাহিত্যের মর্যাদা পায়নি। মুসলিমদের হাতে তৈরি হলেই যে তা ইসলামি সাহিত্যের মর্যাদা পাবে, এমন কোন কথা নেই। আবার অমুসলিমের হাতে সৃষ্ট হলেই যে তা ইসলামি সাহিত্যের মান ও মর্যাদা পাবে না, এমন কোন দলিল নেই। কেননা ইসলাম কোন সীমারেখায় বন্দী বা কোন গোষ্ঠীতে বন্দী নয়। সে তার আপন মূল্যবোধের ওপর বিশ্বজনীন, সর্বজনীন। সুতরাং তার নীতি অনুসরণে সকলেই স্বাগত।

ইসলামি সাহিত্য রেললাইনের মত, একটি নির্দিষ্ট লাইনে চলে। মুসলিম সাহিত্য বাসের মতো যেদিকে ইচ্ছে সেই দিকে চলে। ইসলামি সাহিত্য একটি আদর্শ, একটি স্থির লক্ষ্য। মুসলিম সাহিত্য মনগড়া, মনের খোরাক। মুসলিম সাহিত্য হতে পারে একটি গোষ্ঠীগত জাতীয় সাহিত্য, কিন্তু ইসলামি সাহিত্য সর্বজনীন, যা সর্বমানবের কল্যাণাভিমুখী।

ইসলামি সাহিত্য চায় নারী জাতিকে নারীরই মহান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে জগৎসভায় তুলে ধরতে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে প্রাচীনকালে মিশর, গ্রীস, চীন, রোম, ভারত প্রভৃতি দেশে নারী জাতিকে যেন মনুষ্যজগৎ হতেই নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তারা যেন মানুষই ছিল না। নারী সম্পর্কে কে কি বলে তা দেখা যাক :

১। গ্রীস ধর্ম : নারী হচ্ছে জগতের যাবতীয় অনর্থ ও সর্বনাশের মূল। আগুন ও সাপ হতেও সে অধিক ক্ষতিকর। —সক্রেটিস্

২। চৈনিক ধর্ম : নারী দুঃখের জল। সে পুরুষের পণ্যবস্তু মাত্র।

৩। বৌদ্ধ ধর্ম : নারী সঙ্গলাভে কোনদিন নির্বাণ লাভ করা যায় না।' সে যৌনভাণ্ডার।

৪। ইহুদী ধর্ম : নারী চিরন্তন অভিশপ্ত। সে মৃত্যু অপেক্ষাও তিক্ত। সে ছলনার ফাঁদ।

৫। খ্রীস্ট ধর্ম : নারী পাপের উৎস। সে শয়তানের ভাবমূর্তি। সে শয়তানের দরজা। সে মানবসমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

৬। হিন্দু ধর্ম : নারীর কোন সত্তাই নেই। সে শিশুকালে পিতার, যৌবনে পতির, বার্ধক্যে পুত্রের। সে অপবিত্র ও অমঙ্গল। কু-স্বভাব, কু-কামনা, কু-প্রবৃত্তি তার জন্মগত সহজাত প্রবৃত্তি। সে পৈশাচিক কামনা করে, তাই কামিনী, তার প্রবল রমণ ইচ্ছা, তাই সে রমণী। —মনুসংহিতা।

ইসলাম ধর্ম: ১। নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী।

২। সন্তানের স্বর্গ মায়ের পায়ের তলে।

৩। সম্মান প্রাপ্তিতে মায়ের স্থান পিতা অপেক্ষা তিন গুণ।

৪। নারী পুরুষের পরিপূরক।

৫। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ সতী নারী।

৬। নারী তোমাদের মা-বোন-স্ত্রী ও কন্যা।

৭। নারীর অধিকার ন্যায়সঙ্গত।

৮। ওই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম ব্যবহার করে।

৯। রমণী প্রতিটি গৃহের রাণী।

এক যদি হয় গরীয়ান তবে অন্য সে গরীয়সী
এক যদি হয় মহীয়ান তবে অন্য সে মহীয়সী।

—*কাব্যকানন*

আমরা প্রাচীনকালে লক্ষ্য করলাম যে, নারী জাতিকে মনুষ্যকুল হতেই যেন বিতাড়িত করা হয়েছে। এখন আবার লক্ষ্য করছি—বর্তমানে নারী জাতির অবস্থা যেন আরও করুণ। বর্তমানে নারী জাতিকে তার আপন কুল, নারী কুল হতেই বিতাড়িত করা হচ্ছে। পাশ্চাত্য জগৎ উঠে পড়ে লেগেছে যে, যেমন করেই হোক বিশ্বের প্রতিটি নারীকে 'নর' বানাতেই হবে। কথায়-বার্তায়, আহারে-বিহারে, পোশাকে-আসাকে, কাজে-কর্মে, আচারে-ব্যবহারে প্রভৃতি সকল কিছুতেই নারী জাতিকে পুরুষ জাতি বানাতেই হবে।

নারী জাতিকে পুরুষ জাতি বানালেই যদি বিশ্বের সমূহ কল্যাণ ধরা পড়ত বা ধরা পড়ে, তাহলে বিধাতা পুরুষ তো সর্বশক্তিমান, আবার তিনি মঙ্গলময়ও বটেন। তিনি ইচ্ছা করলেই তো তাদের অর্থাৎ নারীদের পুরুষ করে তৈরি করতে পারতেন। তা তিনি করেননি। কেননা তাতে মঙ্গল নেই। প্রাচীন যুগ নারী জাতিকে মনুষ্যকুল হতে বিতাড়িত করে দেখেছে, তাতে বিশ্বের কল্যাণ নেই, আছে অকল্যাণ। আবার বর্তমান যুগও একদিন ঠেকে শিখবে যে, নারীকে পুরুষ বানিয়ে লাভ তো নেই-ই, বরং ক্ষতিরও শেষ নেই। সেদিন আর বেশি দেরি নেই। পাশ্চাত্য জগৎ বুঝাতে শুরু করেছে, নারীকে পুরুষ বানিয়ে কি যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

আর একটি কথা, সারা পৃথিবী একযোগেও কি কোন নরনারীর সহজাত প্রবৃত্তিকে বদলে দিতে পারবে? পারবে না। কোন নরকে গর্ভধারণ করাতে পারবে, পারবে না। কোন যুবকের বুকে স্তনযুগল ফোটাতে পারবে, পারবে না। তা হলে কি পারবে, কিছুই পারবে না। পারবে কেবল কিছু অকাজ করতে। যা একদিন পৃথিবীতে অশান্তিই বাড়াবে এবং আল্লাহ্ বলছেন—'তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না। ২ : ১১। নারী পুরুষ সাজুক এবং পুরুষ নারী সাজুক, ইসলাম এর ঘোর বিরোধী। এখানে ইসলাম আপসহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ইসলাম চায়—নারী তার আপন মহিমাতেই বড় হোক। নিজের আকৃতি-প্রকৃতি, বেশ-ভূষা, আচরণ-বিচরণ সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দিয়ে অপরকে কেবল অনুকরণ করে কেউই বড় হতে পারে না। এইটাই ইসলামি মূল্যবোধ।

শেষ পর্যায়ে আমরা আর একবার দেখব, অমুসলিমের হাতে কী করে ইসলামি সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে।

১। একবার মহানবীজীর কানে একজন অমুসলিম কবির একটি লাইন পড়লে তিনি তার প্রশংসা করেন। লাইনটি—'জেনে রেখো, আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই বাতিল।'

২। হযরত শারীদ (রাঃ) বলেন—"একদিন মহানবীজীর সঙ্গে একটি বাহনের পিঠে সওয়ার ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'উমাইয়া আলি সালতার (অমুসলিম) কোন কবিতা কি তোমার মনে আছে? আমি বললাম—মনে আছে। তিনি বললেন—পড়। আমি তার একটি কবিতা পড়লাম। তিনি বলেন—আর একটি পড়। আর একটি পড়লাম। তিনি বললেন—আরও পড়। আমি তার অনেক কবিতা পড়লাম। নবীজী খুবই আগ্রহভরে শুনলেন।

উপরোক্ত কবি প্রথম ইসলামি যুগের একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন। তাঁর কবিতাতে আল্লার একত্ববাদ কিয়ামতও বিচার দিনের কথা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলা হয়েছিল। ইসলামি যুগে কোন মুসলমান কবিও তাঁকে ম্লান করতে পারেননি। তাই নবীজী তাঁর কবিতাগুলো খুবই পছন্দ করতেন।

৩। তখন ইসলামি যুগ। মহাকবি লবিদ তখনও বেঁচে আছেন। তখনও তিনি অমুসলিম। তাঁর কবিতার একটি ছত্র মহানবীজীকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। ছত্রটি ছিল—'জেনে রেখো, আল্লাহ ব্যতীত কারও কোন অস্তিত্ব নেই।' মহাকবি লবিদ পরবর্তীকালে মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমান হওয়ার পর কবিতা খুবই কম লিখেছিলেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বলেছিলেন—'কোরআনের সম্মুখে কবিতা লিখতে লজ্জা বোধ হয়।'

প্রাক্ ইসলামি যুগে বহু বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল। সাহিত্যিক উৎকর্ষে তারা আজও যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ওই শাশ্বত সৃষ্টির মধ্যেও কিছু কিছু ইসলামি মূল্যবোধও জেগে উঠেছিল।

ইসলামি যুগে অর্থাৎ প্রথমদিকে সাহিত্যচর্চা যতখানি হয়েছিল, তা অপেক্ষা ধর্মীয় সাহিত্যচর্চা বেশি হয়েছিল। কোরআন-হাদিস-ফেকাহ্-নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে তাঁরা এতই ব্যস্ত ছিলেন, নিছক নির্জলা সাহিত্য সৃষ্টির অবকাশ পাননি। তবুও কিছু কিছু হয়েছিল। হযরত আলি ও হযরত আয়েশা ইসলামি সাহিত্য ভাণ্ডারে কম অবদান দেননি। বিশেষ করে হযরত আলি ইসলামি সাহিত্যের একটি নীতি নির্ধারণও করে দিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে উমাইয়া ও আব্বাসিয়া যুগে যে অপূর্ব সাহিত্য ভাণ্ডার গড়ে উঠল। তা একদিকে যেমন ইসলামি মূল্যবোধ হতে দূরে নয়, অন্যদিকে তেমনি অজ্ঞ বা অন্ধকার যুগের প্রভাবও সম্পূর্ণ এড়াতে পারেনি। বিশ্ববিখ্যাত আরব্য উপন্যাস ও পারস্য উপন্যাস তার জ্বলন্ত নিদর্শন।

পরবর্তীকালে মুসলিম জাহানে বিশেষ করে পারস্যে যত মহাকবি জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁদের সবার মধ্যেই ইসলামি মূল্যবোধ কাজ করেছিল। এক্ষেত্রে মহাকবি শেখ সাদির স্থান সবার উর্ধ্বে। সবের শেষে ভারত উপমহাদেশে যে কয়েকজনকে আমরা পাই, তাঁদের মধ্যে ডঃ আল্লামা ইকবাল ও বিদ্রোহী কবি নজরুল অন্যতম। এই অধ্যায়ে যিনি সার্থকভাবে উপসংহার টেনে গেলেন, তিনি বাংলাদেশের ফররুখ আহমদ।

আমাদের শেষ কথা—ইসলামি সাহিত্য তারই নাম, যা ইসলামি মূল্যবোধে রচিত, গঠিত ও পঠিত।

বাংলা সাহিত্যে একদিন ইসলামি শব্দাবলী এমন এক পর্যায়ে গিয়েছিল, যা অচিন্ত্যনীয়, যা ভাবা যায় না।

সামান্য নমুনা :

১। 'মহাজন্' একবচন, এর সঙ্গে ফার্সী 'আন্'-বিভক্তি যোগে ওটা হল—'মহাজনান' বহুবচন, অর্থাৎ বহু মহাজন।

২। 'মজুর' ফার্সী শব্দ, এর সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় যোগে ওটা হল 'মজুরিয়া'। অর্থাৎ পাবিশ্রমিক।

৩। 'বদল' আরবী শব্দ, এর সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় যোগে ওটা হল 'বদালিয়া'। মূল অর্থ পরিবর্তন। পরেব অর্থ 'পরিবর্তন করে' দাও।

৪। 'জমিনদার' অর্থ ভূ-স্বামী। 'জমিন' আরবী শব্দ, 'দার' ফার্সী শব্দ, অর্থ মালিক। বহু জমির মালিক।

৫। 'জোতদার'— 'জোত' বাংলা শব্দ, অর্থ লাঙল। 'দার' ফাবসী শব্দ, অর্থ মালিক। লাঙলের মালিক। 'জোত' অর্থ গরু বা মহিষ-সহ লাঙল। যখন তারা লাঙলে জুড়ে থাকে, তখন বলা হয জোত। যেমন বলা হয় এখন 'জোত' খুলে দাও।

ইসলামি বাংলা সাহিত্য

(মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত)

ইসলামি বাংলা সাহিত্য বলতে বাংলা সাহিত্যে নিছক মুসলমানদের দান-অবদানের কথা নয়। বা নিছক মুসলমানদের সৃষ্ট সাহিত্যও নয়। ইসলামি বাংলা সাহিত্য বলতে সেই সাহিত্যধারাকে বোঝায়, যে সাহিত্যধারাটি ইসলামকে কেন্দ্র করে মধ্যকাল হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলার হিন্দু মুসলমান সকলেরই দ্বারা বাংলা-সাহিত্য সরোবরে ফুটে উঠল। মনে রাখা প্রয়োজন, ইসলামকে কেন্দ্র করে এ সাহিত্য ধারাটি গড়ে উঠলেও এতে ইসলামি শাস্ত্রকথা ও তত্ত্বকাহিনী ছাড়াও আমাদের সমাজ জীবনের বহু কিছু স্থান পেয়েছে। যেখানে প্রণয়গাথা রোমান্টিক কাহিনী ও জঙ্গনামা প্রভৃতি প্রচণ্ডভাবে স্থানলাভ করেছে। এতে অংশ নিয়েছেন হিন্দু-মুসলমান সকলেই। যার পাঠক-পাঠিকাও উভয় গোত্রেরই। এমনকি ইসলামের ধর্মাধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে ইসলামের খেদমতেও হিন্দুদের অবদান কম নয়। পবিত্র কোরআনের যে প্রথম বঙ্গানুবাদ, আরবের কোরআনকে বাংলায় অনুবাদ করার যে গৌরব, সে গৌরব একজন হিন্দুরই। তিনি মনীষী গিরিশচন্দ্র সেন। ইসলামি বাংলা সাহিত্যের ওপর জ্ঞানদীপ্ত ও গবেষণামূলক যে প্রথম গ্রন্থ, তাও একজন হিন্দু মনীষীর লেখা—'ইসলামি বাংলা সাহিত্য'। যিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের দিকপাল আচার্য সুকুমার সেন। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করেই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য'। এ সম্পর্কে আচার্য সেন বলেন "যদিও 'ইসলামি' নামটি হয়তো সঙ্গত নয়। কেননা রচনা-রচয়িতা-ভাবভাষা কোন দিক দিয়েই এই সাহিত্যকে সর্বথা ইসলামি বলা যায় না।" তবে উদার মনে ইসলামের আদি স্বরূপ পবিত্র কোরআন অনুযায়ী পর্যালোচনা করলে আর কোন অসুবিধে থাকে না। পবিত্র কোরআনে 'ইসলাম' নিছক গতানুগতিক একটি ধর্ম মাত্রই নয়, বরং 'ইসলাম' হল জীবন ব্যবস্থা। পবিত্র কোরআনে ইসলামকে ধর্ম না বলে দ্বীন (জীবন-ব্যবস্থা) বলা হয়েছে। ৩ : ১৯, ৭ :১৫৭, ৯ : ৩৩। এবং মানুষের জীবন ব্যবস্থাতে সব কিছুই স্থান পেয়েছে—প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-হাসি-কান্না-সুখ-দুঃখ-জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি। এই সংসারের ধর্ম ইসলাম। ইসলামে সংসার আছে। বৈরাগ্য নেই। এই দিক থেকেই ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম। এবং প্রকৃতি মহান আল্লার ধর্ম। যে ধর্মের কোন রদবদল বা পরিবর্তন নেই। ৩০ : ৩০, ৩৫ : ৪৩। পবিত্র কোরআনই বর্ণনা করেছে—হযরত ইউসুফের প্রতি বিবি জোলেখার প্রাণের গোপন প্রেম। ইসলাম মানুষের প্রাণের গোপন প্রেমকেও তো তুলে ধরেছে।

'প্রাণের গোপন প্রেম পবিত্র সে কত
সমাজে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো।'

—রবীন্দ্রনাথ

ভারতের সঙ্গে ইসলামের আদি সম্পর্ক বিষয়ে ইতিহাসে একটি অনৈতিহাসিক কাহিনী বা কিংবদন্তী চলে আসছে। ইসলাম এই বিশ্বের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ধর্ম। এই ধর্মের প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ)। তিনি নাকি এই পৃথিবীতে প্রথম পা রাখেন ভারতের পুণ্যভূমিতে। সুতরাং এদিক থেকে ইসলামকে প্রথম আলিঙ্গন করল ভারতই।

"অনন্তর আদম তাঁর প্রতিপালক প্রভু হতে কতকগুলো বাক্য শিক্ষা করলেন। অনন্তর তিনি (আল্লাহ) তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলেন।"

"আমি (আল্লাহ) বললাম—তোমরা (আদম ও তাঁর স্ত্রী) সকলে এখান হতে নেমে যাও। অনন্তর যদি তোমাদের নিকট আমা হতে কোন পথ প্রদর্শক আসে। তবে যারা আমার পথপ্রদর্শকের অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিত হবে না।" কোরআন ২ : ৩৭-৩৮।

কথিত আছে, মানব জাতির প্রথম মানব তথা ইসলামের প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) প্রথম ভারতভূমিতেই অবতীর্ণ হন। এবং তাঁরই নামানুসারে সিংহলের আদম পর্বত। যা আজও তাঁর পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে। মানবজাতির প্রথম নারী হাওয়া বিবি আরব দেশের জেদ্দাতে প্রথম অবতীর্ণ হন। পরে উভয় মানবের মিলন ঘটে মক্কার মাটিতে। এইভাবে ভারতীয় নর আদম এবং আরবীয় নারী হাওয়া পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন। কেটে গেল হাজার হাজার বছর। ইতিহাস যার কোন তারিখ নির্ণয় করতে পারেনি।

বর্তমান ইসলামি বাংলা সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে আচার্য সুকুমার সেন বলেন—"ভারত ক্ষেত্রে মুসলমান শক্তির পদবী গড়েছিল প্রথমে সিন্ধু-পাঞ্জাবে, কেননা ইবানের সঙ্গে এই অঞ্চলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল বহুকাল থেকে—অন্ততপক্ষে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ দশক থেকে। সিন্ধু-পাঞ্জাবে মুসলমান-শাসন দৃঢ় মূল হওয়ার অনেক দিন পবে এই বিদেশীদের অভিযান ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে প্রসারিত হতে থাকে। ত্রয়োদশ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তীরহুত-আসাম-উড়িষ্যা ছাড়া আর্যাবর্তের প্রায় সবটা তুর্কী-পাঠানের অধিকারে এসে পড়ল। সিন্ধু-পাঞ্জাবে দীর্ঘকাল বসবাস করবার সুযোগ পেয়ে এই স্থানের মুসলমান কবিরা বিদেশীদের মধ্যে সবার আগে ভারতীয় সাহিত্যের সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই কাজে হাত দিয়েছিলেন তাঁরাই, যাঁরা ছিলেন যুগপৎ ফারসী সাহিত্যের মধুকর এবং ভারতীয় সাহিত্যের রসসন্ধানী। বাংলা ছাড়া আর কোনো নবীন আর্য (অর্থাৎ লৌকিক) ভাষায় আদি যুগের (একাদশ-ত্রয়োদশ) রচনা প্রায় পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালের সংকলনে রক্ষিত হয়ে অল্পবিস্তর রূপান্তর পেয়ে যে দু'-একটি ছড়া ও গান আমাদের কাছে পৌঁছেছে সেগুলি প্রধানত মুসলমান কবির রচনা। সুতরাং এ অনুমান করলে খুব দোষ হবে না যে সিন্ধু পাঞ্জাবে লৌকিক ভাষায় সাহিত্য-রচনায় অগ্রণী ছিলেন মুসলমান কবি সাধকরাই।"

বর্তমানে ইসলামি বাংলা বলতে আমরা যেটি বুঝি, তার জন্ম লক্ষ্য করি উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে। তার পূর্বে মুসলমানগণ সাহিত্যে যে ভাষা ব্যবহার করতেন, তা ছিল সাধুভাষা। তবে এই সাধুভাষাতেও প্রচুর আরবী ও ফার্সী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করি। এই শব্দগুলো হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সুপরিচিত ছিল। এই সময়ের বহু বাংলা শব্দ ফার্সী 'আন্' বিভক্তি যোগে বহুবচন হয়েছে। যেমন একবচন—মহাজন, যার বহুবচন মহাজনান্। একবচন বেগম্ বহুবচন বেগমান্। আবার অনেক আরবী ফার্সী মিলিত শব্দ ও বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়। যেমন আরবী শব্দ জমিন্, ফার্সী শব্দ 'দার', মিলিত শব্দ 'জমিনদার', জোতদার ইত্যাদি।

অনেকে আবার আরবী ফার্সী শব্দের বাহুল্যকে ইসলামি সাহিত্য মনে করেছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। তাই যদি হত, তাহলে প্রাক্-ইসলামি যুগের অনৈস্লামিক সাহিত্যগুলো ইসলামি সাহিত্যের মর্যাদালাভ করত। কিন্তু তা তো হয়নি।

প্রাক হোসেন শাহী আমলে এবং তাঁর আমলে, ও তাঁর পরেও বাংলা সাহিত্য চরম বেগবান গতিতে নতুন খাতে বইতে থাকল। তখন হতে আরবী ফার্সী ও সংস্কৃত শব্দগুলোর জোর কমে এল। এমনকি ওদের কিছু কিছু নিষ্কাশনও শুরু হল। ইংরেজি শিক্ষিতগণ বাংলা সাহিত্যকে নতুনভাবে নবীন রূপে তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান লেখক তখনও আরবী-ফার্সীর অনাবশ্যক বিড়ম্বনা ত্যাগ কবতে পারলেন না। ফলে তাঁরা পিছিয়ে পড়লেন। পরে সাহিত্যিক বরকতুল্লাহ ও মীর মুশারফ হোসেন, সৈয়দ ইসমাইল সিরাজি প্রমুখ ব্যক্তি বাংলা সাহিত্যে নব জাগরণের সৃষ্টি করলেন।

ইসলামি বাংলা সাহিত্য বলতে যা একদিন আকাশছোয়া প্রভাব ফেলেছে, তা ইসলামি পুঁথি সাহিত্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষার স্বর্ণযুগ

বাংলা ভাষার উন্নতি মুসলমান বিজয়ের ফল

(আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ)

বাঙ্গালাহ্ নামকরণ বা বাংলার গঠন যুগ :

বঙ্গ ও বাঙ্গালাহ্ শব্দের উৎপত্তি হিন্দু আমলেও সংস্কৃত সাহিত্যে ছিল। কিন্তু হিন্দু আমলে এই বঙ্গ বা বাঙ্গালাহ্ এই বাংলার কতকগুলো অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। বঙ্গ নামের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় আরণ্যক ব্রাহ্মণে, যেখানে এটাকে একটি ক্ষুদ্র জনপদরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। নদ-নদী-খাল-বিল পরিবেষ্টিত বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলগুলোকেই বঙ্গ নামে উল্লেখ করা হয়েছিল। ওই সময় বাংলার অন্যান্য অঞ্চলগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হত। যেমন পশ্চিমবঙ্গ 'রাঢ়' নামে পরিচিত ছিল। এমনকি ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে নদীয়া জেলার মানুষ বর্ধমান কিংবা বীরভূমে এসে নিজেদের 'রাঢ়' অঞ্চলের মানুষ বলে পরিচয় দিত (এটা আমার ছোটবেলায় স্বকর্ণে শোনা)। উত্তরবঙ্গ পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র ও লক্ষণাবতী নামে পরিচিত ছিল। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ আবার 'গৌড়' নামেও পরিচিত ছিল। আবার কখনও কখনও গৌড় বলতে সমগ্র বাঙলা দেশকেও বোঝান হত।

ঘটি ও বাঙ্গাল :

বহুদিন হতে উভয়বঙ্গে 'ঘটি ও বাঙ্গাল' শব্দ দুটি প্রচলিত আছে। এটা কারও দেওয়া নাম নয়। এরা দেশের পরিবেশ-পরিস্থিতির জন্য প্রকৃতির গর্ভ হতে জন্মলাভ করেছে। চিরদিনই পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা বেশ একটু মরুময় দেশ। শীতের পর বর্ষার আগমন পর্যন্ত এই কয়েক মাস পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃতি থাকে বড়ই রুক্ষ্ম-সূক্ষ্ম। বৈশাখীর মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড মাঝে মাঝে তার মাটিকে তপ্ত তামা বর্ণ করেও তোলে। আজ হতে পঞ্চাশ বছরের পূর্ব ইতিহাস একটু লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যাবে, পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া তখন কেমন ছিল। বিশেষ করে ওই কয়েক মাস।

তখনকার দিনে রাস্তা ছিল কাঁচা। পশ্চিমবঙ্গের মাঠগুলো বেশ একটু বড় ধরনের। এক হতে পাঁচ মাইল পর্যন্ত চলতে থাকে। এর মাঝে গ্রামের কোন নাম-নিশানা খুঁজে পাওয়া যায় না। বৈশাখীর খরদীপ্ত দাহ মাথায় নিয়ে সেদিনের পথিক বের হত ওই মরুময় পথে। মাঠের পর মাঠ পার হত। দেখা দিত পিপাসা নিবারণের জন্য পানীয় জলের ভীষণ অভাব।

সাধারণ মানুষের এই মর্মান্তিক দুঃখ নিবারণের জন্য দেশের কিছু ধনী ও জ্ঞানী ব্যক্তি হাত বাড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা তৈরি করলেন কিছু কাঁচা রাস্তা, খনন করলেন কিছু পুকুর। পথিপার্শ্বে পুকুরের ঘাট বাঁধিয়ে দিতেন। তখন হতেই প্রচলিত হল রাস্তা-ঘাট বলে প্রিয় শব্দটি। এখনকার দিনে লক্ষ্য করবেন রাস্তা আছে, কিন্তু ঘাট নেই। যদিও বা এখনো কিছু কিছু ঘাট চোখে পড়ে। সেগুলো আর ঘাট নয়, বাঁধানো ঘাটের ধ্বংসাবশেষ বা কালের বা বিগত দিনের শেষ চিহ্ন বা শেষ স্মৃতি। কিছুদিন পর এগুলোও আর চোখে পড়বে না। তখন গবেষকগণ পুরাণ গ্রন্থ থেকেই স্বাদ আস্বাদন করবেন। এখনো শহরে একটি কথা বেঁচে আছে—গাড়ি-ঘোড়া। কিন্তু আজকের দিনে গাড়ি আছে, ঘোড়া নেই। অনুরূপভাবেই গ্রামাঞ্চলে রাস্তা আছে, 'ঘাট' নেই।

তখনকার দিনে নলকূপের কোন প্রচলন ছিল না বললেই চলে। ধনী ধার্মিক ব্যক্তিগণ মানুষের কষ্ট নিবার্রণের জন্য পুকুর কাটাতেন। কিন্তু গ্রীষ্মকালে বহু পুকুরের জলও শুকিয়ে যেত। এমনকি

গ্রীষ্মকালে ছোটখাটো দিঘিগুলোও শুকিয়ে যেত। তখন পথিকগণ জলাভাবে নিদারুণ কষ্ট পেত। মাঠেঘাটে, পথিপার্শ্বে মানুষের এই মর্মান্তিক জলকষ্ট নিবারণের জন্য কিছু মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন—পথিপার্শ্বে মাঝে মাঝে কূপ খননের জন্য। এই কূপগুলোর জল খুবই শীতল ও স্বচ্ছ থাকত। পথিকগণ ভীষণ তৃপ্তিসহ এই জল পান করত।

এখন প্রশ্ন হলো, পথিপার্শ্বে কূপ। বহু দূরে গ্রাম। মাঠের পর মাঠ ধু-ধু করছে। পথিক এই জল কীভাবে তুলবে। এই জল তোলার জন্যই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যখনই কোথাও বের হত, সঙ্গে তিনটি জিনিস নিতই। ছাতা-ছড়ি ও একটি পিতলের ঘটি। ঘটিটি একটু ভারী হওয়া দরকার ছিল। নচেৎ ডুববে না। তখন বাড়ি থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে গেলেও বলা হত যে, বিদেশে বিভূমে যাচ্ছে। অবস্থা এমনই সকরুণ ছিল। ছাতা-ছড়ি ও ঘটি ব্যতীত কেউই বাড়ি হতে বের হত না। এই প্রাকৃতিক কারণেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে 'ঘটি' বলা হত।

তখনকার দিনে প্রায় প্রতিটি বড় গ্রামেই এক হতে তিনটি কূপ, পাত-কূপ, কূয়া বা ইন্দারা ছিল। আমাদের গ্রামে (কাঁটাডিহি-কেতুগ্রাম-বর্ধমান) এখনো ওই ইন্দারার ধ্বংসাবশেষ আছে। ছোটবেলায় আমি দেখেছি, কোন কারণে ইন্দারায় জল শুকিয়ে গেলে বা খারাপ হলে গ্রামের সমস্ত মানুষ 'ঠাকুর পুকুর', 'ঘোষপুকুর' ও 'তালবোনার' জল খেত।

তখনকার দিনে পূর্ববঙ্গকেই বিশেষভাবে বঙ্গ নামে অভিহিত করা হত। বাকিগুলো রাঢ়-পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় বা লক্ষ্ণাবতী নামে পরিচিত ছিল। তাই পূর্ববঙ্গকেই বাঙ্গলা এবং তথাকার অধিবাসীদের 'বাঙ্গাল' নামে অভিহিত করা হত। পরে মুসলিম আমলে সমগ্র দেশের খণ্ড-বিখণ্ড অংশগুলো একত্রে বঙ্গ বা বাংলা নামে পরিচিতি লাভ করে।

তবে এটাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিম আমলেই সর্বপ্রথম সমগ্র দেশটি বাংলা নামে অভিহিত হয়। কেননা, মুসলমান-শাসন আমলে বাংলার রাজনৈতিক সীমানা ভৌগোলিক সীমানার সঙ্গে এক হয়ে যায় এবং বাংলার যাবতীয় অঞ্চল বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসীদের ভাষাগত ঐক্যের সঙ্গে এক হয়ে মিলে যায়। এইভাবে মুসলিম শাসন সমগ্র বাঙ্গালীকে এক সাধারণ জীবনের আওতায় এনে এককে একত্রীকরণ করতে সক্ষম হয়। এবং তাদের এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির পটভূমিতে সন্নিবেশিত করতেও সফল হয়। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের দরবারে একটি জাতি হিসেবে ওই সময় থেকেই আজকের বাঙ্গালী ও বাংলার প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয়।

বাংলা সাহিত্যের গঠন যুগ :

হিন্দু আমলের অবহেলিত ও ঘৃণিত বাংলা ভাষাকে মুসলমান শাসনকর্তাগণ রাজসম্মান ও রাজমর্যাদা দান করেন। মুসলমান শাসকদের এই উদারনীতির ফলে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, এমনকি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের নিকটেও শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। ফলে তারা বাংলা সাহিত্যে তাদের অবদান রাখার সুযোগ লাভ করে। সর্বোপরি তদানীন্তন বাংলা ভাষা লাভ করে সমৃদ্ধ আরবী ও ফার্সী সাহিত্যের ভাব ও ভাষা সম্পদ। মুসলিম লেখক ও মুসলিম ঐতিহ্যের মানবীয় ও রম্য উপাদানগুলো মানবসমাজের সর্বজনীন আবেদন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি করে নবজীবনের সঞ্চার। তাই বাংলার মুসলমান রাজত্বের প্রাক্ মুগল আমল ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত গঠন যুগ।

বাংলা ভাষাভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা :

বাংলায় মুসলমান বিজয় বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন অঞ্চল আধিবাসীদের একত্রীকরণ করে একটি রাজনৈতিক ভাষাভিত্তিক ঐক্য গড়ে তোলে। এই উল্লেখযোগ্য সংহতির ফলে গড়ে ওঠে এক অনবদ্য বাঙ্গালী সাংস্কৃতিক পটভূমিকা। ফলে বাঙ্গালীর জীবনে সূচনা হয় একটি নূতন ইতিহাসের নবচেতনার। তখন তারা রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনের সুযোগ লাভ

করে। সুতরাং এই প্রদেশে সেদিন মুসলমান শাসন প্রবর্তিত না হলে 'বাংলা ও বাঙ্গালী' নাম, এই দুটোই আজকের বিশ্ব-ইতিহাসে এরূপভাবে মর্যাদার আসন লাভ করত কিনা সন্দেহের কথা। কেননা বাংলা ভাষার প্রতি সেদিনের ব্রাহ্মণদের নিদারুণ অবজ্ঞাসূচক ঔদাসীন্য ও অবহেলা এই ভাষার উন্নতিকে ত্বরান্বিত না করে বরং স্তব্ধ করেছিল। তখনকার সংস্কৃতি প্রভাবিত গৌড়ের হিন্দু রাষ্ট্র এবং সমাজের কাছেও বাংলা ভাষা ছিল যুগ যুগ ধরে অপাংক্তেয়। সুতরাং মুসলমান বিজয় ব্যতীত দূর অতীতের অবহেলিত বাংলা ভাষা আজকের অসামান্য গর্ব ও গৌরবের আসন থেকে বঞ্চিত হত। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় মুসলমান বিজয় কেবল মাত্র বাঙ্গালীর রাজনৈতিক ঐক্যেরই প্রতিষ্ঠা করেনি, বরং বাঙ্গালীর বাংলা ভাষাভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যেরও প্রতিষ্ঠা করেছিল।

সমাজে বাংলা ভাষা ও সাধারণ হিন্দুদের প্রতিপত্তি অর্জন :

বাঙলা দেশে মুসলমান বিজয় এই প্রদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এনেছিল এক বৈপ্লবিক আলোড়ন ও জাগিয়েছিল সর্বমানবের মানবিক আন্দোলন। ইসলামের গণতান্ত্রিক নীতি ও মূল্যবোধ এই বাংলার শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ আলোড়নের সৃষ্টি করে বাংলার ভাষা, সাহিত্য এবং শিক্ষা ও সমাজে আনে এক নীরব বিপ্লব ও নিরঙ্কুশ বিবর্তন। কেননা হিন্দু আমলে শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃত ভাষায় ব্রাহ্মণদের ছিল একচেটিয়া অধিকার। এবং এই সংস্কৃত ভাষাই ছিল ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির একমাত্র বাহন। এবং রাজদরবারের ভাষা হিসেবেও ছিল এর একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু আপামর জনসাধারণ ছিল সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। তাদের ভাষা ছিল নীচু শ্রেণীর মানুষের ভাষা বাংলা, যা ছিল একান্তভাবে অবহেলিত ও ঘৃণিত। মুসলমান শাসন প্রবর্তনের ফলে সংস্কৃত ভাষার উপর ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়। এই ভাবে বাঙ্গালীর মাতৃভাষা প্রাণের ভাষা রাষ্ট্রে ও রাজদরবারে, সমাজে এবং শাসনে গৌরবের আসন লাভ করে। এই নতুন সুযোগ-সুবিধা ও বিবর্তনের ফলে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ সমাজে সাহিত্যে ও বুদ্ধিবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ক্ষেত্রে এবং জীবন স্ফুরণ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান দখল করে ওই সময়ের সমাজে ও রাষ্ট্রে এবং জাতীয় জীবনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জন করে।

ধর্মীয় জগতে বাংলা ভাষা ও সাধারণ হিন্দুদের অবাধ স্বাধীনতা লাভ :

মুসলমান বিজয় অব্রাহ্মণ ও সাধারণ হিন্দুদের জন্য এনে দিল ধর্মীয় জগতে বিচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা। কোথাও বা আচরণের স্বাধীনতা, অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা, কোথাও বা চিন্তা কথা ও কাজের স্বাধীনতা। এককথায় ওই যুগে অব্রাহ্মণরা আর ব্রাহ্মণদের পদানত রইল না। ফলে যে সকল হিন্দু এতকাল ধর্মীয় সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে কোন প্রকার প্রবেশাধিকার পায়নি। এখন থেকে তারা ব্রাহ্মণদের কথিত অনন্তকাল নরকবাসের ভয় ও ভীতি ব্যতিরেকেই ধর্মীয় গ্রন্থাবলী পাঠ করার সুযোগ ও সাহস লাভ করল। তখন থেকেই তারা নিজেদের ধর্মগ্রন্থ নিজেরাই পাঠ করে ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এই নতুন সুযোগ তাদের জন্য ধর্মীয় বিষয়াদিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য ও তার কিছু-কিছুকে অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থাদি রচনা করার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের দ্বার খুলে দিল। এইভাবে ধর্মীয় জগতে অসংখ্য অবহেলিত হিন্দু লাভ করল নব চেতনার উন্মেষ ও নতুন জীবনের স্বাদ। মুসলমান বিজয়ীদের অপরের ধর্মকে জানার আগ্রহ এবং ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের এই উদারতা, সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার অকৃত্রিম অনুপ্রেরণার প্রভাবেই হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত প্রথম বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। যার ফলে নিম্নশ্রেণীর সাধারণ হিন্দুগণও তাদের ধর্মগ্রন্থ পাঠের ও ধর্মীয় গ্রন্থাদির সঙ্গে সুপরিচিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করল। এইভাবেই

মুসলমান বিজয়ের ফলেই বাংলা ভাষা এবং বাংলার সাধারণ হিন্দু সমাজ তাদের ধর্মীয় জগতে লাভ করল পূর্ণ স্বাধীনতা।

সমাজজীবনে বাংলা ভাষা ও সাধারণ হিন্দুদের সম্মান লাভ :

মুসলমান আমলের যে কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তা মুসলিম বিজয় নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কাছে শিক্ষা, সম্মান ও জ্ঞানের সিংহদ্বার খুলে দিয়েছিল। এই যুগেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বঞ্চিত লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত অব্রাহ্মণ হিন্দুরা অবলীলায় লাভ করল শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের পূর্ণ অধিকার। এবং সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করে প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। ফলে ধোপা, নাপিত, ঝাড়ুদার, স্বর্ণকার কর্মকার, ও নিম্নশ্রেণীর অগণিত হিন্দু এককথায় সকল অব্রাহ্মণ হিন্দু বাংলা ভাষার উন্নয়নে আপন আপন প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে সসম্মানে অংশগ্রহণ করে। জাতীয় জীবনের অস্থি ও মজ্জাকে অসাড় করে তুলতে পরাধীনতার যে গ্লানি, মুসলিম বিজয়ের পূর্বে অগণিত অবহেলিত অব্রাহ্মণ হিন্দুগণও তা হতে নিষ্কৃতি লাভ করে নি। তাই মুসলিম বিজয় তাদের জন্য এবং বাংলা ভাষার জন্য ছিল আল্লাহর আশীর্বাদস্বরূপ।

ক্ষণজন্মা পুরুষ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও বাংলা ভাষার উত্তরণ :

মুসলিম বিজয় বাঙলা দেশে যে নতুন চিন্তাধারা, আদর্শের সঞ্চার করে, যে চিন্তাধারা ও আদর্শে মানুষে মানুষে ছিল না কোন পার্থক্য, যে আদর্শে মানুষ কোন মানুষের দেবও নয়, দেবতাও নয়। যে চিন্তাধারা যে আদর্শ মানুষকে এনে দিয়েছিল তার শাশ্বত ব্যক্তি-অধিকার ও মানবিক মর্যাদাকে। যার কল্যাণস্পর্শে হিন্দু সমাজেও এল বিশাল জাগবণ। যে জাগবণ জন্ম দিল ক্ষণজন্মা পুরুষ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকে। তাই চৈতন্যদেব মুসলিম বিজয়েরই পাকা ফসল অমৃত ফল। যেমন 'ভক্তি আন্দোলনের' জন্মদাতা ইসলামের সূফীবাদ। ইসলামের সূফীগণ ভারতে প্রবেশ না করলে এখানে ভক্তি আন্দোলন কোনদিনই জন্ম নিত না। তাই Bhakti movement is the by-product of Sufism. চৈতন্যদেবের সময়েই জন্ম নিল বৈষ্ণব ধর্ম, ধর্ম ঠাকুর, সত্যপীর প্রভৃতি ধর্মমত। ব্রাহ্ম ধর্মেরও পরোক্ষ জন্মদাতা ইসলামধর্ম। এই কারণেই ইসলাম নিছক একটি ধর্ম মাত্রই নয়। বরং সমগ্র বিশ্বব্যাপী একটি আদর্শ আন্দোলন।

আমার দুই মহান শিক্ষাগুরু আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আচার্য সুকুমার সেন আমাকে বলেন—'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব না ঘটলে বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নাম-নিশানাও থাকত না।' প্রবল বেগে সকলেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিচ্ছিল। চৈতন্যদেবই ওই স্রোতকে রুদ্ধ করলেন।

এই যুগ আন্দোলনের ফলে এবং ক্ষণজন্মা পুরুষ চৈতন্যদেবের কল্যাণ ও কৃপায় বহু পুরাতন পুরোহিতশ্রেণীর বহু যুগের অন্ধ নাগপাশ থেকে মুক্তি পেল হিন্দু-মানসিকতার বুদ্ধিন্দ্রিয়বোধ। এ সব কিছুরই মূলে ছিল মুসলিম বিজয়। এবং মুসলিম বিজয়ের মূলে ছিল মহান ইসলামের মহৎ আদর্শ।

সৃষ্টি হল বাংলা সাহিত্যের প্রশস্ত রাজপথ, সৃষ্টি হল বৈষ্ণব ধর্মের নানা ধর্মীয় গ্রন্থ। ধর্ম ঠাকুরের পূজামূলক নানা কবিতা, মঙ্গলকাব্য ও সত্যপীরের পাঁচালী প্রভৃতি। ফলে সমৃদ্ধ হল বাংলা সাহিত্য।

সুতরাং মুসলিম-বিজয় বাংলার অব্রাহ্মণ হিন্দুদের জন্য যেমন ছিল সৌভাগ্যের স্পর্শমান, ঠিক বাংলা সাহিত্যেব জন্য তেমনি ছিল অন্ধকারের গুহা হতে আলোকের দ্বীপে উত্তরণ, নিপীড়িত নিষ্পীড়িত মানুষের জন্য ছিল জীর্ণ-শীর্ণ কুটির হতে রাজদরবারে আসনলাভ।

বাংলায় প্রথম মুসলিম শাসন :

১।	সুলতান মহম্মদ ঘোরী	১২০১-১২০৬ খ্রীঃ
২।	দিল্লির অধীনে	১২৬০-১৩৪০ খ্রীঃ

৩।	ফখরুদ্দিন শাহ	১৩৪০-১৩৪৫ খ্রীঃ
৪।	সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ	১৩৪৫-১৩৫৭ খ্রীঃ
৫।	সেকান্দর শাহ	১৩৫৭-১৩৮৮ খ্রীঃ
৬।	গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ, গণেশ প্রমুখ	১৩৮৮-১৪২০ খ্রীঃ
৭।	আবিসিনিয়া হাবশি	১৪২০-১৪৯৩ খ্রীঃ
৮।	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ
৯।	নুসরাত শাহ	১৫১৯-১৫৩১ খ্রীঃ
১০।	ফিরোজ শাহ	১৫৩১-১৫৩২ খ্রীঃ
১১।	গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ (হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান)	১৫৩২-১৫৩৮ খ্রীঃ

বাংলা ভাষার উন্নতিতে মুসলমান শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতা

একথা সর্বজনবিদিত যে, সর্বপ্রথম মুসলমান শাসকরাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে রাষ্ট্র ও সমাজে মর্যাদাপূর্ণ আসন দান করেন। বহুদিনের ঘৃণিত ও অবহেলিত বাংলা ভাষাকে রাজদরবারে রাজসম্মান দান করেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী কবি ও বিদ্বান ব্যক্তিদেরও রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি মুসলমান রাজাবাদশাদের এই অকৃপণ অবদান, অকৃত্রিম উদারতা ও প্রাণভরা ভালবাসা একদিন ব্রাহ্মণদের দৌরাত্ম্য হতে ও সংস্কৃত ভাষার চাপে নিষ্পিষ্ট বাংলা ভাষাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। এই ভাবেই মুসলমান শাসকগণ বাংলা ভাষাকে রাজপথে রাজদরবারে মর্যাদার আসনে সমাসীন করে তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির সোপানে পথিকৃতের আসন লাভ করেন।

এই প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেন—"হিন্দু রাজাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকলে বাংলা ভাষা রাজদরবারে কোনদিনই আসন লাভ করার কোন সুযোগই পেত না। মুসলমান শাসক ও আমির - ওমরাহর পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহের ফলে হিন্দু জমিদাররাও পরিশেষে বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে অনুপ্রাণিত হন।"

বাংলা সাহিত্যের আদি ইতিহাস লক্ষ্য করলে যে কথা সহজেই প্রতীয়মান হয়, তা মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলা ভাষা খুবই আদিম স্তরে দাঁড়িয়েছিল। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সেদিন বাংলা ভাষার কোন সুস্পষ্ট রূপই ছিল না এবং ভবিষ্যতেও সে যে কোন স্পষ্ট রূপ লাভ করবে, তাও ছিল অতীব অস্পষ্ট। তখন কেবলমাত্র সামান্য সংখ্যক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য এর চর্চা করছিলেন। তাঁদের রচনা ছিল গৌড়ীয় প্রাকৃত ভাষায় লিখিত এবং তা চর্যাপদ অর্থাৎ রহস্যমূলক বা হেঁয়ালি গান নামে পরিচিত ছিল। ডঃ মহম্মদ এনামুল হক মনে করেন—" আর্যদের কথ্যভাষা ও স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষার সংমিশ্রণের ফল 'গৌড়ীয় প্রাকৃত' ভাষার জন্ম। অদ্ভুত পদ্ধতিতে রচিত ও রহস্যমূলক অর্থবাহী এই চর্যাপদসমূহ কেবলমাত্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছেই বোধগম্য ছিল। তবুও এই চর্যাপদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিম নিদর্শন।"

মুসলমান শাসকদের উদার পরিবেশে, সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে সযত্নে লালিত-পালিত হয়ে বাংলা ভাষার এই অসহায় ভ্রূণ শিশু একদিন অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ধীরে ধীরে বর্ধিত হতে থাকে। এবং যথাসময়ে বাংলা ভাষার নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে ভাষাজগতে স্থান লাভ করে। বাংলা ভাষার জন্মলগ্নের ইতিহাসে এটা খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা যে, যাঁরা ছিলেন মুসলমান শাসক ও

অভিজাত সম্প্রদায় তাঁদের নিজদের ছিল একটি বিশেষ সমৃদ্ধশালী ভাষা, যার নাম পারসী বা ফার্সী। কিন্তু তবুও তাঁরা তাঁদের আপন ভাষাকে ত্যাগ করে আপামর প্রজাসাধারণের উন্নতিকল্পে তাদেরই মাতৃভাষা, বাংলা ভাষাকে অপরিমিত পৃষ্ঠপোষকতা ও অসামান্য উৎসাহ দান করেন। এই দিক থেকে মুসলমান শাসকগণ তাঁদের প্রাণখোলা পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সযত্নে লালন-পালনের জন্য বাংলা ভাষার জনকের ও জননীর সম্মান লাভ করেছেন, তথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেছেন।

বাংলা ভাষার ভ্রূণশিশুর জন্ম বৃত্তান্তের ইতিহাসে একটি কথা সহজেই মনে সাড়া দেয়, মুসলমান রাজা-বাদশাদের মনের কোণে বাংলার ভাষার উন্নতিকল্পে এই উদারতা, সহনশীলতা ও পরভাষা, সহিষ্ণুতা কেনই বা জন্ম নিয়েছিল। কেনই বা তাঁরা এই প্রসঙ্গে এত উদার ও অকৃপণ হলেন, কেনই বা তাঁরা তাঁদের আপন সমৃদ্ধিশালী ভাষাকে প্রজাবৃন্দের উপর চাপিয়ে দিলেন না। এর যথাযথ উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় মুসলিম রাজা-বাদশাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে। যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শ, উদারতা ও সহনশীলতা। সুতরাং মুসলমান শাসকবৃন্দ ইসলামের এই মহান আদর্শকেই অকুণ্ঠচিত্তে অনুসরণ ও সমর্থন করেছিলেন বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিতে ও বাঙ্গালীকে আপন করতে। এইভাবে আরবের মরুভূমি ও মরূদ্যানের ঊষর-মাটি অধ্যুষিত ইসলাম একদিন সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার মাটিতে গতিময় করল ও প্রাণময় করল বাংলা ভাষাকে, এবং প্রভাবান্বিত করল ও প্রাণবন্ত করল বাঙ্গালী জাতিকে।

মুসলমান শাসকগণ অন্য জাতির শিক্ষা ও জ্ঞানের যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। এবং সর্বত্র প্রজাসাধারণের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদর্শকে রক্ষা করেছেন। শত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও উদার ও শিক্ষিত মুসলমান শাসকগণ বাংলা ভাষার মান ও মর্যাদা এবং গতি ও শ্রীবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেন। অধিকন্তু রাজা-বাদশাদের সঙ্গে হাজার হাজার বহিরাগত মুসলমানও এই দেশে এসে স্থায়ীভাবে এখানেই বসতি স্থাপন করেন। রাজা-বাদশাদের মতো তাঁরাও এই দেশকে আপন দেশ রূপে বরণ করেন। এবং এই মাটিরই সন্তান রূপে পরিচয় দিতে গর্ব ও গৌরব বোধ করেন। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার আবহাওয়া ও বাংলার ভাষা, সব কিছুকেই তাঁরা চিরদিনের জন্য আপন করে নেন।

রাজনৈতিক কারণেও দূরদর্শী মুসলিম শাসকগণ স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন। আচারে-বিচারে, ব্যবহারে-আহারে-বিহারে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, ভাবে ও ভাষাতে এবং স্নেহ ও শাসনে এক হয়ে যান। মুসলিম শাসকবর্গ এই দেশে স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকার কায়েম করার পরিকল্পনায় এই দেশের সব কিছুর সঙ্গেই সুপরিচিত হওয়ার প্রয়োজনকে একান্তভাবেই অনুভব করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে বাংলা ছিল একমাত্র বাহন ও জনগণের ভাষা, যার মাধ্যমে তাঁরা অসংখ্য অধিবাসীদের মনোভাবকে জানতে ও বোঝাতে পারতেন। এবং তাঁদের সঙ্গে ভাবের বিনিময় ও চিন্তাধারার আদান প্রদান করতে পারতেন।

বাংলা ভাষা অন্য এক কারণেও অসাধারণ পুষ্টিলাভ করে। সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের প্রচার ও তার শিক্ষার প্রসার বাংলাভাষাকে অপরিমিত শক্তি দান করে। কেননা সূফী ও দরবেশগণ এ দেশের মানুষের মধ্যে তাদেরই স্থানীয় কথ্যভাষায় ধর্ম প্রচার করতেন। তাঁরা তাদের একান্ত সান্নিধ্য লাভ করতে পারতেন একমাত্র বাংলা ভাষার মাধ্যমেই। সুতরাং এই বাংলা ভাষাই ছিল তাঁদের প্রচারের একমাত্র বাহন ও হাতিয়ার। সূফী ও দরবেশগণ একথাটি মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাধারণ অগণিত ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ আরবী ও ফার্সী ভাষা বোঝে না। যার ফলে তারা ইসলাম ধর্মের সঠিক শিক্ষা ও আদর্শের সঙ্গে প্রাণ দিয়ে পরিচিত হতে পারছে না। সূফী ও দরবেশগণের এই

বোধোদয়ই তাঁদেরকে ইসলাম ধর্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকগুলোকে সরল সহজ বাংলা ভাষায় লিখতে অনুপ্রাণিত করে। তাঁদের এই অকৃত্রিম অনুভূতিও তদানীন্তন কবি সাহিত্যিকদেরও জনসাধারণের ভাষায় গ্রন্থ রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এইভাবে সুফী ও দরবেশগণের লেখনী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের কলম বাংলা ভাষার পরিচর্যার ক্ষেত্রে এক অভিনব আলোড়ন ও অবদানের সৃষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা যাদের মাতৃভাষা, তাঁরা সকলেই একাগ্র চিত্তে মাতৃভাষার এই উত্থান ও উন্নতিমূলক আশাতীত অগ্রসরকে অন্তরের সঙ্গে বরণ করলেন। সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই সমূহ উন্নতির পশ্চা'তে ছিল ইসলামের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ও জ্ঞানালোকদীপ্ত কল্যাণমুখী পরিবেশ এবং মুসলিম শাসকবৃন্দের সর্বজনীন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ, অকৃত্রিম অনুরাগ এবং প্রাণভরা পৃষ্ঠপোষকতা। এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য মুসলিম শাসকবৃন্দের মধ্যে বিশেষ করে হোসেন শাহের রাজত্বকাল বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেছে।

বাঙ্গালী কবি ও সাহিত্যিকদের প্রতি মুসলিম শাসকবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতা ঃ

মধ্যযুগীয় বাংলার মুসলিম শাসনকাল ছিল বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। কবি ও সাহিত্যিকদের প্রতি মুসলিম শাসকবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়। একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, সেদিনের বাংলা সাহিত্যের চারাটি মুসলিম শাসকবৃন্দের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত আজকের মহীরুহতে পরিণত হত কিনা গভীর সন্দেহের কথা। এমন কি বাংলা ভাষার এই চারাটি সেদিনের তথাকথিত ব্রাহ্মণদের দৌরাত্ম্যে সংস্কৃত ভাষার কুঠারাঘাত দ্বারা নির্মূল হওয়ারও আশঙ্কা রাখত। এই সমূহ ঝড়-ঝঞ্ঝা ও মারাত্মক বিপদ হতে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করেছে সেদিনের মুসলিম শাসকবৃন্দের সাহায্য ও সহানুভূতি।

মুসলিম শাসকবৃন্দের সাহায্য ও সহানুভূতি বাংলা সাহিত্যের নব দিগন্তের সূচনা করে। বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার পূর্বে বাংলা সাহিত্য দেবমাহাত্ম্য কাহিনী নিয়েই ব্যাপৃত থাকত ; প্রণয়কাহিনীর দিকে কোন দৃষ্টি ছিল না।

আচার্য সুকুমার সেন বলেন—"হিন্দু কবিরা প্রধানত দেবমাহাত্ম্য কাহিনী নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন, বিশুদ্ধ প্রণয়কাহিনীর দিকে তাঁদের তেমন নজর ছিল না। হিন্দু কবিদের কাছে লৌকিক সাহিত্য ধর্ম-সাহিত্যেরই অঙ্গ ছিল। কিন্তু মুসলমান কবিদের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের কোন আবশ্যিক যোগাযোগ ধরা পড়েনি। সুতরাং দেবমাহাত্ম্য নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ কাহিনী রচনায় তাঁরা নিরঙ্কুশ ছিলেন। এই জন্যই হিন্দি ও বাংলা সাহিতের রোমান্টিক কাহিনী রচনায় মুসলমান কবিরাই অগ্রণী ও একাধিপতি।"

সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রীঃ) নিজে ছিলেন বিদ্বান ব্যক্তি ও বিদ্যোৎসাহীদের গুণগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষক। তিনি প্রতিভাবানদের প্রতিভার ও কৃতিমানদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিতে কোনদিনই দ্বিধাবোধ করতেন না। এই দিক দিয়ে তাঁর দরবার ছিল অবারিত। সুলতানের এই মানসিকতার জন্য বাংলা ভাষার উন্নতি হয় ত্বরান্বিত। রাজ-অনুগ্রহে আশান্বিত হয়ে একজন প্রতিভাশালী মুসলিম কবি শাহ মহম্মদ সগীর তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'ইউসুফজুলায়খা' প্রণয়ন করেন। এই কাব্যখানি বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করে। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে রম্য রচনা বলে কিছুই ছিল না। এটি ছিল একটি ধর্মীয় ও রম্য উপাখ্যান। এই গ্রন্থে কবি বাঙ্গালী কবিদের জন্য নতুন বিষয়বস্তু হিসেবে মানবীয় রম্য-উপাখ্যান প্রবর্তন করে বাংলা সাহিত্যের নবদ্বার উন্মোচন করেন।

সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রীঃ) ছিলেন বাঙ্গালি কবিদের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। তিনি কবি মালাধার বসুকে 'গুণরাজখান' উপাধিতে ভূষিত করে ভগবতের বাংলা অনুবাদ

করার জন্যে তাঁকে নিয়োজিত করেন। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে।

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৭ খ্রীঃ) ছিলেন বাঙ্গালী কবি ও সাহিত্যিকদের সর্বাপেক্ষা বড় পৃষ্ঠপোষক। বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তাঁর দান অতুলনীয়। বাংলার যাবতীয় আমির-ওমরা ও শাসনকর্তাগণ বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সুলতানের মহান দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করেন। যার ফলে বাঙ্গালী লেখকদের বুদ্ধিবৃত্তি ও সাহিত্যিক প্রতিভা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। সুলতান হোসেন শাহের এই জ্ঞানদীপ্ত পরিবেশ তাঁর শাসন আমলকে শিক্ষানিকেতনে পর্যবসিত করেছিল। ফলে কবি-সাহিত্যিক লেখক সকলের জন্যই এটি সৃষ্টি করে প্রতিযোগিতার জন্য এক অনুকূল পরিবেশ। এই অনুকূল পরিবেশের জন্যই বাঙ্গালী কবি ও সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনার শ্রেষ্ঠ সম্ভার আমাদের উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই জন্যই সম্রাট হোসেন শাহের রাজত্বকাল বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। সে যুগের সকল কবি ও সাহিত্যিক মহামান্য সুলতানের এই উদার অনুগ্রহকে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থের রচয়িতা যশোরাজ খান হোসেন শাহের দরবারে একজন রাজকর্মচারী ছিলেন। আবার বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস তাঁদের 'মনসামঙ্গল' ও 'মনসাবিজয়' কাব্য হোসেন শাহ আমলেরই অমর সৃষ্টি। এই দুই ক্ষণজন্মা লেখকই সুলতানের মহানুভবতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন।

হোসেন শাহের সেনাপতি ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লস্কর পরাগল খান তাঁর দরবারে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের দর্শন আলোচনায় সমান আগ্রহ প্রদর্শন করেন। এই আলোচনাই একদিন তাঁকে মহাভারতের বঙ্গানুবাদে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তিনি এই বিরাট কাজের দায়িত্ব দেন তাঁর যোগ্যতম সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে। কবি এই মহান কাজ আরম্ভ করেন সুলতান হোসেন শাহ ও তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি লস্কর পরাগল খানের চরম মহানুভবতার কথা স্বীকার করে। লস্কর পরাগল খান এই কাজের সমাপ্তি দেখে যেতে পারেননি, এবং কবি পরমেশ্বরও যে কাজের সূচনা করেছিলেন, তা সমাধা করার সময় ও সুযোগ পাননি। পরবর্তীকালে পরাগল খানের সুযোগ্য পুত্র ছুটি খান তাঁর সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে মহাভারতের এই অবশিষ্টাংশের বঙ্গানুবাদের কাজ সমাধা করতে দেন।

সুলতান হোসেন শাহের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীগণও বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার নীতিকে অব্যাহত রাখেন। সুলতান হোসেন শাহের সুযোগ্য পুত্র যুবরাজ নসরৎ শাহও (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ) অন্য এক কবীন্দ্র পরমেশ্বরের দ্বারা মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করান। খিদ্যাপতি নামে পরিচিত কবিশেখর সুলতান হোসেন শাহও নসরৎ শাহের দরবারে রাজকর্মচারী ছিলেন। সুলতান নসরৎ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহও (১৫৩২-১৫৩৩ খ্রীঃ) বাঙ্গালী কবিদের চরম উৎসাহ ও উদ্দীপনাদান করেন। শ্রীধর নামক প্রতিভাবান এক সুন্দর কবি তাঁর রাজানুগ্রহে একটি সুন্দর রম্য কাব্য বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন।

এইভাবে মুসলমান শাসনকর্তাগণ তাঁদের ওপর পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা বাংলার কবি-সাহিত্যিক ও লেখকদের অপরিমিতভাবে উৎসাহিত করে গেছেন। যার নিটফল হয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এবং বাঙ্গালী জাতির শতাব্দীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন। মুসলমান সুলতানদের এই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাকে শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সীমারেখায় সীমাবদ্ধ করলে মহানুভব সুলতানদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করা হয় না। কেননা কতিপয় সুযোগসন্ধানী, স্বার্থান্বেষী সংকীর্ণমনা ব্রাহ্মণ সন্তান ব্যতীত অগণিত অবহেলিত হিন্দু নর-নারীকে তাদের আপন ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত করার নিমিত্ত তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মুসলিম শাসকবৃন্দ সমগ্র হিন্দু সমাজের শিক্ষা-সম্মান ও জ্ঞানের রুদ্ধদ্বার খুলে দেন। এই দিক থেকে বাংলার হিন্দু সমাজের কাছে সেদিনের মুসলিম শাসকবৃন্দ চির সাধুবাদের যোগ্য।

এছাড়াও জাতীয় জীবনে মধ্যযুগীয় বাংলার শাসকবৃন্দের সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য অবদান বলতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রজাবৃন্দের কল্যাণে প্রজাবৎসল সুলতানগণের অভেদ কল্পনা ও মানুষে মানুষে একাত্মতাবোধ। এবং এই চেতনাবোধ হতেই তাঁরা তাঁদের রাজদরবারে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নততর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমঝোতা সৃষ্টিতে বঙ্গ-সংস্কৃতির এক অপূর্ব সমন্বয় এবং জাতীয় ঐক্যের নিবিড় নিশ্চিদ্র পটভূমিকা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। এই ক্ষেত্রেই মুসলমান শাসকবৃন্দ সত্যিকারেই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের মহান আদর্শ, অগ্রদূত ও পথিকৃৎ।

মধ্যযুগে বাংলা ভাষার উন্নতিতে মুসলমান কবিদের অবদান

বাংলা সাহিত্যে ইসলামি ঐতিহ্য ও মানবতার আদর্শ :

বাংলা সাহিত্যের উন্নতির পেছনে মুসলিম কবিদের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁদের এ অবদান ছিল সংখ্যা ও গুণগত উভয় ক্ষেত্রে অসামান্য। যার ফলে বাংলা সাহিত্য ব্যাপকভাবে ঐশ্বর্য মণ্ডিত হয়ে ওঠে। নতুন ভাবধারা, বিষয়বস্তু ও ভাষার নব নব উপাদান বাংলা সাহিত্যের দশ দিগন্তকে প্লাবিত করে তোলে। মুসলমান কবিগণই সর্বপ্রথম ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে প্রচলন করেন বিশ্বজনীনতা ও মানবতার আদর্শ। তাঁরা এক সঙ্গে ধর্ম বিষয়ক, ধর্মীয় ইতিহাস, রম্য রচনা ও বীর গাথা প্রভৃতি বিষয়ে কাব্য রচনা করেন। স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত রচনাগুলো বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ঐতিহ্যের উন্নয়নকেও উৎসাহিত করেছিল।

বাংলা সাহিত্যে তিনটি ঐতিহ্য :

মুসলমান শাসন আমলে বাংলা সাহিত্যে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্যের ধারা প্রবাহিত ছিল, যথা বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম। বৌদ্ধ ঐতিহ্য বলতে তখন যা ছিল, তা কেবলমাত্র প্রাচীন বাংলা ভাষার সূচনা মাত্র, যা বাঙলা দেশে মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ ও হিন্দুধর্মের চাপে বড়ই দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণদের এই অত্যাচারের ফলে সে যুগের বৌদ্ধগণ মুসলমান শাসনকে ভগবানের আশীর্বাদ ও মুক্তিরূপে স্বাগত জানান। তাঁদের এ মনোভাব 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক কবিতায় প্রতিফলিত হয়। ব্রাহ্মণদের এই অকথ্য অত্যাচারে অসংখ্য বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়। এই সমস্ত নাড়া বৌদ্ধগণকে তদানিন্তন ব্রাহ্মণগণ, আপন ধর্মচ্যুত পতিত নাড়া বলে গালি দিত। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের হিন্দু-মুসলিম সমাজে 'পাতিনেড়ে' শব্দটি প্রবাদবাক্য রূপে প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-ঐতিহ্য ছিল একান্তভাবেই পৌরাণিক, যা শুধু দেব-দেবী ও অতি প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে জড়িত ছিল। মানবজীবন, মানবসমাজ, মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-প্রীতি, প্রণয়-ভালবাসা, অনুরাগ-বিরাগ, বিরহ-মিলন, যুবক-যুবতীগণের অবাধ প্রেম প্রভৃতির কোনটিই সেদিনের বাংলা সাহিত্যের হিন্দু ঐতিহ্যের অংশরূপে বিধৃত হওয়ার সুযোগ ও সম্মান লাভ করেনি।

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য :

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য বলতে, সেদিনের মুসলমান কবিরা ধর্মীয় কিংবা ইসলামি ঐতিহ্য ব্যতীতও বাংলা সাহিত্যে আমদানি করলেন বিশ্বজনীনতা, মানবতার আদর্শ এবং সর্বোপরি রম্য-উপাদান। তাঁদের কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়বস্তু ছিল—মর্ত্যের মানুষ, মানুষের রোমাঞ্চ, তাদের অপূর্ব কার্যাবলী, দুঃসাহসিক অভিযান, দুর্বার চিন্তাধারা, অন্তরের অবেগ ও অনুভূতির চরম উচ্ছ্বাস।

তাঁদের চিন্তাধারায় কল্পনা ও অতিকল্পনা যে ছিল না, এমন নয়। তবে সেই কল্পনার নায়ক-নায়িকা ছিল এই দৃশ্যমান জগতেরই পুরুষ ও রমণী, যুবক ও যুবতী, কোন দেব-দেবী নয়। তাদের নায়ক-নায়িকার কার্যাবলী মোটেই বাস্তববিরোধী ছিল না। তারা ছিল এই পৃথিবীর রক্ত-মাংসের মানুষ। তাই বাংলা সাহিত্যের বস্তুতন্ত্রীয় উপাদান ও রোমাঞ্চকর প্রেমমূলক উপাখ্যান এ দুটোই মুসলমান কবিদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান। মুসলমান কবিদের এই চিন্তাধারা হিন্দু কবিদেরও ব্যাপকভাবেই প্রভাবান্বিত করে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি কবি শাহ মহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখার প্রণয়ন'। এটি ছিল বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম রম্যকাব্য, প্রেমের উপাখ্যান ও মানবধর্মী সাহিত্য। এই কাব্যগ্রন্থটি একদিন বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবের সূচনা করেছিল। মহম্মদ সগীর ব্যতীত আরও অনেক মুসলমান কবি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বহু প্রেমের কাব্য রচনা করেন। যেমন কবি সাবিরিদ খানের 'হানিফা ও কয়রা পরী' কাব্য, দোনাগাজীর 'সয়ফুল মূলক' ও কবি দৌলত উজির বাহরাম খানের বিশ্ববিখ্যাত 'লায়লামজনু'। এইভাবে মুসলমান কবিগণ বাংলা সাহিত্যে আমদানি করলেন ইসলাম ঐতিহ্য, বিশ্বজনীনতা, মানবতার আদর্শ ও মানবধর্মী আদর্শ সাহিত্য। মুসলমান কবিগণ আরবী-ফার্সী সাহিত্যের রম্য উপাখ্যান থেকে তাঁদের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। এবং শিশুপ্রায় বাংলা সাহিত্যকে বিষয়বস্তুর ঐশ্বর্য, ইসলামের ঐতিহ্য ও চিন্তাধারার লালনে-পালনে ভরা যৌবনে উপনীত করেন।

বাংলা সাহিত্যে নৈতিকতা বোধ :

মুসলমান কবিগণ বাংলা সাহিত্যের নৈতিক দিকটির প্রতি মনঃসংযোগ করেন। এবং বাংলা সাহিত্যকে একটি সম্মানজনক মর্যাদায় উন্নীত করেন। মুসলমান কবি ও লেখকগণ তাঁদের রচিত প্রেম কাহিনীসমূহে নায়ক-নায়িকাদের সতীত্ব ও নৈতিকতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাঁরা মানবীয় গুণাবলী, মনের বিশুদ্ধতা ও প্রেমের পবিত্রতার উপর জোর দেন। ইসলাম ধর্ম বলে—যুবক এবং যুবতীগণ উভয় উভয়কে দেখে ভালবেসে, পছন্দ করে বিয়ে করুক। না দেখে নয় এবং বিয়ের পূর্বে কোনরূপ নোংরামি করেও নয়। ইসলামের এই পরিণয়গত বিশুদ্ধ প্রথা বা নীতিটিকে মেনেই মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকগণ অগ্রসর হয়েছিলেন। পবিত্র কোরআন মানুষকে ভোগ করতে বলেছে, সে ভোগ্যবস্তু যাই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। তবে একান্ত কঠিন সর্ত—তাকে অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুকে পবিত্র হতেই হবে। কোরআন : সূরা বাকারাহ্ ২ : ১৭২, ২৩ : ৫১। প্রেম-প্রীতিতে ইসলামে কোন বাধা নেই। তবে সীমালঙ্ঘনে বাধা আছে। ইসলামে অবৈধ যৌনমিলন একেবারেই নিষিদ্ধ। কোরআন ৪ : ১৫-১৬, ১৯, ২৫, ১৭ : ৩২, ২৩ : ৫, ২৪ : ২, ৩৩ : ৩০, ২৫ : ৬৮, ৭০ : ২৯, ৩০।

কোথাও কোথাও তাঁরা নায়ক-নায়িকার প্রেমকে সূফী প্রেমে উন্নীত করে মর্ত্যের প্রেমকে করেছেন স্বর্গের স্পর্শমাখা পবিত্র ধন। বাংলা সাহিত্যের এই নৈতিকতার অধ্যায়ে যখন হিন্দু ঐতিহ্যের পবিত্র দেব-দেবীর অপবিত্র প্রেমকে পূজা করার মধ্যে মানুষের জীবনের নৈতিক বোধ অনুপস্থিত ছিল, তখন বাস্তবিকই মুসলমান কবিদের এই নৈতিক ঐতিহ্যবাহী রম্য-কাব্য ছিল বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব ও চরম বিস্ময়কর ঘটনা। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে নৈতিকতাবোধ মুসলমান কবিদেরই অবদান।

বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক অবদান :

মুসলমান কবিরা ছিলেন বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস সাহিত্যের পথিকৃৎ। তাঁরা ইসলামের মহানবীর অলৌকিক কার্যাবলী, সাহাবাদের অসাধারণ ত্যাগ ও তিতিক্ষা, ন্যায়পরায়ণতা, সাধুতা, বীরত্বব্যঞ্জক কীর্তিকলাপ প্রভৃতিকে ভিত্তি করে রচনা করেন তাঁদের বিজয়কাব্য সমূহ। এই সমস্ত কাব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার করা ও মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের আবেগ সৃষ্টি করা। সুলতান ইউসুফ শাহের সভাকবি (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রীঃ) শেখ জৈনুদ্দিনই প্রথম রসুলের অসাধারণ ও

অলৌকিক কৃতিত্বকে অবলম্বন করে একটি বিজয়কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম 'রসুল বিজয়'। ফার্সী ভাষায় রচিত একখানি হাদিসগ্রন্থ থেকে তিনি তাঁর কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেন। শেখ জৈনুদ্দিনের অনুকরণে অন্যান্য বহু মুসলমান কবিও রসুল বিজয় কাব্য রচনা করে একে জনসাধারণের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় করে তোলেন। এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক রচনার মধ্যে শেখ ফয়জুল্লার 'গাজীবিজয়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই কাব্য সুলতান বারবক শাহের বিখ্যাত সেনাপতি মুজাহিদ দরবেশ শেখ ইসমাইল গাজীর জীবন অবলম্বনে রচনা করেন।

মুসলমান কবিদের এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, মুসলমান কবিগণ তাঁদের ঐতিহাসিক রচনার বিষয়বস্তু কেবলমাত্র মুসলিম বীর বা খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষবিজয়' বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য গোরক্ষনাথের শিক্ষা ও অলৌকিক কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে রচিত ছিল। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্য বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এইভাবে মুসলমান কবিরা নাথ ধর্ম ও নাথগুরুদের শিক্ষা ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করেও বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস বিষয়ক সাহিত্যের পথিকৃতের মর্যাদালাভ করেন।

বাংলা ভাষায় মরমী সাহিত্য :

মুসলিম কবিগণ বাংলা ভাষায় মরমী সাহিত্যের প্রবর্তনের জন্যও কৃতিত্বের দাবিদার। পারস্যের মহাকবি জালালুদ্দিন রুমী ও অন্যান্য সূফী কবিদের গজলিয়ৎ-এর অনুসরণে তাঁরা বাংলা ভাষায় পদাবলী নামে পরিচিত মরমী সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। বাংলা ভাষায় মুসলমান কবিদের যে পদাবলী, তা আসলে পারস্য সাহিত্যের মসনবী। সুলতান হোসেন শাহের আমলে নবদ্বীপের কাজীর নাম ছিল চাঁদকাজী। তিনি বাংলা সাহিত্যের ভাবমূলক গীতিকবিতা রচনার প্রথম খ্যাতনামা কবি। তাঁরই হাতে বাংলা ভাষায় মরমী সাহিত্যের হাতেখড়ি। পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান রচিত মরমী বা পদাবলী সাহিত্য বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে।

বাংলা ভাষায় সত্যপীর :

মুসলমান সূফী-দরবেশগণের অসাধারণ অধ্যাত্মবাদ ও মানবতাবাদ এবং সাম্যবাদ প্রভৃতি মহান গুণরাশিতে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য হিন্দু নরনারী তাঁদের অতি মানব, মহামানব বলে ভক্তি করত, এবং সংসার জীবনের নানা সুখে-দুঃখে তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করে প্রার্থনা জানাত। মুসলমান পীর দরবেশদের প্রতি হিন্দুদের এই অকৃত্রিম অনুরাগ ও ভালবাসার ফলেই ধীরে ধীরে জন্ম নিল 'সত্যপীর' পূজা। তখন মুসলমান কবিগণ লিখিতভাবে বাংলা ভাষায় এই ঐশ্বর্যশালী বিষয়টির প্রবর্তন করেন। শেখ ফয়জুল্লাহ ছিলেন সত্যপীর বিষয়ক কাব্য রচনার ক্ষেত্রে প্রথম বাঙ্গালী কবি। এই জাতীয় কবিতাগুলোর অধিকাংশই ১৫৪৫-১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লিখিত হয়েছিল। সুতরাং সত্যপীর কাহিনী হিন্দুসমাজের উপর মুসলমান পীর দরবেশদের প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল।

পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান উভয় কবিগণ দ্বারা বাংলা ভাষায় সত্যপীর অধ্যায়টি পরিপুষ্টতা লাভ করে বাংলা সাহিত্যকে বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধি দান করে। ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই জাতীয় কবিতাগুলো বাংলার সমাজজীবনে খুবই জনপ্রিয় ছিল। সত্যপীরের আরও একটি মহৎ দিক, এটি বাংলার বাউল সাহিত্যের মতো হিন্দু-মুসলমানকে করেছিল নিকট হতে নিকটতর। ধর্ম এখানে উভয় সমাজের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি না করে সৃষ্টি করেছিল মিলনের যোগসূত্র। বাংলার সমাজ জীবনে ও সাহিত্যে সত্যপীরের বড় সার্থকতা এখানেই।

বাংলা ভাষায় সঙ্গীত সাহিত্য :

বাংলা ভাষায় প্রথম সঙ্গীত সাহিত্যেরও প্রচলন করেন মুসলমান কবিগণ। কবি শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত 'রাখমালা' বাংলা ভাষায় প্রথম সঙ্গীত বিষয়ক সাহিত্য। এই মুসলমান কবি বাংলা ভাষায় এই

নতুন দিকটি প্রবর্তন করে বাঙ্গালী কবিদের কাছে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দেন। বাংলা সাহিত্যও সমৃদ্ধি লাভ করে। এদেশের মাটিতে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র নতুন কিছু না হলেও বাংলা সাহিত্যে এর প্রথম আমদানি করেন মুসলমান কবিগণ। কবি মোহঃ মুজাম্মিলের সায়াৎনামা ও নীতিশাস্ত্র গ্রন্থদ্বয় রচিত হওয়ার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় কোন কাব্যগ্রন্থ লক্ষ্য করা যায় না।

বাংলা ভাষায় ভাষাভিত্তিক ঐতিহ্য :

এতক্ষণ আমরা বাংলা ভাষায় মুসলমান কবি ও লেখকদের বস্তু বিষয়ক ঐতিহ্যের দিকগুলো লক্ষ্য করলাম। বাংলা ভাষায় তাঁদের প্রবর্তিত ভাষাভিত্তিক ঐতিহ্য কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মুসলমান কবিরা সমৃদ্ধপূর্ণ আরবী ও ফার্সী ভাষা থেকে বহু শব্দ, প্রবাদ, প্রবচন পদ্ধতি প্রভৃতি গ্রহণ করে বাংলা ভাষাকে এক অসাধারণ জীবনীশক্তি দান করেন। মুসলমান কবি ও লেখকগণ এরূপ অজস্র শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান দিয়েছেন। যেগুলো আজ বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী ভাষাগুলোর সমকক্ষতা ও মর্যাদা দান করেছে। বিখ্যাত কবি আলাওলের সময় বাংলা ভাষায় ইসলামি শব্দ ও ঐতিহ্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। মুসলমানদের ভাষাভিত্তিক ঐতিহ্যের উপাদান এবং এর শক্তিশালী প্রাণচাঞ্চল্য উদ্দীপনা হিন্দু লেখকদের সাহিত্য রচনায় ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। কালক্রমে আরবী ফার্সী শব্দ এবং বাচ্যরীতি বাংলা সাহিত্যের এমন একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হয়ে দাঁড়ায় যে, গোঁড়া হিন্দু কবিরাও এর ব্যবহার থেকে মুক্তি পাননি। সুতরাং মুসলমান কবি ও লেখকগণ কর্তৃক বাংলা ভাষায় ভাষাভিত্তিক ঐতিহ্যের প্রচলন বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কম অবদান জোগায়নি।

বাংলা ভাষায় অঙ্গিক ঐতিহ্য :

ভাষা ও বিষয়বস্তুর নতুন ঐতিহ্য বাংলা ভাষায় প্রবর্তন করা ছাড়াও মুসলমান কবি ও লেখকগণ বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিকেও ঐতিহ্যেরও প্রবর্তন করেন। যখন হিন্দু কবি ও লেখকগণ তাঁদের সাধনা ক্ষেত্রে তাঁদের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী সরস্বতী ও অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনাগান দিয়ে তাঁদের রচনা শুরু করতেন, তখন মুসলমান কবি ও লেখকগণ কেবলমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রশংসামূলক 'হামদ ও নাথ' দিয়ে তাঁদের রচনা আরম্ভ করতেন। এমনকি তাঁরা যখন কোন হিন্দু বিষয়বস্তুর ওপরও লিখতেন, তখনও ওই একই প্রথা অবলম্বন করতেন।

উপসংহার :

এইভাবে মুসলমান কবি ও লেখকগণ বাংলা ভাষাকে নানাবিধ নতুন ঐতিহ্যের দ্বারা সর্বপ্রকারেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলনমানি কবি ও লেখকদের প্রবর্তিত— ইসলামি ঐতিহ্য, সাহিত্যে নৈতিকতাবোধ, ঐতিহাসিক সাহিত্য সৃষ্টি, মরমী ও সূফী সাহিত্যের অবদান, সত্যপীর ও বাউল সাহিত্যের প্রবর্তন, সঙ্গীত সাহিত্য ও ভাষাভিত্তিক ঐতিহ্যগুলো এক কথায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে করেছে কোথাও গতিময়, কোথাও প্রাণময়। তাঁদের সর্বাপেক্ষা বড় দান— তাঁরা বাংলা সাহিত্যকে স্বর্গের দেবসাহিত্য থেকে মর্ত্যের মানুষের সাহিত্যে রূপ দিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিক যুগে ইসলামি সাহিত্য

ইসলামি চিন্তাধারায় কবি নজরুল ও নজরুল কাব্য

ইসলাম জগতের মহান কাণ্ডারী মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) ছিলেন অখণ্ড মানব সমাজের দরিদ্র মানুষ ও অভাগা রমণীকুলের ত্রাণকারী ও দরদী বন্ধু এবং দুর্গত মানবতার উদ্ধারকারী মহান দূত। মরুর কল্যাণে মরু-দুলাল, দুর্লভ মানব জন্মে জগৎ-মুক্তি, মানুষের চিন্তায় মহামানব, শান্তিও সাম্যে মহাসেনা, সমাজ সংস্কারের দুর্জয় সাধনায় সিদ্ধ সাধক, ক্ষমার দরবারে দয়ার সাগর, অত্যাচারের অকথ্য পটে চির সহনশীল, ধৈর্যশীল, আবার প্রেম ও ভালবাসায় পরম পুরুষ।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক বা প্রচারক মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর চিন্তা জগৎকে তদানীন্তন বিশ্বসমাজের যে দুটো জিনিস সর্বাপেক্ষা বেশি আলোড়িত করেছিল, ওই দুটো জিনিস সমাজের দরিদ্র মানুষ ও অবহেলিত নারী সমাজ। কবি নজরুল ইসলামকেও আমরা ওই ইসলামি চিন্তাধারায় সমাজের ওই দুটো অধ্যায়ে সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই। তিনি বলেন :

"হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছে মহান।"

"কোনকালে একা করেনিকো জয় পুরুষের অবাধ
শক্তি দিয়েছে সাহস দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।"

ইসলামি চিন্তায় নারীর স্থান—

এক যদি হয়, গরীয়ান তবে
অন্য সে গরীয়সী
এক যদি হয় মহীয়ান তবে
অন্য সে মহীয়সী। —লেখক

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ যে মানুষের হাতে নিপীড়ন লাঞ্ছনা সহ্য করে আসছিল, নজরুল কাব্যের ছত্রে ছত্রে তা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর রক্তক্ষয়ী লেলিহান ক্ষুধার বিরুদ্ধে তাঁর যে ভয়াল মূর্তি, সেখানেই ধরা দিয়েছে তাঁর জীবনের বাস্তব রূপ। তাঁর প্রাণের একান্ত পিপাসা, জাগ্রত জীবনের চরম চাহিদা ও দেশজননীর ক্রোড়ে কবির জীবনক্ষুধা।

তাই আমরা তাঁকে স্বপ্ন কামনা কুহেলি ঘেরা লগ্নে জীবনের পথে দেখতে পাই না, বন-যুথিকার সুরভিময় বীথি-পথে গুল্ম-লতায় জড়িয়ে পড়তে দেখি না। খরদীপ্ত দাহের তীব্র রশ্মি মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড মাথায় নিয়ে বাস্তব জীবনের পটভূমিকায় কবি ছুটে চলেছেন দুর্বার বেগে। যুগান্তর কবি নজরুল বাংলা সাহিত্যের এ অধ্যায়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কোথাও নিদাঘের বর্ষার খরস্রোতা নদীর মতো গৈরিক স্রোতে বয়েছেন, কোথাও বা কালবৈশাখীর প্রবল বার্তায় ধরণী করেছেন ধূলিময়, কোথাও বা ইসলামি গজল গানের অমিত ঝঙ্কারে শরতের শ্যামল শোভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন।

সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী জলধারার মতো কবির যে জীবনপ্রবাহ বয়ে চলেছে, তা নির্মূল করতে চেয়েছে তার দুই পার্শ্বস্থসমূহ ময়লা মাটি। মানুষ রচিত মানুষের প্রতি যে মনগড়া সামাজিক বিধিবিধান, যে আত্মঘাতী পরিবেশ, তার প্রতি কবির ঘৃণার কোন অবধি ছিল না, গতানুগতিক শাস্ত্রীয় বিধিবিধান তাঁকে কোনদিনই আকৃষ্ট করতে পারেনি। গোঁড়ামি ও ভণ্ডামিকে তিনি শুধু ঘৃণাই করতেন না। বরং মানব জীবনের সুন্দরের পথে কণ্টক মনে করতেন।

অতীতের কলুষ-কালিমা, মনুষ্যজীবনের গ্লানিময় কাহিনী কবিপ্রাণকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। অতীতের বদ্ধ সংস্কার ও মানব সংস্কৃতির নির্জীব ধারাবাহিকতা, প্রাণহীন হৃদয়ের ফল্গুধারায় জীবন স্ফূরণক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা, আর লৌকিকতা পরিশোভিত মনুষ্যত্বহীনতা তাঁর অন্তর আত্মাকে চরমভাবেই ব্যথিত, মর্মাহত ও বিচলিত করে তুলেছে।

কিন্তু কবির দৃষ্টিতে জীবনের যে রূপ দেখা দিয়েছে, তা নতুন চেতনার আলোকসজ্জা নিয়ে, তাঁর কবিদৃষ্টির সঙ্গে যে জীবনদৃষ্টি এসে মিশেছে, তাতে যেমন আছে বদ্ধ অতীতের প্রতি ঘৃণাক্ত মনোভাব, ঠিক তেমনি আছে ভাবাসক্ত সম্মান প্রদর্শন। অতীতের মনুষ্যত্ব বোধ হতেই কবি বর্তমানের হীন-লাঞ্ছিত মানবাত্মার আত্মমর্যাদার প্রতিশোধক তৈরি করে ভবিষ্যতের পথে দিয়েছেন কণ্ঠভরা উদাত্তবাণী।

যুগ যুগ ধরে স্বদেশ ও সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে গ্লানি পুঞ্জিভূত হয়ে স্তূপাকার হয়েছিল, কবি যেন তাকে নির্মম হস্তে ধ্বংস করে, ওই ধ্বংসস্তুপের উপর এক নব সৃষ্টি রচনা করতে চান যে সৃষ্টিতে থাকবে না কোন সৃষ্টিতে সৃষ্টিতে পার্থক্য ; যা মানুষকে এনে দেবে তার শাশ্বত ব্যক্তি অধিকার।

যৌবনের কবি নজরুল, তারুণ্যের কবি নজরুল, যুগস্রষ্টা নজরুল অগণিত জীবন ও যৌবনের কণায় কণায় যে উন্মাদনা, যে উদ্দামতা, যে কর্মস্পৃহা, যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন, তা শুধু কোন বিশেষ সময়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস নয়। ব্যক্তিমানুষের জীবন ও যৌবনদীপ একদিন না একদিন নির্বাণলাভ করেই। কিন্তু অখণ্ড মানবজীবনে তা চির অনির্বাণ। সে যে অনন্ত মানব-স্রোতে ঢেউয়ের খেলা। এক যায়, এক আসে। এই অনন্ত স্রোতের কবি নজরুল ডাক দিয়েছেন জীবনের কর্মক্ষেত্রে, যৌবনের ধর্মপালনে, দেশের স্বার্থে, জাতির কল্যাণ কামনায় অরুণ ও তরুণ দলে :

"জাগোরে অরুণ, জাগোরে ছাত্রদল
স্বতঃ উৎসারিত ঝর্ণাধারার প্রায়
জাগো প্রাণচঞ্চল।"

তরুণের কবি নজরুল মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় তরুণ দলকে নাচিয়ে তুললেন :

" চল্ চল্ চল্
উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল।
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল
চল্ চল্ চল্।
"উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যা চল"।

যৌবনের কবি নজরুলের কণ্ঠ যেমন দৃপ্ত, পদক্ষেপ তেমনি বলিষ্ঠ, আবেদন যেমন অনুভূতিময়, অবদান তেমনি উজ্জ্বল :

"কোথায় মানিক ভাইরা আমার, সাজরে সাজ্
আর বিলম্ব সাজে না, চালাও কুচ-কাওয়াজ
আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ
বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন।

আমরা ফলাব ফুল-ফসল
অগ্র পথিক রে যুবা দল
জোর কদম চলরে চল্।।”

যুগস্রষ্টা নজরুল, নতুন যুগের স্বাপ্নিক কবি নজরুল স্বপ্ন যাঁর সার্থক হয়েছে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে, নতুন যুগের শুভ সূচনায় :

“আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত
গিরি গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যমান
তাজা-জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম মহান
চলমান বেগে প্রাণ উছল
রে নব যুগের স্রষ্টা দল।
জোর কদম চলরে চল।।

সমাজজীবনের সঞ্জীবনী সুধা যৌবনকে স্বাগত জানিয়ে কবি গেয়ে উঠলেন যৌবনের গান :

“আমি গাই তারি গান—
দৃপ্তদম্ভে যে যৌবন আজি ধরি আসি খরসান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে
লক্ষ যুগের প্রাচীন মমির পিরামিডে গেল লিখে।”
যারা ভেস্তে চলে অপদেবতার মন্দির আস্তানা
বক ধার্মিক নীতি-বৃদ্ধের সনাতন তাড়িখানা।
যাদের প্রাণস্রোতে ভেসে গেল পুরাতন জঞ্জাল
সংস্কারের জগদ্দল-শিলা, শাস্ত্রের কঙ্কাল।”

কবির এই নীতিতে যারা বিশ্বাসী, যারা এই পথের পথিক, জগতের বিবর্তন ধারার নিত্যনতুন পদক্ষেপের সঙ্গে যারা প্রাতঃস্মরণীয়, বরণীয়, কবি তাঁদের একান্ত গুণমুগ্ধ :

“গাহি তাহাদেরি গান—
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে
যারা আজি আগুয়ান।”

কবির দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, এই যৌবন তরঙ্গকে রোধ করার মতো কিছু নেই। জগতের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মঙ্গল, যা কিছু নিত্য ও নবীন, সব কিছুই যৌবনের স্পর্শে ধন্য :

“এই যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কি দিয়া বালির বাঁধ
কে রোধিবে এই জোয়ারের টান গগনে যখন উঠেছে চাঁদ

“যুগে যুগে ধরা করেছে শাসন গর্বোদ্ধত যে যৌবন
মানেনি কখনো, আজো মানিবে না বৃদ্ধত্বের এই শাসন।
আমরা সৃজিব নূতন জগৎ, আমরা গাহিব নূতন গান,
সম্ভ্রমে নত এই ধরা চলবে অঞ্জলি পাতি মোদের দান।
যুগে যুগে জরা বৃদ্ধত্বের দিয়াছি করে মোরা তরুণ
ওরা দিক গালি, মোরা হাসি, খালি বলিব ইন্না ... রাজেউন।

নজরুল জীবনের সবচেয়ে যেটি বড় কথা, নজরুল মানুষের কবি। কোন্ মানুষের কবি। নজরুলের আপনজীবন দুঃখ-কষ্টে ভরা। তাই দুঃখ-কষ্টে ভরা জীবন, নানা দুর্বিপাকে ঘেরা জীবন

তাঁকে মহান করেছি। এই ধ্যান-ধারণাটিও তিনি ইসলাম জগৎ হতেই পেলেন। ইসলাম জগতের মহান কাণ্ডারী মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) বলেন—"আল্ ফাকরো ফাখরী"—গরীবীই আমার গর্ব। কবি নজরুল বলেন—"হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান।" এই দুঃখ-কষ্টময় সংসারের সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর সংযোগ। এই সংযোগ থেকেই তাঁর সাহিত্যজগৎ সৃজনীশক্তি সংগ্রহ করেছে, পেয়েছে কবিতার খোরাক। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্তরে সেগুলো প্রকাশ পেয়েছে কাব্যাকারে। অবহেলিত মানবসমাজকে, দুর্গত মানুষকে দেখেছেন অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে, আর তাকে অনুভব করেছেন হৃদয় দিয়ে। তবে অনুভূতি আর উপদেশেই তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি শুধু নাকিসুরে উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তাঁর উপদেশ যেমন ছিল কর্মচঞ্চল, তাঁর উদাহরণ তেমনি ছিল জাগ্রত জীবন্ত। তিনি মানুষকে তার ভয়াবহ যাত্রার জন্য বারবার হুঁশিয়ার করেছেন :

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।"

তিনি কেবল এই সতর্কবাণী দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি বাস্তবজীবনে কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন :

"বল বীর চির উন্নত মম শির।........
দাঁড়িয়ে দূরে ডাকছে মাটি দুলিয়ে তরুতল
শক্ত মাটির ঘায়ে হউক রক্ত পদতল।"

সেই বীরদের স্মরণ করেই তিনি গেয়েছেন—

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা
জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছে তারা, বলি—
দিবে কোন প্রতিদান।"

বাংলা সাহিত্যের এ অধ্যায়ে কেন নজরুল যুগস্রষ্টা, কেন নজরুল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নজরুল কোনদিনই স্বপ্নবিলাসী কবি ছিলেন না। তিনি ছিলেন সর্বহারাদের কবি, অবহেলিত জনের কবি। এক কথায় তাঁর কাব্য ছিল গরিবের প্রাণের ছবি। যখন বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁর আবির্ভাব, তখন সাহিত্য ছিল মধ্যবিত্ত ও উচ্চস্তরের মানুষের আভিজাত্যের আখড়া। যে আসরে অগণিত খেটে-খাওয়া গরিবের স্থান ছিল—নমঃ নমঃ। কবি নজরুলের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ল এই গভীর সত্য, নিবিড় রহস্য। সাহিত্যের মূলবস্তুটি যেখানে লুকিয়েছিল, সেই অবহেলিত অসংখ্য মানুষের মর্মজগতে প্রবেশ করলেন। বন্দী হলেন তাদের হৃদয় দুর্গে। আকুল অন্তরে গেয়ে উঠলেন :

"আমি সেই দিন হবো শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না।

কবি যেন তাঁর দিব্যচোখে দেখতে পেলেন, কেউ কাউকে কারও অধিকার তার হাতে তুলে দেবে না। আপনার অধিকার আপনাকেই অর্জন করতে হবে। যার জন্য চাই শক্তি, সাহস ও উন্নত শির। তাই বিদ্রোহী কবি সংগ্রামী কবি আকাশের চাঁদ, পূর্ণিমা রাতের রমণীয় মহিমা, নদীর তীর, বনের শ্যামল শোভা, রমণী দেহের অপরূপ সৌন্দর্য, এলোকেশীর নগ্ন রূপ, ষোড়শী যুবতীর পীনোন্নত পয়োধর কদলীসম নিতম্বর ও পটলচেরা স্নিগ্ধ চোখে ডুবে ছিলেন না। তিনি যেন সর্বহারাদের জন্য সর্বশক্তি অন্তরযোগে উজাড় করলেন। নিরলসভাবে আপনাকে নিয়োগ করলেন সর্বহারাদের সেবায়।

যে সেবার বিকাশ ও বিদ্যুৎচ্ছটা নিরন্তর ছড়িয়ে পড়ল সমাজজীবনে। যা আজও তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জগতে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে উল্কার মতো দীপ্তময়।

স্বদেশী আন্দোলনে কবি হিসেবে তাঁর দান শুধু অফুরন্ত ও অতুলনীয় নয়, তাঁর অনুপ্রেরণাও অভাবনীয় ও আকাশস্পর্শী। তাঁর নিত্যনতুন ছন্দরাগে যে-কোন ঠাণ্ডা রক্তও গরম না হয়ে পারে না। দু'শো বছরের গোলামির জিনজির তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাধনা সফল হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে শত্রুর চিরসাধ। এই স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনি যেন বিধ্বংসী রূপ ধারণ করেছিলেন। তিনি যেন মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন ধ্বংস ব্যতীত নব সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। সুষ্ঠু সুদূরপ্রসারী সমাধানের মূলে থাকবে সুকঠিন সমস্যা। মহাপূরণের পূর্বে থাকবে মহাশূন্য। তাই কবি নবসৃষ্টির তাগিদে বিধ্বংসের রূপ নিলেন :

আমি এলোকেশী ঝড় অকাল বৈশাখীর
আমি ঝঞ্ঝা আমি ঘূর্ণি
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই তাহা চূর্ণি।

আমি শ্রাবণ প্লাবন বন্যা
কভু ধরণীরে করি বরণীয়
কভু বিপুল ধ্বংস বন্যা।"

নজরুল ছিলেন মূলত মানবতার কবি। মানুষের জন্য তিনি তাঁর প্রাণকে করেছেন উজাড়। সুষ্ঠু সমাজ গঠনের তীব্র পিপাসায় আপন মূর্তিতে পেয়েছেন প্রকৃতির মহামূর্তি মহারূপ, কখনো বা অকাল বৈশাখীর এলোকেশী ঝড়, কখনো শ্রাবণের প্রবল বন্যা কবির এই সমস্ত অপ্রতিহত শক্তিকে বিশাল ব্রিটিশ বাহিনীও রুখে দিতে পারেনি। যখনই আঘাত হেনেছে, প্রতিঘাত পেয়েছে প্রচণ্ড :

"এই শিকল পরা ছল মোদের
এ শিকল পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের
করবরে বিকল।

লাথি মার ভাঙ্‌রে তালা
যত সব বন্দীশালায়
আগুন জ্বালা
আগুন জ্বালা
ফেল উপাড়ি।

মানুষের প্রতি অবিচার, মানুষের প্রতি অত্যাচার নজরুল কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারেননি। সে যত বড়ই শক্তি হোক, তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে তাঁর বজ্রকণ্ঠ। তাই কবি নজরুল প্রেমিক নজরুল লেখক নজরুল সৈনিক নজরুল গায়ক নজরুল সবার উর্ধ্বে মানবদরদী নজরুল আজো বেঁচে আছেন আপন মহিমায় এবং চিরদিন বেঁচে থাকবেন মজুর মেথর কৃষক কুলী নিষ্পীড়িত নিপীড়িত, অবহেলিত ও অবাঞ্ছিতদের অন্তর আত্মায়।

১৩০৬ সনের ১১ই জৈষ্ঠ মঙ্গলবার বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে খাস মুসলিম পরিবারে কাজী গোত্রে বাংলার পরম জনপ্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কাজী ফকির আহম্মদ এবং পিতামহ কাজী আমান-উল্লাহ। মাতা জাহেদা খাতুন, মাতামহ মুন্সী তোফায়েল আলি। খাস মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও কবি কিন্তু গতানুগতিক হারেম শরীফের স্বপ্ন সোহাগে বিভোর

হননি। তাঁর দৃষ্টি ছিল দূর অতীত হতে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে। তিনি নারী জাতিকে শুধু ভোগের বস্তু রূপে না দেখে ত্যাগী পুরুষের ন্যায় বলে উঠেছেন :

"বলে না কোরান বলে না হাদিস
ইসলামের ইতিহাস
নারী নর-দাসী বন্দিনী রবে
হেরেমেতে বারমাস।"

কবি এ শিক্ষাটিও ইসলামের নিকট হতেই পেয়েছিলেন :

পুরুষ রমণী সমাজপাখি ইসলামের হুঁশিয়ার
একটি ডানায় নাহি থাকে বল আকাশেতে উড়িবার।
যুবক-যুবতী ভেদাভেদ নাই উন্নত পরিবার
উভয়ের শ্রম সাধনার দ্বারা গড়িবে এ সাসার।
—লেখক

বরং কবি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন কোন সমাজই একা পুরুষ দ্বারা সুশোভন ও সমৃদ্ধশালী এবং উন্নতগামী হতে পারে না। সমাজ গঠনে সমাজ উন্নয়নে আজকের বালিকা আগামী দিনের মা ও সহায়িকা :

"কোনকালে একা করেনিক জয়
পুরুষের তরবারী
শক্তি দিয়েছে সাহস দিয়েছে
বিজয়লক্ষ্মী নারী।।"

ইসলাম ধর্মের মহান চিন্তাধারা শান্তি ও সাম্যবাদ, প্রেমের আদর্শ চিরদিনই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে ও অনুপ্রাণিত করেছে। পবিত্র ঈদ উৎসবের মহানন্দ, ইসলামের নিষ্কলঙ্ক ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদির প্রতি তাকিয়ে কে যেন তাঁর বিবেকে দংশন দিল, বেজে উঠল কবির অমর বীণা :

"কত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গো
কত বালুচর কত আঁখি ধারা ঝড়ায়ে গো
বরষের শেষে আসিল ঈদ
ভূখারীর দ্বারে সওগত্ বয়ে রিজওয়ানের।

আজি ইসলামের ডঙ্কা বাজে ভরি জাহান
নাই ছোট বড় সকল মানুষ এক সমান,
রাজা-প্রজা নয় কারো কেহ,
কে আমির তুমি বালা খানায়
সকল কালের কলঙ্ক তুমি জাগালে হায়
ইসলামে তুমি সন্দেহ।"

"ইসলাম বলে সকলের তরে মোরা সবাই
সুখ-দুঃখ সমভাগ করে নেব সকলে ভাই
নাই অধিকার সঞ্চয়ের।
কারো আঁখি জ্বলে, কারো ঝাড়ে
কি রে জ্বলিবে দীপ

দু'জনে হবে বুলন্দ নসীব
বাকি লাখে লাখে বদ-নসীব
এ নহে বিধান ইসলামের।"

উপসংহার :

নজরুল ইসলামের পূর্বেও যে বাংলা সাহিত্যে দু'-একজন ভাল মুসলমান কবির আবির্ভাব হয়নি, তা নয়, তবে ইসলামের মূলমন্ত্রকে বাস্তবে রূপ দিতে, তার মহান ঐতিহ্য ও মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর গভীর মর্মবাণীকে উদ্‌ঘাটন করতে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে কলুষ কালিমাহীন ভেদাভেদশূন্য খাঁটি পূত-পবিত্র ইসলামি পরিবেশ সৃষ্টি করতে বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের যে সৃজনীশক্তি, যে অসামান্য অবদান, সুদুর কালের গর্ভেও আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মর্মে মর্মে এক অভিনব বিশ্বদ্রোহী অভিমান জাগিয়ে তুলবে। এই দিক দিয়েই নজরুল বাঙ্গালী মুসলমানদের প্রথম জাতীয় কবি।

নজরুল সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলতে স্বদেশ ও সমাজজীবনের ক্রমবিলীয়মান গতিপথে আল্লার ঐশীজাত প্রেরিত পুরুষের, পথপ্রদর্শকের বা নায়েবে নবী বা নবীর নিখুঁত প্রতিনিধিরূপে তাঁর প্রাণবন্ত বিপরীত বলীয়ান পদক্ষেপ। পরিস্থিতি তীব্র পর্যায়ে পর্যবসিত থাকার নিমিত্তই তিনি ধীর ও স্থিরভাবে কোন বিশেষকে কেন্দ্র করে তাঁর সৃষ্টিরাজ্যকে গড়ে তোলার সুযোগ ও সময় পাননি। তিনি যেন অতর্কিতে অমা-যামিনীর নিঃসীম অন্ধকারের তটদেশে বিদ্যুতের ন্যায় দেখা দিয়ে আচম্বিতে বজ্রের ন্যায় অদৃশ্য হলেন।

যতদিন জগৎ আছে, যতদিন মানুষ আছে, যতদিন নিখিল বিশ্বে রমণীকুল আছে, ততদিন আছে তাদের হাঁসি-কান্নার কলরোল ; থাকবে তাদের সুখ- দুঃখেব আহজারি। যাতনাময় সংসারের ওই সমস্ত অন্তরাত্মাগুলোর নিকট হতে, লাঞ্ছিত জনের জনরব হতে বঞ্চিত প্রাণের ব্যাকুলতা হতে, সর্বহারাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি হতে নজরুল কাব্যের অমরত্ব কেড়ে লয়, মহাকাল আজিও সে শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি।

সুতরাং আমরা প্রাণ খুলে অকৃপণ দৃষ্টিতে, অনিমেষ নযনে ও একাগ্রচিত্তে দেখতে পেলাম— বাংলার অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর পুরুষ, কবি নজরুল ইসলাম ইসলামের মূল ও মৌলিক চিন্তাধারায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মহানবীর একান্ত অনুসারী হয়ে তাঁরই অনুসৃত পথ অনুসরণ করে চিরদিন আর্তনাদ করে গেছেন অভাগা মানুষের জন্য এবং দুর্গত মানবতার জন্য।

মানবতা মনুষ্যত্বের রুখে দিয়ে মৃত্যুবাণ
মরণমুখী মনুষ্যত্বে সঞ্চারিলে বীরের প্রাণ।

মহাকবি ইকবাল ও ইকবাল দর্শন

মানবতার একনিষ্ঠ সেবক : বিশ্ব সাহিত্যের মহীরুহ : একজন মুজাহিদ : একটি মহাজীবন

জীবনপঞ্জী :

১। ক্ষণজন্মা মহাকবি ডঃ আল্লামা ইকবাল ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবের শিয়ালকোট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

২। তদানীন্তন সমাজের তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা উচ্চশিক্ষিত বা ডিগ্রীপ্রাপ্ত মহাকবি।

৩। আধুনিক মুসলিম সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি।

৪। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হতে দর্শনে এম. এ., কেমব্রিজ হতে বি. এ., জার্মান মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় হতে পি-এইচ ডি, বিলেতে অবস্থানকালে ব্যারিস্টারি পাস ইত্যাদি।

৫। দেশে ফিরে লাহোর হাইকোর্টে আইনজীবী ইকবাল।

৬। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানসাগরে সন্তরণকারী ও ইসলামের মহাসমুদ্র মন্থনকারী জ্ঞানতাপস ইকবাল।

৭। আরবী, ফার্সী, উর্দু, ইংরেজি ও আরো কিছু ভাষাতে অবাধ বিচরণকারী মহামানব ইকবাল।

৮। উর্দু সাহিত্যজগতে তাঁর অমর কীর্তি—জরবে কলীম, বাল-এ জিবরীল, বং-এ-দরা, এবং শেকওয়াহ ও জওয়াবে শেকওয়াহ্ প্রভৃতি তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি। অনুরূপভাবে ফার্সী সাহিত্যেও—আস্‌রারে খুদী, রমুজে বেখুদী, পয়াম-এ মশরিক, জব্বুর-এ আজম, জাবীদ নামা প্রভৃতি কালোত্তীর্ণ গ্রন্থ। সমভাবে ইংরেজিতেও বহু মূল্যবান গ্রন্থ আছে।

৯। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথে বৈদান্তিক ঋষিকবিদের প্রভাব লক্ষ্য করি, ইতালির শ্রেষ্ঠ কবি দান্তের উপর ভার্জিলের প্রভাব নজরে পড়ে, অনুরূপভাবে মহাকবি ইকবালের উপর পারস্যের অমর কবি রুমির প্রভাব দৃষ্টি এড়ায় না। এখানে প্রভাব বলতে চিন্তার সাদৃশ্য বা সমতা।

১০। পর্বতসম ব্যক্তিত্বের অধিকারী নির্ভীক কবি ইকবাল যাকে সত্য বলে মনে করেছেন, তাকে সিংহবিক্রমে সম্মুখে তুলে ধরেছেন। এখানেই ক্ষণজন্মা কবি সিংহপুরুষ। চিন্তা ও চেতনায় ছিলেন বীর মুজাহিদ।

১১। আধুনিকতার শত জয়গান গাইলেও অতীত-ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে কোনদিনই ভুল করেননি।

১২। পাশ্চাত্য শিক্ষায় সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেও প্রাচ্য-দর্শন ভুলে যাননি।

১৩। কবির দৃষ্টিতে প্রাণহীন যান্ত্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্বমানবতাকে নিষ্প্রাণ ও নিষ্পেষিত করছে। ফলে নৈতিকতার অবক্ষয় দেখা দিয়েছে।

১৪। তিনি মনে করেন ইউরোপ ধর্মের নামে বিশ্বজুড়ে আপন হীনস্বার্থ চরিতার্থ করছে।

১৫। কবির স্থির ও স্থায়ী বিশ্বাস ছিল—বর্তমান জগতের সমূহ সমস্যাগুলোর পূর্ণ ও স্থায়ী সমাধান একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। একথা জর্জ বানার্ড শও মনে করতেন।

১৬। তুরস্কের অন্ধ-ইউরোপ অনুসরণকে কবি অত্যন্ত ঘৃণার চোখেই দেখতেন।

১৭। কবির দৃষ্টিতে বর্তমান বিশ্বের উগ্র বা অন্ধ জাতীয়তাবাদ সমগ্র মানবসমাজের সর্বনাশার স্থান অধিকার করেছে।

১৮। তিনি মনে করেন ইসলামে অন্ধ-জাতীয়তাবাদের কোন স্থানই নেই। যে জাতীয়তাবাদ অন্য জাতিকে গ্রাস করে, তা তো পশুবাদ।

১৯। কবির দৃষ্টিতে এক ও অখণ্ড মানবসমাজকে কতকগুলো জাতিতে পরিণত করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মহড়া চলছে। কবিদৃষ্টিতে জাতি মাত্র একটি, মানবজাতি। কোরআনও তাই বলে। কোরআন ২ : ২১৩, ৮ : ৩৭, ১০ : ১৯, ১১ : ১১৮, ১৬ : ৯৩, ২১ : ৯২, ২৩ : ৫২, ৫৩, ৩০ : ৩২, ৪৯ : ১১, ৬৪ : ২।

২০। কবির দৃষ্টিতে সকলেই মানুষ, এইটাই হোক বিশ্বমানবের প্রথম পরিচয় ও পরিশুদ্ধ কাজ।

২১। স্বদেশ সম্পর্কে কবির অভিমত— সারা জগৎ অপেক্ষা ভারত শ্রেষ্ঠ। ভারত আমাদের বাগান, আমরা তার বুলবুল পাখি।

২২। বিদেশ সম্পর্কেও কবির ধ্যান-ধারণা খুবই স্বচ্ছ। মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর চোখে সারা বিশ্ব আল্লার পরিবার। সুতরাং আমরা সকলেই আল্লাহ্ পরিবারের বা একই পরিবারের সদস্য।

২৩। কবি মনে করেন ধর্ম যেন মানুষের মনে ও মাঝে বিভেদ ও বৈরী ভাব না আনে। এটি জাতি ও দেশকে ধ্বংস করে। শান্তির স্বার্থে ধর্মে ধর্মে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য মানতেই হবে।

২৪। কবির চোখে চীন ও আরব আমাদের, ভারত আমাদের, আমরা মুসলিম। সারা জগৎ আমাদের। আমরা আল্লার একত্বের পতাকাবাহী। আমাদের নিশ্চিহ্ন করা কোন জাতির পক্ষেই সম্ভব নয়। হযরত মহম্মদ (সাঃ) আমাদের নেতা। এখানেই শান্তি।

২৫। কবি মুসলিম জাতির পতনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করেছেন।

২৬। মুসলমানদের ঈমান আজ জ্বলন্ত নয়, আমল জীবন্ত নয়, সবই যেন কৃত্রিম প্রাণহীন, মরা।

২৭। জাতি হারিয়েছে তার নৈতিকতা, সাহস, সততা, একতা, কর্মস্পৃহা ও প্রেরণা।

২৮। জাতি আজ অনৈস্লামী ভারে ভারাক্রান্ত।

২৯। তার ভেদাভেদ নীতি তাকে দুর্বল করেছে। জন্মগত, বংশগত, দেশ ও সমাজগত পার্থক্য তাকে শেষ করেছে। ইসলাম আল্লাহকে যেমন এক হাতে আপসহীন চিত্তে এক ও অখণ্ড দেখেছে, অনুরূপভাবে অন্য হাতে সমগ্র মানবসমাজকেও এক ও অখণ্ড দেখেছে। এই দুই ক্ষেত্রে সে আপস করেনি। এক হাতে রেখেছিল আল্লার ওয়াহেদানীয়াত ও অন্য হাতে ধরেছিল মানুষের জন্য সাম্যবাদ। এই দুই প্রবল নীতিই তাকে জয়ী করল।

মানুষেরে এক ভেবে উঠেছে ইসলাম
নেমেছে না দিয়ে তার যথাযথ দাম।
ইসলামের জয়যাত্রা বিশাল উত্থান
যে করিল যে আনিল সাম্যের গান।

৩০। কবির দৃষ্টিতে প্রথম যুগের মুসলমানদের শক্তির উৎস ছিল—একতা, সততা ও সাম্য এবং ত্যাগ ও তিতিক্ষা।

৩৪। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহাকবি ইকবালও বৈরাগ্যবাদকে সমর্থন করেননি। তিনি মনে করেন, ওটা একটা পলায়ন প্রবৃত্তি, বীরের ধর্ম নয়।

৩৫। কবি চিরদিন চিন্তার মুক্তির জয়গান করে গেছেন।

৩৬। ধর্মান্ধতাকে তিনি ধর্মের ও মানবজাতির প্রধান শত্রু মনে করতেন। এবং এটা আত্মার মুক্তিতে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা।

৩৭। ধর্মকে তিনি সমৃদ্ধিময় সত্য ও সুন্দরের পথে প্রগতির প্রতীক ও সমুন্নত জীবনব্যবস্থা বলে মনে করেছিলেন। ধর্মে ধর্মে নানা মত, এমনকি আপন ধর্মেও নানা মত থাকবে, এ বিশ্ব বিচিত্রময়, বৈচিত্র্য তার প্রাণ।

৩৮। কবির ধর্ম-চেতনা ছিল বিশ্ব-চেতনা, সৃষ্টি চেতনা এবং সাহিত্য চেতনা ছিল সুন্দরের সাধনা, আত্মার জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন ও উত্তর।

৩৯। তিনি সতর্ক করেছিলেন—পাশ্চাত্যের জড়বাদ প্রাচ্যের আধ্যাত্মবাদকে গ্রাস করতে বসেছে।

৪০। মহাকবি অতীত বা ঐতিহ্যের নামে যে-কোন রকমের অন্ধ অনুকরণ ও অনুবর্তনকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেছেন।

৪১। মনের উদারতা ও চিন্তার স্বাধীনতা তাঁর কবি-জীবনের ভূষণ ছিল। আলেমকুলের কিছু ভণ্ড নেতা এই মহান কবিকে এগারো বার কাফের ফতোয়া দিয়েছিলেন। যিনি আজ অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে কোটি কোটি হৃদয় দুর্গে বন্দী। এবং যাঁরা ফতোয়া দিয়েছিলেন, তাঁদের স্মৃতি আজ রুই-পেঁপড়ে ও পোঁকা-মাকড়ের উদরে চির বিলীন।

৪২। তিনি মনে করতেন যে জাতি চিন্তাতে স্বাধীন নয়, সেই প্রকৃত গোলাম। তার অপেক্ষা পরাধীন আর কে? তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, মৃত।

৪৩। কবি চণ্ডীদাসের মতো তিনিও মানুষকেই সবার উপরে দেখতে পেয়েছিলেন।

মানুষ জানে না তার উচ্চতা কত
আল্লার আরশ্ ভূমি মানুষ যত।
বাড়ে যদি শক্তি তব বিশুদ্ধ আত্মার
জিজ্ঞাসা করিবে আল্লাহ কি চায় তোমার।

৪৪। শ্রমিক, সর্বহারা ও দুর্বল শ্রেণীর প্রতি কবিমনের সমবেদনার কোন শেষ ছিল না। এটা ইসলামেরও চরম শিক্ষা।

৪৫। জন্মভূমি ভারতের দুরবস্থা দেখে কবি আল্লার নিকট নীরবে ক্রন্দন করেছিলেন। হে আল্লাহ, কবে ভারতের দুঃখের রজনী ভোর হবে।

৪৬। সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে কবিচিত্তে দুটো রূপই ফুটে উঠেছে—কোমল ও কঠোর।

মোর দেহ-প্রাণ আল্লার প্রেম
তৌহিদে তৈরি
মম আসনের নীচাসনে থাক্
শেখর হিমাদ্রী।

৪৭। নারী জাতির উত্থান ব্যতীত কোন জাতিই যে উঠতে পারে না—একথা কবি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন।

৪৮। কবির দৃষ্টিতে মানুষ ও পশুর মধ্যে তফাত, পশু চারণভূমিতে বিচরণ করে এবং মানুষ জ্ঞানজগতে।

৪৯। কবির চোখে যে মানুষ জ্ঞানহারা, তার অপেক্ষা সর্বহারা আর কে আছে!

৫০। কবি ছিলেন মানবজাতি ও মানবতার আপসহীন সৈনিক। তাঁর অমর গ্রন্থ 'আস্‌রারে খুদী'—আত্মার রহস্য, মানবাত্মার একটি তুলনাহীন কালজয়ী দলিল।

প্রবাহিত আত্মতীরে যে-জীবন নদী
সেই-নদীর নাব্য রূপ আস্‌রারে খুদী।

৫১। কবি ছিলেন অখণ্ড মানবজাতির জ্ঞান-বাগিচার একটি ফুটন্ত গোলাপ। যার সুবাস ও সুঘ্রাণ সকলেরই প্রাপ্য। যেখানে আছে সকলের সম অধিকার। কবি ছিলেন মহান ও মহাকবি, বিশ্বজগতের সৌরভ ও মানবজাতির গৌরব। তাঁদের মতো মানুষের জন্যই মনুষ্যকুল সৃষ্টির সেরা ধন।

১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ, ২১ এপ্রিল, বিশ্বজোড়া জ্ঞান-গরিমার গগন হতে অকস্মাৎ একটি চির দীপ্তমান উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়ল। মহামানব মহাকবি জ্ঞানজগতের মহান স্থপতি অগণিত মানুষের প্রিয় কবি ইকবাল চিরদিনের জন্য চিরনিদ্রায় চিরবিশ্রামের জন্য ঘুমিয়ে পড়লেন। (ইন্না ..... রাজেউন)।

বিশ্ববরেণ্য প্রতিভা ও বিরল ব্যক্তিত্ব, ক্ষণজন্মা মানুষ, যাঁরা সমগ্র মনুষ্য সমাজের মাথার মুকুট স্বরূপ, যাঁরা চির গরীয়ান, চির মহীয়ান, তাঁরা কখনো কোন দেশ-কাল-পাত্রের সংকীর্ণ সীমারেখায় আবদ্ধ থাকতে পারেন না। তাঁদের আবেদন সব মানবের জন্য, তাঁদের অবদান সৃষ্টিজগতের কল্যাণে চিরমুক্ত। এখানেই তো মনুষ্যকুলের মহিমা ও তাঁদের মাহাত্ম্য। মহাকবি ইকবাল মনুষ্য সমাজের অসংখ্য আত্মার চিরআত্মীয়। তাঁর প্রকৃত স্মরণ হবে মানব-জাতির সমুন্নতির পথে একটি শুভলক্ষণ ও দৃঢ়পদক্ষেপ।

মহাকবি ইকবাল স্মরণে ঃ
অন্যায় অবিচার করিয়া খণ্ডন
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ছিল তোমার দর্শন।
বলেছিলেন জীবমাত্রেই আছে দেহ প্রাণ
দায় ও দায়িত্ব সহ মানুষ মহান।
দেখেছিলে ঘৃণাভরে রাজ্য ভাঙা-গড়া
দেখোনি মানুষ তার মনুষ্যত্ব ছাড়া।
লিখেছিলে বারবার বড় পরিতাপ
বংশকুলের দাবি জাতের প্রলাপ।
বলেছিলে বিশ্ব-বাগে ফুল যদি হও
ছড়াবে সুবাস তব যে দেশেই রও।
শিখাইলে গরু ছাগল অমানুষ হলে
শ্রেষ্ঠ তোমার জাতি কি ফল বলে।
মানব-গগনাকাশে চন্দ্র যদি হও
ছড়াবে তোমার জ্যোতি যে জাতেই রও।
হৃদয় ভরিয়া ছিল এত অনুরাগ
মানুষেরে কোনদিন করো নাই ভাগ।
আল্লার অখণ্ড রাজ সৃষ্টি রাজ্য স্মরে
দেখনি মানব-জাতি খণ্ড খণ্ড করে।
অন্যায় অবিচার করিতে দমন
শত বাধা বিপদেও করেছ গমন।
ঘুচাইতে সমাজের ঘোর অন্ধকার
দেখেছিলে ঘৃণাভরে পচা সংস্কার।
কালোত্তীর্ণ মহাকালে তব সিংহাসন
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হোক তোমার স্মরণ।

মহাকবি ইক্‌বালের অবদান ও আবেদন

আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল মূলত কবি ও দার্শনিক। আবার সমাজের বিভিন্ন অধ্যায়ে মহান চিন্তানায়ক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। কোথাও মরমীবাদী, কোথাও যুক্তিবাদী। এক কথায় সমাজের বিভিন্ন অধ্যায়ে একজন বিরল চিন্তানায়ক, সম্বন্ধে সমাজের একজন খ্যাতিবান সুসন্তান।

বিশ্ব-চেতনায় চির উদ্বুদ্ধ ইকবালকে আমরা জ্ঞান জগতের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ও ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন প্রাঙ্গণে বর্তমান শতাব্দীর একজন সার্থক প্রজ্ঞাশীল পর্যবেক্ষক রূপে দেখি। জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা হস্তে নিয়ে এ সংসারের কঠিন মাটিতে অতি নির্ভীক চিত্তে সত্য ও সুন্দরের পথে যা সঠিক যা সত্য, তাকে বুকে নিয়ে যে নিরন্তর আমরণ অভিযান শুরু করেছিলেন। তা বিশ্বের জ্ঞান জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে অলংকৃত করেছে একজন জ্ঞানীর আসন। মনুষ্য সমাজের জ্ঞান-গরীমার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে তাঁর অসামান্য অবদান ও নীতিমালা আগামী প্রজন্মের মাঝে নিস্তরঙ্গের বুকে বহুকাল ব্যাপী তরঙ্গাভিঘাত জাগিয়ে তুলবে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলাম ধর্মের যে ব্যাখ্যা চলে আসছিলত তার সঙ্গে কোথাও তিনি একমত, আবার কোথাও তিনি দ্বিমত পোষণ করেছেন। কেবলমাত্র দেশী-বিদেশী বিধর্মী লেখক ও দার্শনিকগণের সমুচিত জবাবেই তাঁর জাগ্রত লেখনী ক্ষান্ত হয়নি। বরং আপন সমাজেরও কিছু মানুষের গতিহীন চিন্তাধারাকে বিবেক-বর্জিত পদ্ধতিকেও যুক্তির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিলেন। এজন্য তাঁকেও কম বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়নি। মহাকবি যেখানেই যেটিকেই সত্য ও বাস্তব বলে মনে করেছিলেন সেখানে আপসহীন চিত্তে আমরণ-সংগ্রামে পাঞ্জা কষতে দ্বিধা বোধ করেননি। এখানে ধরা দিয়েছে মহাকবির জীবনের বাস্তব ছবি।

ভারত উপমহাদেশ ইসলামী চিন্তাধারার সর্বপ্রথম রক্ষক ও প্রবর্তক বলতে যাঁর নাম সবার আগে মনে পড়ে, তিনি মহান চিন্তানায়ক শাইস্ আহমদ্ সেরহিন্দী (রহঃ) এই মহান চিন্তাবিদ সিংহবিক্রমে সম্রাট আকবর প্রবর্তিত বিদয়াতের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন, ভারতের ইসলামের ইতিহাসে তা চির অমরত্ব লাভ করেছে। তিনি সম সংগ্রামে ব্যাপৃত হয়েছিলেন শাইখ মহীউদ্দীন ইবনে আলী আল আরাবীর সাথেও। ইসলামের তৌহিক বা একত্ববাদে। ইসলামের মৌলিক চিন্তাধারার রক্ষণাবেক্ষণে তদানীন্তন 'ভারত-ঈশ্বরের' রক্ত চক্ষুর সম্মুখে মহাজ্ঞানী মহাবীর বিরল মুজাহীদ শাইখ আহমদ সিরহিন্দী (রহঃ) এর প্রয়োজন কত প্রকট কত ভীষণ ছিল, তা সেদিনের যুগ ইতিহাস নিখুঁত ভাবে না পড়লে বোঝা যাবে না। অমর আত্মা আল্লাহর রহমত ও চির শান্তি লাভ করুক। আল্লামা ডঃ ইকবাল ভূয়সী চিত্তে এই মহামানবের প্রশংসা করে গেছেন। ইসলামের শান্তি পতাকাকে সমুজ্জ্বল রাখতে এই অধ্যায়ে আর এক জন বিশ্ব বিখ্যাত মনীষীর সাক্ষাৎ পাই। মহাকবি ইকবাল ছিলেন তাঁরও উত্তরসুরী। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তিম লগ্নে ইসলামের সিংহপুরুষ শাহওলী উল্লাহ (রহঃ) এর আবির্ভাব না ঘটলে এদেশে ইসলামের অবস্থান কত যে শোচনীয় হয়ে উঠতো, সে কথা বলার কোন অবধি রাখে না।

মহাকবি ইকবাল প্রসঙ্গে এখানে আমরা একটি বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করছি, এই সমস্ত ক্ষণজন্মা মনীষীগণ বিশ্বধর্মের বা বিশ্ব-দর্শনের প্রাঙ্গণে বিশ্ব-মনীষীর চিন্তা-জগতের জোয়ার ভাঁটাতে ইসলামকে নিয়ে বিশ্ব আলোচনায় কোন বড় ধরণের আলোড়ন বা আন্দোলন তোলেন নি। তাঁরা আপন ঘর সামলাতেই এত ব্যস্ত ছিলেন যে, বহির-বিশ্বে নজর দেওয়ার মত সুযোগ ও সময় পাননি। বা ঐ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনও বোধ করেননি। এঁরা দুজনেই ভারত উপমহাদেশে নশবর মুসলিমদের জন্য যে অবদান রেখে গেছেন, তা অবিনশ্বর শাশ্বত।

এর পরবর্তী যুগে যে মনীষীকে আমরা ঘরে-বাইরে দেশ হতে বিদেশে, বিশ্ব-প্রাঙ্গণে আমরণ পাঞ্জা কষতে দেখলাম তিনিই ডঃ ইকবাল। তাঁর মশীর যুদ্ধ বহুমুখী ছিল। কখনো স্বদেশ ভূমিতে বেয়াতের বিরুদ্ধে, কখনো মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কখনো ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, সবার উর্ধ্বে চলমান জগতে গতিহীনতার বিরুদ্ধে। যেখানে যুক্তি নাই, তর্ক নাই, জ্ঞান যেখানে স্তব্ধ, বিবকে যেখানে বন্ধ, প্রযুক্তি প্রগতি যেখানে পরাভূত জ্ঞানী ইকবাল সেখানে মহীয়ানের ভূমিকায় চির মুখর। এটা ছিল তাঁর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয়ে পাই, স্বদেশের মধ্যেই যাঁরা ইসলামকে ঠিক মত অনুধাবন না করেই অহেতুক ইসলাম-বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করতেন। মহাকবি তাঁদের বিরুদ্ধেও ছিলেন সোচ্চার। তাঁর যুদ্ধের তৃতীয় অধ্যায় ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বিদেশী অধ্যায়।

মহাকবি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন যে, ইসলামের বিশ্ব-বিজয় মুসলমানদের জন্য অবিমিশ্র মঙ্গল বহন করে আনতে পারেনি। পারস্য বিজয়ের পর ইসলামের মহান দ্বিতীয় খলিফ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) যখন লক্ষ্য করলেন, পারস্য হতে রাশি-রাশি ধনরত্ন হাজার হাজার উটের পিঠে আরব ভূমিতে প্রবেশ করছে। এ যেন ধনরত্নের মহাপ্লাবন প্রবল জোয়ারে দীন-দরিদ্রের দেশ ক্ষুধার্ত আরবে প্রবেশ করছে। সকলেই আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু ধনের এই জোয়ার দেখে খলিফা অঝরে ক্রন্দন করছিলেন। বিপুল জনগণ অবাক বিস্ময়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে খলিফা সবিনয়ে উত্তর দিলেন "এই ধন-রত্নের মধ্যেই আমি আমার জাতির ধ্বংসের বীজ লক্ষ্য করছি। যা ওদের (পারস্যবাসী) ধ্বংস করল।" দার্শনিক ইকবাল দূর অতীতের ঐ ধ্বংস বীজকে জাতীয় জীবনের প্রাঙ্গণে বৃক্ষরূপে দেখলেন। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি গ্রীক সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-সভ্যতা, দর্শন-ধর্ম, আচার-আচরণ-এর যে কালিমাযুক্ত দিক, তা ইসলামকে প্রভাবান্বিত করল। আপামর মুসলিম জনসাধারণের কালো ছায়া হতে নিষ্কৃতি লাভ করল না। যদিও গ্রীক সভ্যতা ও গ্রীক দর্শনের সাথে ভারতীয় সভ্যতা ও দর্শনের অনেকখানি মিল আছে। কিন্তু ইসলামের সাথে কোন আবিশ্যিক যোগাযোগ ধরা পড়ে না। যেটুকু সর্বমানবের যেটুকু শাশ্বত, যেটুকু চিরন্তন ও চিরচলমান। এইটুকু ব্যতীত ইসলামের সাথে তাদের কোন মিল খুঁজে পাওয়া গেল না। মহাকবির সাথে এখানেই বাঁধল চরম সংঘাত।

গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনে জড় পদার্থ চিরন্তনের মর্যাদা লাভ করে, ইসলাম তা বলে না। গ্রীম ধর্মী অ্যারিস্টটল প্লেটো, হেগেল ডারোইন প্রমুখ দার্শনিকগণের ধ্যান ধারণা জড়ো ক্রামোন্নতিকে এ বিশ্বের উৎপত্তি ও উন্নতরূপ। কিন্তু ইসলাম কোন দিনই স্বীকার করে না মানুষের আদি জাতি বানর জাতি। আজ প্রায় পনেরশো বছর ধরে একটি বানরও মানুষে রূপে পেল না। সুতরাং ইসলামের চোখে মহাকবি ইকবালের দর্শনে ওটা অবান্তর দর্শন ও অলীক মতবাদ। প্রাচীন হিব্রু ধর্মে বা দর্শনে শূন্য হতে সবই সৃষ্টি। ইসলাম তা বলে না। ইসলাম বলে যিনি শূন্যকেও সৃষ্টি করেছেন, তিনিই অন্যান্য সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। ইকবাল দর্শনে তিনিই এক মহান অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ভারতীয় দর্শনে এ বিশ্ব সমন্বয়ের ফল। পুরুষের শুক্র-কীট ও রমণীর ডিম্বানুর সংমিশ্রণ মানব-শিশু। কিন্তু এ সকল কিছুর উৎস মূলে মহান আল্লাহর অচিন্তনীয় হিকমত কার্যকরী আছে। ইকবাল দর্শনে এর ইসলামিক রূপ যথাযথভাবেই পরিস্ফুটিত। ভারতীয় দর্শন মানব-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিলেও, বৈদান্তিক মতে মানব-বুদ্ধি সকল জ্ঞানের উৎস নয় এখানে অতীন্দ্রিয় শক্তির বিকাশকে স্বীকার করা হয়েছে। এই বৈদান্তিক ভাবধারার সাথে ইসলামেরও মিল খুজে পাওয়া যায়। ইসলামি মতে 'জ্ঞান' কোন মানুষেরই জন্মগত বা বাপুত কোন সম্পদ নয়। এটা, আল্লাহ্ যাকে যতটা দেন, সে ততটা পায়। পরিশ্রম করলে কিছুটা উন্নতি হয়, কিন্তু মূলের কোন আমূল পরিবর্তন হয় না। জ্ঞান সম্পর্কে এটাই ইকবাল দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। অতীন্দ্রিয় জাত জ্ঞানকে প্রথম প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা করেন মনীষী প্লাটনাস। পরবর্তী কালে স্পিনোজা, শোনিং প্রমুখ মনীষীগণ এখানে স্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম সোপান।

ইকবাল দর্শনে গতানুগতিক বিদ্যাকে কেন্দ্র করে যাঁরা বুদ্ধি বা জ্ঞান অর্জন করেন, তাঁরা সমাজে বুদ্ধিমান। আর যাঁরা অধীত বিদ্যা অর্জন করে মহাবোধি লাভ করেন, তাঁরা আমাদের সমাজে ধীমান

ব্যক্তি। সচরাচর মানুষের বুদ্ধি জন্ম নেয় তার বিদ্যার খোলামেলা প্রাঙ্গণে এবং মহাবোধি জন্ম নেয় বুদ্ধির সুরক্ষিত বাগিচায়। মানুষের বুদ্ধি ও বিবেকের সঠিক প্রয়োগে ও গভীর পারাবারে শুদ্ধ স্নাত হয়ে গোলাপের পাপড়ী সদৃশ অধীত বিদ্যা পরিচ্ছন্নতা লাভ করলে তথায় মহাবোধির ফুলটি ফুটে ওঠে। সমাজে এই বিকশিত ফুলটির নাম ধীমান মানব, ধীমান পুরুষ। হযরত মহম্মদ (সাঃ) সেই মহাবোধির শ্রেষ্ঠতম ফুল চিরস্থিত বোধোদয়, চিরবোধ্য ও ধীমান পুরুষ।

ইকবাল দর্শনে সাধারণত মানুষ নানা কিছুকে কেন্দ্র করে সত্যের দিকে ধাবমান হয়। যাদের শিখন্ডী হয় কখনো গতানুগতিক ধর্ম কখনো অতীতের দর্শন, কখনো বা অন্যান্য কিছু। নিঃসন্দেহে এ সমস্ত মানুষ বুদ্ধিমান। আর যাঁরা কোন শ্রীখন্ডীবিহীন অবস্থায় শূন্যে ভর করে মহাসত্যের দিকে নিবিষ্ট চিত্তে ধাবমান, নির্দ্ধিধায় নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, তাঁরা জগতের ধীমান পুরুষ। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মহাম্মদ (সঃ) প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে আর্থার শোপেন হাওয়ার সবার মূলে মূলীভূত উপাদান রূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। জার্মান দার্শনিক ফ্রিডরিশ নীট্শে সর্ব জীবেই এই ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা ও প্রাধান্যতাকে লক্ষ্য করেন। এই ইচ্ছার কার্যকারিতা সম্পর্কে আমেরিকান মনীষী উইলিয়ম জেমস তাঁর সকল মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মানুষের ইচ্ছাকে মানব-বুদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। ইকবাল দর্শনে মানব ইচ্ছাকে যথাযথভাবেই সম্মান দেওয়া হয়েছে। তবে তারও একটা সীমারেখা বেঁধে দেওয়া আছে। যেমন মানুষের চেষ্টা ব্যতীত তার জন্য কিছুই নেই। ৫৩ : ৩৯-৪১, ৬৭ : ১-২। জাতীয় জীবনেও চেষ্টা ব্যতীত কিছুই নেই। ১৩ : ১১, ৫৩ : ৩৯, ৮৯ : ৫৩। আবার তোমাদের ইচ্ছার কোন মূল্য নেই, আল্লাহ্ ইচ্ছা ব্যতীত। ৮১ : ২৯।

মহাকবি ইকবালের মতে ইসলামের মূল নীতি ও মৌলিক আদর্শের সাথে কোন কিছুর আপস করা যেমন চলে না, তেমনি ইসলামের ঐ দুটো জিনিসকে কোন একটি কাল বা দেশের সীমারেখায় সীমাবদ্ধ করাও চলে না। যেহেতু কোরআনের ভাব ও আদর্শ চিন্তন ও চির চলমান। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানগণ অন্ধকার ও অজ্ঞতা যুগের উত্তাপ হতে পূর্ণ নিষ্কৃতি না পাওয়ার জন্য ইসলামকেও সম্যকরূপে বোঝাতে পারেন নি। তিনি মনে করেন, জগৎ চিরগতিশীল, চলমান। এই চলমান জগতের বুকেই শাশ্বত ইসলামকে অনুধাবন করতে হবে। নচেৎ বিশ্বের বিবর্তনে ও আবর্তনে যুগের চাহিদার সাথে ইসলামের চিরন্তন চাকা ঘুরবে না। কেননা তাঁর মতে ইসলাম স্থানুও নয়, স্থাবরও নয়। বরং চিরগতিশীল ও গতিময়।

দার্শনিক ইকবাল মানুষের স্বাধীন চিন্তার যেমন ছিলেন একান্ত পৃষ্ঠপোষক। তেমনি ছিলেন সমালোচনা জগতেরও চরম গুণগ্রাহী। তিনি মনে করতেন, জ্ঞান জগতের স্বাধীন চিন্তা ও সমালোচনা সমভাবে সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার নামই প্রগতি। আল্লামা ইকবাল আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত বা একত্ববাদে যেমন ছিলেন আপসহীন, ইসলামের সুদূর যাত্রাপথে তেমনি ছিলেন উদার পথিক। এখানেই তাঁর প্রজ্ঞার ফুল চিরপ্রতিষ্ঠিত। ইকবাল-দর্শনে সার ও শেষ কথা Bake to Quran, back to Muhammad (s)

এই বিশ্বের একজন অভাবনীয় প্রজ্ঞাশীল মানুষ ইকবালের সার ও শ্রেষ্ঠ কথা ঐ দুটো কেন! পবিত্র কোরআন ও হযরত মহাম্মদ (সঃ) বিশ্ববাসীকে কল্যাণ ও মঙ্গল ব্যতীত কিছুই দেয় না। তাদের কল্যাণ ও মঙ্গল ব্যতীত চিন্তাও করে না। তাদের এক হতে একত্রিত করা ব্যতীত কিছুই ভাবে না। অখন্ড বিশ্ব ব্যতীত খন্ড বিশ্ব দেখে না। সমস্ত মানব মণ্ডলীর সহাবস্থান ও মিলন ছাড়া বোঝেনা। ইকবাল-দর্শন ও ঐ সত্য-সুন্দর এবং শাশ্বত দর্শনে চির বিশ্বাসী চির প্রাণবন্ত চির গতিময়। মনীষী ইকবালের আকাশ-পাতাল পরিব্যপ্ত দর্শন জ্ঞান জগতের বিচরণে ও বিশ্লেষণে যে অভূত অবদান ও আন্তরিক আবেদন রেখে গেছে, তা কোথাও খন্ডাকারে ক্ষতবিক্ষত হয়নি। কেননা মহান স্রষ্টা কেবলমাত্র এক ও অদ্বিতীয় নন, অখণ্ডও।

সূফীবাদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস

ভারতীয় দর্শন ও ইসলামের সূফী সাধনার এক অপূর্ব সহজাত মিলন ঘটেছে। ইসলামের সূফীবাদ ও ভারতীয় দর্শন সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী ধারার ন্যায় আপন আপন পৃথক পৃথক ধারাতে ধাবমান হয়েও মিশেছে একই মিলন মোহনায়। এই দুটো সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেন—"একত্র হয়েছে, অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি।" এই একত্রীকরণকে অপরিমিতভাবে সার্থক করেছে, সফল করেছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ লেখনী, যা সাহায্য করেছে মূলত ভারতের জাতীয় ঐক্য ও একাত্মতা বোধকে। কেননা নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের সন্ধানই ভারত-সাধনার মূলমন্ত্র। ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ এই মূলমন্ত্রটির ছিলেন একজন মহাসাধক ও সিদ্ধপুরুষ। তাই তাঁর অফুরন্ত ও অচিন্ত্যনীয় লেখনী দ্বারা নানা প্রসঙ্গে নানা প্রাঙ্গণে গড়ে উঠেছে ভারতের জাতীয় ঐক্য ও একাত্মতা বোধ।

সুতরাং প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে বাংলা সাহিত্যের এক বিরাট অধ্যায় জুড়ে আছে রবীন্দ্রনাথের মরমী কবিতা ও ইসলামের সূফীবাদ। বহু গদ্য লেখক এবং প্রবীণ ও নবীন কবি ছাড়াও বিশেষ করে ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের মরমী কবিতাগুলো বিশ্ব-সূফী সাহিত্যের ভাণ্ডারে কম অবদান জোগায়নি। এই দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্য সূফী সাহিত্য দ্বারা যতখানি সমৃদ্ধশালী হয়েছে, সূফী সাহিত্যও বাংলা সাহিত্য দ্বারা যতখানিই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। একটি যেখানে প্রভাবান্বিত, অন্যটি সেখানে প্রাণবন্ত।

ভোগ বিবর্জিত অতিমানব, ত্যাগী পুরুষ, যাদের জীবন আত্মস্বার্থে নয় আত্ম-ত্যাগে ; আত্মসচেতনায় নয় আত্ম বিসর্জনে ; যাঁদের জীবন-দৃষ্টি আপাত ভোগে নয়, সুদূরপ্রসারী ত্যাগে। যাঁরা ত্যাক্তন ত্যাগের দ্বারাই ভোগকে আপন ভাবের দাস করে গেছেন। যাঁরা এই সংসারকে সংসারের আবিলতার উপর হতেই পূর্ণভাবে অবলোকন করেছেন, যাঁরা সংসার মিছিলকে লক্ষ্য করেছেন ছাদের উপর হতে। মিছিলের একজন হয়ে নয়। সংসার যাঁদেরকে আপন বাঁধনে বাঁধতে পারেনি। বরং তাঁদের হাতেই চিরদিন বন্দী হয়েছে। সমগ্র প্রকৃত জগৎ যাঁদের আজ্ঞাবহ দাসরূপে কাজ করেছে। সেই সাধক ভগবৎপ্রেমিক সূফী সম্পর্কে ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো ধরায় আসো।...
তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে।
তোমার ভালো কিছু নাই,
কে যে তোমার সাথের সাথি ভাবি মনে তাই।"

গীতাঞ্জলি/৫১

ইসলামের সূফী-সাধকগণ জগতের সমস্ত কিছু পেয়েও মনে করেন কিছুই পাওয়া হয়নি। যতক্ষণ না তাঁরা তাঁদের সেই এক প্রেমিককে আপন করে না পান, ততক্ষণ তাঁরা যেন ভাবেন এ জীবনটাই ব্যর্থ। শূন্যতায় ভরা। রবীন্দ্রকাব্যে তারই অনবদ্য রূপ :

কী লয়ে বা গর্ব করি
ব্যর্থ জীবনে।
ভরা গৃহে শূন্য আমি
তোমা বিহনে। গীতাঞ্জলি/৫৩

সূফী-মন যেন একথা কিছুতেই বুঝতে চান না যে, জগতের যত মূল্যবান বস্তু দ্বারাই তাঁর গৃহটিকে সাজিয়ে তোলা হোক, তিনি মনে করেন যদি তাঁর প্রেমিকই তাঁর ঘরে না এলেন তাহলে তাঁর ঘরে যেন কিছুই আনা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের মরমী কাব্যে তার অপূর্ব রূপায়ণ :

"যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু।
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।
এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে
আমার যতই দু'হাত ভরে ওঠে ধনে।
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে। গীতাঞ্জলি/২৪

ইসলামের সূফী-কুল মনে করেন তাঁরাই শুধু একাকী ব্যস্ত নয় তাঁদের প্রেমিকাকে পেতে। প্রেমিকাও সমধিক ব্যস্ত ও ব্যাকুল প্রেমিককেও পাওয়ার জন্য। বরং তিনিই যেন এগিয়ে এসেছেন কখন আড়ালে, কখন বা আবডালে, কখনও ঘরের মধ্যেই। রবীন্দ্রকাব্যে যার চরম প্রকাশ :

হেথায় তিনি কোথায় পেতেছেন
আমাদের এই ঘরে।
আসনটি তাঁর সাজিয়েদে, ভাই
মনের মতো করে।...
জল ছিটিয়ে ফুলগুলি রাখ
সাজিখানি ভরে।
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে, ভাই,
মনের মতো করে।....
একলা তিনি বসে থাকেন
আমাদের এই ঘরে
আমরা যখন অন্য কোথাও
চলি কাজের তরে।...
দিনের শেষে ফিরি যখন
নানা কাজের পরে
দেখি তিনি একলা বসে
আমাদের এই ঘরে।
তিনি জেগে বসে থাকেন
আমাদের এই ঘরে
আমরা যখন অচেতনে
ঘুমাই শয্যা 'পরে। গীতাঞ্জলি/৪৯

একজন জাগতিক প্রেমিক ও প্রেমিকা যেমন জগতের সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দিয়ে তার বিনিময়ে তাদের মনের গহীন কুটিরে একান্তভাবেই পেতে চায় আপন প্রিয়তম ও প্রিয়তমাকে। সূফীরাও তেমনি বা তা অপেক্ষাও তাদের সমস্ত কিছুকে বলিদান দিয়েই পেতে চায় সেই মনের মানুষটিকে, প্রিয়জনকে। ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ সেই মনের সেই আকাঙ্ক্ষার একটি অপূর্ব ছবি তুলে ধরেছেন :

"ধনে জানে আছি জড়ায়ে হায়
তবু জানো মন তোমারে চায়।...
সব সুখে-দুখে ভুলে থাকায়
জানো মম মন তোমারে চায়।...
সব ছেড়ে সব পাব তোমায়
মনে মনে মন তোমারে চায়।

গীতাঞ্জলি/২৯

সূফীরা মনে করেন—এই ধরণীতে নরনারীর যে আগমন ও অন্তর্ধান, তা উভয়ই লীলাময়েরই একমাত্র লীলামাত্র। মানুষ সেখানে নিমিত্ত মাত্র।

"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।...
সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে,
দুঃখ সুখের বিচিত্র জীবনে
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।"

গীতাঞ্জলি/১৩০

মাঝে মাঝে এই সংসারে যে সমস্ত সুখ ও দুঃখ দেখা দেয় সেগুলো যেন তাঁদের নিকট একহাতে যৌবনের উপবন ও অন্য হাতে বার্ধক্যের বারাণসী। তাঁরা কোনদিনই সংসারের কোন সুখে যেমন আত্মহারা হন না, তেমনি কোন দুঃখেই ভেঙে পড়েন না। তাঁরা যেন মনে করেন এ সংসার একটি রঙ্গমঞ্চ, সবই ক্ষণিকের। তাঁদের সুরে সুর মিলিয়ে যেন রবীন্দ্রকণ্ঠ বেজে উঠেছে—

"দুঃস্বপন কোথা হতে এসে
জীবনে বাধায় গণ্ডগোল।
কেঁদে উঠে জেগে দেখি শেষে
কিছু নাই, আছ মার কোল।...
তব হাসি দেখে আজ বুঝি
তুমিই দিয়েছ মোরে দোল।...
এ ঘোর কাটিয়া যাবে চোখে
নিমিষেই প্রভাত-আলোকে,
পরিপূর্ণ তোমার সম্মুখে
থেমে যাবে সকল কল্লোল।"

গীতাঞ্জলি/১৩১

সূফীকুল মনে করেন—এই কোল, এই দোল, এই গণ্ডগোল, এই কল্লোল, এগুলো সবই যেন পুরুষ রমণী নির্বিশেষে সকল মানুষেরই যৌবনের উপবন ও বার্ধক্যের বারাণসী। ইসলামের সূফী সাধকগণ যখনই "ফানাফিল্লাহ" ও "বাকা বিল্লাহতে" অবস্থান করেন, তখন তাঁরা একমাত্র এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্বকেই অনুভব করেন না। যেখানে যে জগতে সুখ-দুঃখ বা

শোক ও আনন্দ বলে পৃথক কিছুই নেই। আবার তাঁকে দূরে সরালে সব কিছুই এসে যায়। যখনই সিদ্ধপুরুষ সূফীসাধক তাঁর অস্তিত্বে আপন অস্তিত্বকে বিলীন করেন, তখন এ জগতের কোন কিছুরই অস্তিত্ব আর তাঁদের মধ্যে জাগরিত থাকে না।

"তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যতদূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু,
কোথাও বিচ্ছেদ নাই।"

কিন্তু তাঁ হতে বিচ্ছেদ হলেই—

"মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ
দুঃখ সে হয় দুঃখীর কূপ,
তোমা হতে যারে স্বতন্ত্র হয়ে
আপনার প্রাণে চাই।"

নৈবেদ্য-১৪

তাই এক শ্রেণীর অনুতপ্ত জগৎ-সূফী যেন জীবনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আক্ষেপে অপেক্ষায় অনাবিল প্রেমের পটভূমিকাতে আপনাকে নিবিড়ভাবে ধরা দেওয়ার জন্য এক অধীর আগ্রহে বসে আছেন। অনেক সময় অনেক বড় সূফীসাধককেও প্রথম জীবনের সাধনায় আন্তরিকতা ও অকৃত্রিমতার অভাবে আঘাত পেতে হয়েছে, তবুও বিফল মনোরথ না হয়ে ধৈর্যসহকারে সফলতা অর্জন করেছে একাগ্র প্রতীক্ষায়।

"প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে ;
অনেক দেরি হয়ে গেল
দোষী অনেক দোষে।
তার লাগি যা শাস্তি নেবার
নেব মনের তোষে।
প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে।...

ডাকতে যারা এসেছিল
ফিরিল তারা রোষে।
প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে।"

গীতাঞ্জলি/১৫১

ইসলামের প্রবর্তক সকল সূফীর জনক—সূফী হজরত মহম্মদ (দঃ)/এর বাণী—"বিশ্বাসীদের অন্তর আল্লাহর আরশ বা আসন।" এই আসনে সূফীগণ তাঁদের একান্ত আরাধ্য জনকে পাওয়ার জন্য সদাই ব্যাকুল। তাঁদের আমন্ত্রণ প্রাণ দিয়ে, তাঁদের আহ্বান জীবন দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সকল কিছুর মায়া ত্যাগ করেও বিসর্জন দিয়ে।

"তুমি তবে এসো নাথ, বোসো শুভক্ষণে
দোহে মনে গাঁথা এই মহাসিংহাসনে।

মোর দু'নয়নে ব্যাপ্ত এই নীলাম্বরে
কোনো শূন্য রাখিয়ো না আর কারো তরে।...
বোসো তুমি মাঝখানে। শান্তিরস দাও
আমার অশ্রুর জলে, শ্রীহস্ত বুলাও
সফল স্মৃতির 'পরে, প্রেয়সীর প্রেমে
মধুর মঙ্গলরূপে তুমি এসো নেমে।" নৈবেদ্য ২৮

ইসলামের সূফী সাধকগণ যখন তাঁরা তাঁদের দুর্গম পথের (শরীয়ৎ, তরিকৎ, মারেফৎ, হাকিকৎ) তৃতীয় মঞ্জিল 'মারেফৎ' অতিক্রম করে চতুর্থ মঞ্জিল 'হরিকৎ'-এ অবস্থান করেন, তখন তাঁদের অবস্থা হয় প্রেমিক ও প্রেমিকাতে একেবারেই একাকার ও 'এক'। তখনই তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ (মনসুর হাল্লাজ) বলে থাকেন—'আনাল হক', আমিই সত্য, বা আমিই আল্লাহ্। যদিও ইসলামের শরীয়তের চোখে একথা কুফরী কালাম বা নিষিদ্ধ বাণী। কিন্তু এখানে তাঁরা এক হয়ে, একত্রিত হয়ে আপন অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বা হারিয়ে শুধু তাঁরই অস্তিত্বের জয়গান করতে থাকেন।

"দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
এ কী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার।...
তোমারি মিলন শয্যা, হে মোর রাজন্
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্রকান্ত। ওগো বিশ্বভূপ
দেহে মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ।" নৈবেদ্য ২৭

"সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর। গীতাঞ্জলি/১২০

যাঁর মনের মধ্যে ধনের আকাঙক্ষা, জনের আকাঙক্ষা ও মানের আকাঙক্ষা থাকে, তিনি আর যাই লাভ করুন, কোনদিনই সূফীমনকে লাভ করতে পারেন না। তাই সাধারণ মানুষের জন্য সেই অসাধারণ ও অসীমকে প্রাপ্তির পথে বাধা স্বরূপ দেখা দেয় এ সংসারের ধন-মন-মান ও লজ্জা-শরম-ভয়। সূফী চরিত্রের মূল কথাই হচ্ছে এ কয়েকটি থেকে প্রথম মুক্তিলাভ এবং পরে তাঁকে লাভ। এই কয়েকটির চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকতে 'তাঁর' চিহ্নও মিলিবে না। এই কয়েকটি হতে যিনি নিজকে যতটা দূরে রাখতে পারবেন, তিনি ততটাই 'তাঁকে' নিকটে পাবেন। নচেৎ ওই গুলো মাঝে থেকে যাবে বাধা, বেড়া ও ব্যবধান রূপে। এই সূফী চরিত্রের অনবদ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে।

"তোমার প্রেম যে বইতে পারি
এমন সাধ্য নাই।
এ সংসারে তোমার আমার
মাঝখানেতে তাই
কৃপা করে রেখেছ নাথ,
অনেক ব্যবধান—
দুঃখ-সুখের অনেক বেড়া
ধনজনমান।" গীতাঞ্জলি/৬৬

আমরা রবীন্দ্রকাব্যে দেখতে পাই সূফী-চরিত্রের একটি নিখুঁত ছবি, ভগবৎ-প্রেমে ভক্ত মানবের একটি যথার্থ স্বরূপ।

"শক্তি যারে দাও বহিতে
অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দা
ঘুচায়ে দাও তার।
না রাখ তার ঘরের আড়াল,
না রাখ তার ধন,
পথে এসে নিঃশেষে তায়
কর অকিঞ্চন।
না থাকে তার মান-অপমান
লজ্জাশরম ভয়—
একলা তুমি সমস্ত তার
বিশ্বভুবনময়।" গীতাঞ্জলি ৬৬

যে জীবন শুধু একমাত্র তাঁর জন্যই জগতের সমস্ত কিছুকেই জলাঞ্জলি দিতে পেরেছে, যে প্রেম একমাত্র 'তাঁকে' নিয়েই প্রাণকে পূর্ণ করতে পেরেছে, যে আত্মা পরিতৃপ্ত হতে পেরেছে একমাত্র 'তাঁরই' তৃপ্তিতে, তিনিই শুধু 'তাঁকে' পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

"এমন করে মুখোমুখি
সামনে তোমার থাকা,
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ করে রাখা।
এ দয়া যে পেয়েছে তার
লোভের সীমা নাই—
সকল লোভে সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে ঠাঁই।" গীতাঞ্জলি/৬৬

উপসংহার :

সূফীবাদ : 'সূফীবাদ' বা 'তাসাউফ' ইসলামের দুর্গ। 'শরীয়ৎ' (ইসলামের অনুশাসন) তাসাউফের দুর্গ-প্রাচীর। এই প্রাচীরের বাইরে গেলে ইসলামের সঙ্গে তার কোন শরীয়ৎগত সম্পর্ক থাকে না। 'তাসাউফ' ইসলামের প্রাণ এবং 'শরীয়ৎ' ইসলামের দেহ। তাই দুয়েরই প্রয়োজন—প্রাণ ও প্রাণাধার।

বাংলা সাহিত্যে যে সূফী প্রভাব, তা কোনদিনই সরাসরি সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাঁদের প্রভাব প্রথম লক্ষ্য করা যায়—পল্লী মানুষের মুখের কথায়, কাব্যে, গানে, গজলে, গীতে ইত্যাদিতে। পঞ্চদশ শতক থেকে এই প্রভাব তার পায়ের মাটি শক্ত করে তাকে দাঁড়াতে শেখাল। এবং প্রবেশ করল বিদগ্ধ মানুষের মনের মাটিতে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বাঙালী-মানস সূফী প্রভাবকে যে গ্রহণ করেছিল, পরবর্তী শতকে তার সুষ্ঠু প্রাঞ্জল প্রকাশ পেল বাংলা সাহিত্যের পাতায় পাতায়।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সূফী-সাধনার যে মিলন ও একাত্মতা বোধ ঘটেছিল, তার প্রমাণ বৈষ্ণব সাহিত্যেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন সূফী সাহিত্যের 'আশেক' ও 'মাশুক' একদা বৈষ্ণব সাহিত্যের 'রাধা' ও 'কৃষ্ণে' পরিণত হল। সূফী সাহিত্যের 'হিজরান' ও 'বিসাল' বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম ও পীরিতি। তবে বহু স্থানে বর্তমানে এর রদবদল বা বিকৃতি ঘটতেও দেখা যায়।

এইভাবে ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে বিশেষ করে ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের লিখিত অধ্যাত্মিক ভাবধারার সঙ্গে এক অপূর্ব মিলন ঘটল। ভারতীয়গণ আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের সরাসরি দেবতার আসনেই দেখতেন। যেখানে আরব, অনারব ও পারস্যের মুসলমানগণ সমস্ত সিদ্ধপুরুষদের সোজাসুজি আল্লার 'আরশে' না দেখে আল্লার মহিমা-জগতের অপূর্ব মহিমা রূপেই দর্শন করতেন। এইভাবে একদিন ভারতীয়গণ জানল মানুষকে সরাসরি দেব রূপে না দেখে দেব-মহিমায় দেখতে। অন্যদিকে মুসলমানগণ বুঝল সমস্ত মানুষকে নেহাৎ মানুষ রূপে না দেখে আল্লার আসনে বিকল্পরূপে চিন্তা করতে।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—"সুফী মতের ইসলামের সাথে বাংলার সাংস্কৃতির মূল সুরের কোন বিরোধ নেই। এবং এই সুফী মতাদর্শ অতি সহজেই দেশজ-যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন-মার্গের সঙ্গে এক আপস করে নিয়েছিল।" (জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পৃঃ ২৫, ২৬)।

এই জন্যই বাংলার হিন্দুরা খাঁটি হিন্দু থেকেই সূফী ভাবকে, চিন্তাকে আপন করে আত্মস্থ করে নিতে পেরেছিলেন। যে কারণে মুসলমানদের সঙ্গে তাঁরাও মুসলমান-সূফী দরবেশদের অন্তরযোগে ভাল বেসেছিলেন, ভক্তি করেছিলেন। তাঁদের 'মাজার শরীফ' সমাধিগুলোকে এক সুরে এক প্রাণে পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন। একথা বললেও কোন অত্যুক্তি করা হবে না যে, বহু হিন্দু নর-নারী ভক্তিমার্গে মাজার শরীফগুলোতে আপন আপন প্রাণের অর্ঘ্য ও আরতি দিতে বহু মুসলমান নরনারীকেও অতিক্রম করে থাকেন। এই ভক্তিযোগ হিন্দু নরনারীর হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে, রক্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। তাই এই ভক্তি তাঁদের জন্মগত অধিকার ও সহজাত প্রবৃত্তি। বিশেষ করে ভারতীয় হিন্দু রমণীগণ বিশ্বের দরবারে একদিন ভক্তিমার্গে শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন। আজিও ভক্তিমার্গে ভারতীয় রমণীগণ প্রবাদস্বরূপ।

সুতরাং বাংলা সাহিত্যে যে সূফী-প্রভাব বা সূফী মিলন তা হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেরই ভক্ত লেখক-লেখিকাদের বিশেষ করে ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ লেখনীর অসামান্য ও অভাবনীয় এক অক্ষয় অবদান। অতএব সূফীবাদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস—ভারতের জাতীয় ঐক্য ও একাত্মতা বোধের একটি মহিমামণ্ডিত শাশ্বত গগনচুম্বী মিনার।

বাংলার পীর বা সূফী সাহিত্য

মানব জাতির ইতিহাস ও সাহিত্য :

বাংলার পীর বা সূফী সাহিত্য সমগ্র মানব জাতির অখণ্ড ইতিহাস ও আদর্শ সাহিত্য। কেননা সারা বিশ্বজুড়ে মানবতা যখন মৃত্যুপ্রায়, ঠিক সেই সময় আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) বিশ্বের বুকে নিয়ে এলেন মানবতার বাণী, মনুষ্যত্বের বার্তা। মহানবী (সাঃ) আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং আরব দেশেই আল্লাহর প্রেরিত বাণী কোরয়ান প্রচার করেছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। এবং তা অপেক্ষাও সন্দেহ নেই, তিনি ছিলেন সারা সৃষ্টিকুলেরই নবী। সারা দুনিয়ারই নবী। তাই তাঁর প্রচার অভিযান প্রযোজ্য ছিল সারা পৃথিবীর ওপরই। একথাটি তাঁর নয়, এ অমোঘ ঘোষণাটি পবিত্র কোরআনেরই। কোরআন- ১১ ঃ ৭৭-৮০, ৩৪ ঃ ২৮। তখনকার দিনে যানবাহনের অসুবিধার জন্য তিনি তাঁর জীবিতকালে আরবের বাইরে প্রচার অভিযান চালাতে পারেননি। কিন্তু এ কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর উম্মত শিষ্য বা অনুচরদের উপর। পরবর্তীকালে তাঁর যোগ্য অনুচরবৃন্দ তাঁর নির্দেশ পালন করেন শত বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করেই। এমনকি অনেক সময়ই আপন আপন জীবনকে বিপন্ন করেও। এই কারণেই ইসলাম আজ বিশ্বের কোণায় কোণায় তার আপন মহিমায় বিরাজিত।

মহানবীজীর (সাঃ) পরবর্তীকালে তাঁর যোগ্যতম শিষ্যগণ, পীর সূফী ও দরবেশগণ নবীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আপন আপন দেশের ভৌগোলিক সীমরেখা পেরিয়ে যেখানেই মানবতার পতন ঘটেছে, সেখানেই হাজির হয়েছেন জীবন-মরণ পণ করে। সারা বিশ্ব জুড়ে মুমূর্ষু মৃতপ্রায় মরণমুখী মানবতাকে বাঁচানোই ছিল ইসলামের প্রধান কাজ। তাই অখণ্ড মানবজাতির অগ্রগতিতে এবং জীর্ণ-শীর্ণ মানবতার সেবায় সূফী পীর ও দরবেশগণের প্রয়োজনীয়তা আজও শেষ হয়নি। সুতরাং সূফী পীর ও দরবেশগণের মহান জীবন সংবলিত সাহিত্যের ইতিহাস কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগত ব্যাপার নয়, বরং এটা ছিল সমগ্র মানবজাতির অখণ্ড ইতিহাস বা আদর্শ।

বিশ্বজুড়া মানবতার রুখে দিয়ে মৃত্যুবাণ
মরণমুখী মনুষ্যত্বে সঞ্চারিলে বীরের প্রাণ।

মহানবীজীর (দঃ) চিন্তায় সমগ্র বিশ্বে সকলের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন-ধারার প্রয়োজন। যে ব্যবস্থাপনায় কোন কৃত্রিম ব্যবধান থাকবে না। কোন ভেদাভেদ থাকবে না। সকলেই গুণগত মাপকাঠিতে বিচার্য হবে। এটাই ছিল মহানবীজীর (দঃ) চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারাটি যে নদীতে প্রবাহিত হল, তারই নাম তো ইসলাম। ইসলামের আদর্শ হল—সকল জন্মগত, জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত এবং নিদারুণ অসম অর্থনৈতিক অবস্থার বা ব্যবস্থার কৃত্রিম ব্যবধানগুলোর মূলোচ্ছেদ করা এবং বংশানুক্রমে বসে খাওয়ার মূলে কুঠারাঘাত করা এবং স্থাপন করা সর্বজনগ্রাহ্য সকলের জন্য এক আদর্শজীবন ধারা। এটিই ছিল মহানবীজীর (দঃ) প্রধানতম উদ্দেশ্য।

মনের কোণে দেখেছি তোমার দুইটি ছিল আরাধনা
সাম্যের বুকে সমাজগড়া, প্রতিপালকের বন্দনা।
বিশ্ববুকে তোমার ব্রত বিশ্বপিতার বন্দনা
সেই পিতারই সন্তান সবে এক অভিন্ন ভাই জানা।

এই কারণে সূফী বা পীর-দরবেশগণের জীবনাদর্শ তথা ইসলাম কোন দেশ বা জাতি বা কোন কালের গণ্ডির মধ্যে সীমিত নয়। এই জন্যই এই সকল মহৎ ব্যক্তিবর্গের ইতিহাস বা জীবনচর্চামূলক সাহিত্য ও জীবন-সাধনা সমগ্র মানজাতির অখণ্ড ইতিহাস ও আদর্শ সাহিত্য।

পীর শব্দ :

পীর শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধ বা প্রাচীন, এবং এর ভাবার্থ আধ্যাত্মিক গুরু। শব্দটি ফারসি। ফারসি পীর শব্দের ন্যায় বৌদ্ধগণ কর্তৃক ব্যবহৃত 'থের' শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। সংস্কৃত 'স্থবির' শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। এই পীর বা সূফীগণের অভ্যুদয় ঘটেছিল তাঁদের আপন আপন জীবনের ধারণাতীত চূড়ান্ত সাধনাকে কেন্দ্র করেই। এটা কোন বংশানুক্রমিক ব্যাপার হিসেবে আগেও ছিল না, এখনও নয়। এটা যেমন বংশগত পড়ে-পাওয়া ধন নয়, ঠিক তেমনি কোন স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গত ও ডিগ্রী বা উপাধিও নয়। এটা নিরঙ্কুশ ব্যক্তিজীবনের নিবিড় ব্যক্তিসাধনা। যদিও বর্তমানকালে একজন দূর অতীতের সাধককে তাঁর বংশধরগণ হাজার বছর ভাঙিয়ে খাচ্ছেন। সূফী-পীর বা দরবেশ হওয়ার পশ্চাতে দুটো জিনিস প্রধানত লক্ষ্য করি—১। ব্যক্তিজীবনের সীমাহীন সাধনা, ২। এবং আল্লাহর সীমাহীন রহমত। পীর সূফী দরবেশ সকলেই ছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারক। পীর বা সূফীগণের অনেকেই সংসারধর্ম পালন করেননি। এ দৃষ্টান্ত মহানবীজীর (সাঃ) জীবিতকালেও তাঁর কিছু সাহাবীগণের মধ্যেও ছিল। যাঁরা মদিনার মসজিদেই দিবারাত্রি কাটাতেন। যাঁরা সদাই প্রস্তুত ছিলেন মহানবীজীর (দঃ) আদেশ ও নির্দেশের অপেক্ষায়। এঁদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হত। মহানবীজী (সাঃ) এঁদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। এঁদের তুলনাহীন ত্যাগ ও তিতিক্ষা বিধর্মীর চোখেও ইসলামবে মহান করেছে। এঁদের ব্যক্তি-জীবনের আচরণ ও বিচরণ সর্ব মানুষকে করেছে মুগ্ধ, ইসলামকে করেছে গৌরব দান, এঁদের চারিত্রিক গুণাবলী চরম শত্রুকেও করেছে মিত্রে পরিণত, অসংখ্য মানুষকে করেছে আকৃষ্ট, এঁরা সুবাসিত ফুল রূপে অসংখ্য মানুষকে ভ্রমর ও মৌমাছি রূপে মধুর টানে মোহমুগ্ধ করে তুলেছিলেন। তবে দরবেশগণকে দেখি সংসারধর্ম পালন করেও ইসলামের মহান প্রচারকের চির খ্যাতি অর্জন করে গেছেন। জঙ্গে বা যুদ্ধে তাঁদের সম্মুখে ছিল দুটো জিনিস—জিতলে গাজী, হারলে বা মরলে 'শহীদ'। শেষ উপাধিটিই তাঁদের জন্য বেশি লোভনীয় ছিল। কি অপূর্ব জীবন, কি অপূর্ব মৃত্যু। হে মহান সূফীকুল—

সদাই প্রস্তুত ছিলে যেতে বারে বারে
মৃত্যুহীন জীবনের মরণ-দ্বারে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগ :

৫৭০ খ্রীস্টাব্দে মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) মক্কার সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রীস্টাব্দে নবুয়ত বা ঐশীলাভ করেন। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। ৬৩২-৬৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৩০ বছরকাল চার জন ন্যায় পরায়ণ খলিফা (আবুবকর-ওমর-ওসমান ও আলী) খেলাফত পরিচালনা করেন। ৬৬১-৭৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত ৯০ বছর কাল উমাইয়াগণ খেলাফতের নামে রাজ্য পরিচালনা করেন। এবং ৭৫০-১২৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত আব্বাসিয়াগণ খেলাফতের নামে রাজ্য বা রাজত্ব চালান। এই দুই গোত্রের মধ্যে উমাইয়া গোত্রের দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত অন্য কাউকেই প্রকৃত অর্থে খলিফা বলা যাবে না। দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত সকলেই ছিলেন স্বঘোষিত খলিফা।

পীর আগমন ও হিন্দু সমাজ :

উমাইয়া বংশের শেষ অধ্যায় এবং আব্বাসিয়া বংশের প্রথম অধ্যায় খ্রীস্টিয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বন্দর আরব উপনিবেশে পরিণত হয়। হযরত সুলতান বায়জিদ বুস্তামী সম্ভবত খ্রীস্টিয় নবম শতাব্দীর শেষার্ধে ইসলাম প্রচারার্থে চট্টগ্রামে এসে থাকবেন। এবং খ্রীস্টিয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি চট্টগ্রামে ইসলামধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে। খ্রীস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে গাজী ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক প্রথমে রাজশক্তি নিয়ে গৌড়-লক্ষ্মণাবতী অধিকৃত হয়। পরবর্তী সময়ে অনেক পীর-দরবেশ বঙ্গে আগমন করেন। এই সময় সনাতনী রক্ষণশীল হিন্দু

সমাজ কর্তৃক বর্ণাশ্রম প্রথার অপপ্রয়োগে উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে নিম্নবর্ণের অগণিত লোক বহু সামাজিক নির্যাতন ভোগ করতেন। পরবর্তীকালে তাঁরা উচ্চবর্ণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং ইসলামের উদারতায় আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হন।

সূফীগণের কৃতকার্যের কারণ :

স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন ঃ "হিন্দু সমাজের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার হাত থেকে নিস্তার লাভের আশায় ভারতের পতিতেরা দলে দলে সাম্যবাদী নবধর্ম গ্রহণ করল।" ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার বলেন—"সামাজিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এই উদারতা এবং সমান অধিকারের আদর্শই ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।"

পীর-দরবেশগণের দরগাহ্-দরবারশরীফ ও আস্তানায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকার থাকায়, সেগুলি সবার পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়। পীর দরবেশদের সামান্য আস্তানাগুলো শাস্ত্রের নীরস আলোচনা বা ধর্মসংস্কারের পরিবর্তে প্রাণের ভালবাসা ও প্রেমের লীলা এবং আত্মার স্বাভাবিক স্ফুরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এই আস্তানাগুলো বিজিত ও বিজেতার মিলনস্থলে পরিগণিত হয়। অধ্যাপক রেজাউল করিম বলেন—"সূফী মতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা সকল ধর্মের সহিত খাপ খেতে পারে।'

পীরসাহিত্য :

সূফী মতাবলম্বী ইসলাম ধর্ম প্রচারক পীরগণকে কেন্দ্র করে যে বাংলা সাহিত্য গড়ে ওঠে, সংক্ষেপে তাই-ই পীরসাহিত্য। বাংলা পীরসাহিত্য 'মঙ্গল' জাতীয় সাহিত্য। মঙ্গল এই জন্য বলা হয়েছে যে পীরভক্ত হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের সংস্কার এই যে, পীরের জীবনে কাহিনী ও তাঁর অলৌকিক শক্তিকথা পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে শ্রোতা বা পাঠকের পুণ্য অর্জন বা মঙ্গল হয়। যার ফলস্বরূপ তাদের জীবনে মঙ্গল বা কল্যাণ হয়ে থাকে। এখানে পীরের দরবারে জনগণ পবিত্র কোরআনের একটি কথার দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়েছে বলে মনে হয়। পবিত্র কোরআন বলে—"যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তা শ্রবণ কর ও নীরব থাক, যেন তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও।" ৭ ঃ ২০৪। সূফীগণের দরবারে পবিত্র কোরআন-হাদিস নিয়েই আলোচনা চলে। এই সাহিত্যকে পীরসাহিত্য বলার কারণ, এই সাহিত্যধারায় পীর-কাব্য, পীর-নাটক ও পীর সম্বন্ধে গদ্যে রচিত জীবনকথা ও পীর লোককথা পৃথক পৃথক ভাবে স্থান পেয়েছে।

পীরসাহিত্যকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—১। পীরকাব্য, ২। পীর জীবনী গদ্য রচনা, ৩। পীর নাটক, ৪। পীর লোককথা। বাংলার পীরসাহিত্যের কোন কোন অংশে এমন কিছু বক্তব্য আছে, যাতে এদেশের মুসলিম সমাজ-ব্যবস্থায় কিছু কিছু অনৈস্লামিক ঘটনা ইতিহাসের অঙ্গ হিসেবে এসে পড়েছে। এবং সে ধারা আজও অম্লান। অম্লান হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। কেননা সমাজে যা কিছুই ঘটুক, তার কিছু সাহিত্য-রূপ সমাজ-দর্পণে প্রতিফলিত হবেই।

কেন এরূপ হল। কেন মুসলিম সমাজে অনৈস্লামিক চিত্র ফুটে উঠল। যার প্রতিফলন হলো পীরসাহিত্য বা ইসলাম বাংলা সাহিত্যে। এর মূলগত কারণ, এদেশের মুসলমানগণ প্রধানত এ দেশের হিন্দুদেরই বংশধর। যাঁদের পূর্বপুরুষগণ এককালে হিন্দুই ছিলেন। তাই এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে অনেক হিন্দু আচার-আচরণ লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে বা অনেক সময় মুসলমানগণ এটি তাঁদের অজ্ঞাতসারেই করে থাকেন। কেননা তাঁদের রক্তের ধারায় ও রুধির কণায় কণায় হিন্দু প্রভাব আত্মগোপন করে আছে। সুতরাং ঐ কারণেই এদেশের মুসলমানদের হিন্দু-আদর্শ থেকে ইসলামি আদর্শে উত্তরণের প্রচেষ্টার মধ্যে অনেক অনৈস্লামিক চিত্র বা প্রভাব পীরসাহিত্যে বা ইসলামি বাংলা সাহিত্যে রয়ে গেছে।

পীরসাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমূহ :

১। পীর কাব্য-সাহিত্য :

পাঁচালী কাব্যসমূহ দ্বিপদী বা ত্রিপদী ছন্দে রচিত। কোথাও কোথাও ভনিতা-সহ কবির আত্মপরিচয়। কোথাও বা ধর্মভিত্তিক আল্লাহ্ বন্দনা। কোথাও বা কাল্পনিক পীর কাব্য। কিন্তু পীরগণ কখনো আল্লাহ্ নন। তাঁরা আল্লার বান্দা মাত্র। অধিকাংশ কাব্য আকারে খুব ছোট। কাব্য হিসেবে সমাজের উচ্চশিক্ষিত মানুষের মধ্যে তেমন স্থান পায়নি। অতি সাধারণ মানুষেরই প্রিয় ছিল।

২। পীর গদ্য সাহিত্য :

পীর গদ্য সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে। এগুলো মূলত পীরগণের জীবনীগ্রন্থ। এতে আছে তাঁদের পূর্ণ কার্যকলাপ, অলৌকিক কাহিনী। এতে আরবী ফার্সী শব্দের বিশেষ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

৩। পীর নাট্য সাহিত্য :

এতে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর চরিত্র স্থান পেয়েছে। নর-নারীর প্রণয় কাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও কোথাও পীরকে ছোট করা হয়নি।

৪। পীর লোক সাহিত্য :

মহান আল্লার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পীরগণ যে সমস্ত অলৌকিক কাজ করেছেন, সেগুলো পরবর্তীকালে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে। এই গুলোই বিশেষ করে পীর লোককথা বা পীর লোকসাহিত্য নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্যই বলা যেতে পারে, পীর ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সুতরাং তাঁদের জীবনধারা, কার্যপ্রণালী, তা যে সাহিত্যেই স্থান পাক, তা জাতির জাতীয় ঐতিহাসিক সাহিত্য। এই দিক বাংলার পীর সাহিত্য ঐতিহাসিক সাহিত্য।

বাংলা সাহিত্যে পীর সাহিত্যের সামাজিক মূল্যায়ন :

যে-কোন সাহিত্য, তার সাহিত্য গুণ যতই কম হোক না কেন, তবুও তা সাহিত্য হিসেবে কিছু না কিছু মূল্য বহন করবেই। কোন রচনা সাহিত্য হলো কি না, এই নিয়ে নানা মনীষীর নানা মত। আবার যত বড়ই সাহিত্য হোক। মহাকালের অমোঘ গতিতে তার মূল্যায়নের কিছু না কিছু তারতম্য হতে বাধ্য। কেননা সমাজ বিবর্তনশীল বলে, পরবর্তীকালে যে সমাজচিত্র মহাকালের বাহন সাহিত্য বহন করে আনে, অন্য এক পরিবর্তনশীল সমাজে ভাবীকালে তা ততটা গ্রহণীয় হয় না। তাই সেদিনের সেই সমাজচিত্র বা সাহিত্য কোনদিনই একেবারেই মূল্যহীন হতে পারে না। বিধাতা পুরুষ মানুষের প্রয়োজনে যুগে যুগে নবী ও রসুল পাঠিয়েছেন। তাঁদের সাথে দিয়েছেন—তাঁর ঐশী বাণী। যাদের বলা হয় পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। গ্রন্থগুলোও সমাজের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। যাদের প্রয়োজন হয়তো হাজার হাজার বছর আগেই মিটে গেছে। নতুন নতুন ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। সুদুর অতীতের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর ধর্মীয় প্রয়োজন আজ থাক্ আর নাই থাক, তাদের সাহিত্য-মূল্য আজও রয়ে গেছে, যত দিন যাবে, ততই তারা প্রাচীনের মহত্ত্ব লাভ করবে। তাই পীর সাহিত্য সমাজের মহৎ সাহিত্য। পীর সাহিত্যের আবেদন ছিল মনুষ্যত্বের, তার অবদান ছিল মানবতায় উত্তরণ। তাই যত দিন মানুষ আছে, থাকবে তাদের মনুষ্যত্ব মানবতা। এবং এই মনুষ্যত্ব ও মানবতায় পাড়ি দেওয়াব প্রচেষ্টা চিরদিনই চলতে থাকবে। তাই পীর সাহিত্য অতি প্রবীণ হয়েও হবে নবীনের দিকদর্শন।

এ প্রসঙ্গে শেষ কথা। বিশ্বের সকল সাহিত্যেরই একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য যদি সাহিত্য হয়, তাহলে তা সমাজ দর্পণ বা সমাজচিত্র।

সাহিত্য সমাজনদীর প্রশান্ত সলিল
জীবনের সূক্ষ্মাতীত বাস্তব দলিল।

কোন স্থান বা কালের সমাজজীবনের যে উত্থানপতন, যে ভাঙা-গড়া, যে হাসি-কান্নার কলরোল যে রাজনৈতিক জুয়াখেলা, যে প্রেম-প্রীতির পরিচ্ছন্ন মিলন, যে বিরহ বেদনা, কখনো বা মানুষের বিপ্লব হতে বিদ্রোহ, কখনো বা প্রকৃতির রোষানলে মহা বিপর্যয় ; এই ঘটনারাশি যে ইতিহাস সৃষ্টি করে, এই সৃষ্টির যা কালজয়ী সাক্ষী বা নিখুঁত দর্পণ তা তো সেদিনের সেই স্থানের সাহিত্য। সুতরাং সকল সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, দার্শনিক বা সকল অবস্থারই কালের কপোলতলে বা কালস্রোতে একমাত্র সাক্ষী বা পরিচায়ক হলো সেদিনের সাহিত্য ভাণ্ডার। অতএব পীর সাহিত্যের মূল্যায়ন পাণ্ডিত্যের কালিতে কলমে বা কালের কষ্টিপাথরে যত কম বেশিই হোক না কেন, দূর অতীতের সমাজ দর্পণ, ও সমাজ চিত্র হিসাবে তার সামাজিক সাহিত্যমূল্য কোনদিনই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অপাংক্তেয় হতে পারে না। খাঁটি সাহিত্যই খাদহীন ইতিহাস।

বাউল সাহিত্যে ইসলামি প্রভাব

বাউল মতবাদ দেশজ মতবাদ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধর্মকে মানুষ সহজতর পরিবেশে আপন করে সহজ করে উপলব্ধি করতে চেয়েছে। শাস্ত্রীয় কঠিন মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তাই গড়ে উঠেছে কিছু কিছু সহজ অশাস্ত্রীয় মতবাদ। আমাদের দেশে এই পথেই বাউল মতবাদের সৃষ্টি। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের মনে ধর্মকে সহজতর কাঠামোয় দেখার যে প্রয়াসী লক্ষণীয় ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তার মূল সুর একই। এ যেন একটি গতিশীল নদী। উৎপত্তি মূল থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে সাগরের সঙ্গে মিশে যাওয়াটাই তার প্রধান লক্ষ্য। এই সহজ মতবাদের যিনি জীবন দেবতা, তাঁর বাণী বিশ্বের সকল মানুষেরই অন্তরের বাণী। বিভিন্ন দেশে ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের পাশে পাশে এই অশাস্ত্রীয় মতবাদ জন্ম নিয়েছে। ইসলামের সূফী মতাদর্শও অনেকখানি এমনিভাবে বিকাশলাভ করেছে।

বাউল গানে ইসলামের প্রভাব কতখানি, সেটা বোঝাতে হলে সূফীবাদ সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা দরকার। কেননা ইসলামের সূফীবাদই বাংলার বাউল গানকে প্রাণবন্ত ও প্রভাবান্বিত করেছে। ইসলাম ধর্মের কঠোর অনুষ্ঠান নয়, অনুশাসন নয়, বরং তার কোমল আত্মিক শাশ্বত আবেদনই বাউলকে করেছে ইসলাম দ্বারা পরিবেষ্টিত ও পরিমার্জিত। এই সূফী ধর্ম প্রেমবাদের ধর্ম। এবং এই প্রেমবাদ নিছক ও নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহকে কেন্দ্র করেই গঠিত। সূফী নিজেকে প্রেমিক ও আল্লাহকে প্রেমময় মনে করেন। আবার সৃষ্টি প্রেমেই স্রষ্টাপ্রেমের বিকাশ। এইটাই সূফী সাধনার মানবিকতা বোধ। এই মুসলমান সূফী সাধকেরা নানা তবিকায় বা নানা পথে বিভক্ত ছিলেন। বাংলাদেশে চিস্তিয়া, সোহরাওযারদীয়া, কাদেরিয়া, কলন্দরীয়া অন্যতম।

আচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—"সূফী মতের ইসলামের সাথে বাংলার সংস্কৃতির মূল সূরের কোন বিরোধ নাই। এবং এই সূফী মতাদর্শ অতি সহজেই দেশজ যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন মার্গের সঙ্গে একটা আপস করে নিয়েছিল।"

পরবর্তীকালে আমরা বাউল গানে সূফীবাদ ও বৈষ্ণববাদের অপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাই। এই মুসলমান বাউল ফকিররা সূফী-সাধকদের মতো হৃদয়ের মধ্যে পরমাত্মা পরম সুন্দরকে উপলব্ধি করেছেন। এবং সেই পরম সুন্দরের রূপকে তারা বিভিন্ন রূপক বা উপমার মাধ্যমে রূপায়ণ ও প্রকাশ করেছেন। তাতে একদিকে যেমন আছে পবিত্র কোরআনের উপমা, তেমনি আছে ভারতীয় দর্শনের ইঙ্গিতময় ব্যঞ্জনা।

মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি অনুসারে এই মতবাদ আপনা-আপনি মানুষের বুকে জেগে উঠেছে। এই বাউল মতবাদ সূফী বৈষ্ণব মতবাদের মত একটি অধ্যাত্মসাধনা। কিন্তু নিরক্ষর অশিক্ষিত মানুষের হাতে এসে এই মতবাদ এক নতুন রূপ গ্রহণ করে। এই বাউল গানে যে দর্শন আছে, তা মানুষকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে বাধা-বন্ধনহীন মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই দর্শন সূফীবাদেরও অন্তরের কথা। এবং যেখানেই সূফীবাদ, সেখানেই ইসলামের প্রাণশক্তির জয়গান। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে অভেদ কল্পনা। সূফীকুল চিরদিনই আল্লাহকে বিভিন্নভাবে চিন্তা না করে অভিন্নভাবেই চিন্তা করেছেন।

তিনি যে একক শুধু অদ্বিতীয় নয়
সকল খণ্ডকে নিয়ে অখণ্ডময়।
তাঁহাকে সীমিত করে যে করে আপন
তাঁহারে সম্মান দিতে সে বড় কৃপণ।

দেহ ও প্রাণের লীলা মানুষে যেমন
জগৎ প্রভুর কাছে জগৎ তেমন।
মোর দেহ মোর প্রাণ মোর পরমায়ু
তোমারই শরীর মাঝে তোমারই স্নায়ু।

বাউলগানে যে সূফী-প্রভাব দৃষ্ট হয়, তা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব—সকল মানুষের মাঝে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বিরাজমান। এবং সকল ধর্মের গুরু স্বরূপ সিদ্ধপুরুষ হচ্ছেন নবী বা ধর্মাবতার। যিনি আল্লার আদেশক্রমে নির্দেশিত পথে মানুষকে পরিচালিত করেন। এই আল্লাই হলেন পরম সত্য। তাঁর প্রেম করুণালাভ করাই হচ্ছে বাউলের একমাত্র কাম্য। বাউল লালন ফকিরের সাধনার লক্ষ্যও ছিল স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির পূর্ণ মিলন। এবং সূফী কূলও স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে সব সময়ই অভেদ কল্পনা করে থাকেন।

সূফীবাদ একান্তভাবে হৃদয়-আবেগের মতবাদ, কোন যুক্তিতর্কের মাপকাঠিতে একে বিচার করা চলে না। প্রেম হতেই সব শুরু এবং প্রেমেই তার শেষ। মানুষের ভেতরেই মানুষের পূর্ণতা বিরাজমান। মানুষ আপন চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা নিজকে পূর্ণরূপে বিকাশ করতে পারে। এই সাধনায় যিনি সিদ্ধকাম, তিনিই পূর্ণ মানব। বিজ্ঞানীরা স্রষ্টার সৃষ্টিকে নিয়ে গবেষণা করেন, আবিষ্কার করেন বহু নূতন বস্তু। কিন্তু সূফী ও বাউলগণ গবেষণা বা সাধনা করেন স্বয়ং স্রষ্টাকে নিয়েই, এবং আবিষ্কার করেন তাঁকেই।

স্রষ্টাকে আবিষ্কার করতে হলে পূর্ণ মানবের প্রয়োজন। এই কথাই ধ্বনিত হয়েছে বাউলের গানে। এবং এই পূর্ণ মানব স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে মিলন সেতু। এই পূর্ণ মানবই সূফী ও বাউলের মুরশিদ। সূফীবাদেব মতে স্রষ্টা তাঁর বিশ্বসৃষ্টিতে নানাভাবে নিজেকে বিকাশও প্রকাশ কবেছেন। সূফীমতে তাঁকে ধরতে গেলে মুবশিদ ছাড়া উপায় নেই। বাউল কণ্ঠেও একই মতবাদ প্রতি ধ্বনিত হয়েছে।

সূফী ও বাউলের মধ্যে আর একটি বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করা যায়। সূফীগণ যখন আত্মাও আত্মজগৎ নিয়ে ব্যস্ত, তখন বাউলগণ দেহ জগৎ ও দেহতত্ত্ব নিয়ে মগ্ন।

"যারে আকাশ-পাতাল খুঁজি
সে যে এই দেহেতে রয়।
আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে
দেখনারে মন চেয়ে।" —লালন

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন—"বাংলাদেশের প্রেমপন্থী মুসলমান সাধকগণ অল্পবিস্তর সকলেই সূফীপন্থী। সূফীমতে প্রেমই হলো ভগবানের পরম স্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই আবাব এই জগৎ সৃষ্টি। নিজের অনন্ত প্রেম আস্বাদনের জন্য এক পরম স্বরূপের বন্ধু রূপে লীলা, এটিই হলো সৃষ্টির তাৎপর্য।" তাই প্রেমের কবি হাফেজ বলেন—

"ঢাল সুরা সখি সাজাও পেয়ালা
শরম আছে কি তায়
প্রেমের মরম তারা কি জানে লো
ধরম যাহারা চায়।"

কবি চণ্ডীদাস বলেন—

"মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই সখি, তাদের কথায়
বাহিরে রহন তারা।"

বাউল লালন বলেন—

"কুলবতীর কুল যে গেল
বাদশাহ বাদশাহী ছাড়লো
শুধু কালারে ভেবে।
কত কত মুনিঋষি
যুগ যুগান্ত বনবাসী।"

ডঃ ওসমান গনী বলেন—

রূপ নয় রুচিবাগে কালো ও ধলো
শ্রাবণের মেঘসম হও তুমি কালো
জানিলে অন্তর দিয়ে বাস তুমি ভালো
জানিব সুন্দরী নও স্বর্গের আলো।

লালনের গানে ভারতীয় দর্শন ও পারস্য সূফী সাধনার এক অপূর্ব সার্থক সমন্বয় ও মিলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের "একত্র হ্‌'ছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনেই ভারতের সত্য পরিচয়। বিবাদে বিরোধে বর্বরতা।" এই ভাবে বাংলার বাউল সাহিত্য একদিকে যেমন পারস্য সাহিত্যের মধুকর, অপর দিকে তেমনি ভারতীয় সাহিত্যের রসসন্ধানীদের দ্বারা ভরপুর হয়ে ওঠেছে।

ভারতের 'ভক্তি আন্দোলন' যেভাবে একদিন সূফীবাদের 'বাই-প্রোডাক্ট' রূপে জন্ম নিয়েছিল, বাউল সাহিত্যও অনুরূপভাবেই সূফীবাদের শাখানদী রূপে জন্ম নিয়েছিল। তাই ভক্তি আন্দোলন এবং বাউল সাহিত্য দুই-ই স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

বাংলা সাহিত্যে মর্সিয়া

সংজ্ঞা :

কোন ট্র্যাজিক বা শোকময় ঘটনা সম্পর্কে প্রশংসাসূচক গান, গাথা অথবা কাব্যরচনা করার রেওয়াজ পৃথিবীর সকল দেশে ও জাতির মধ্যে রয়েছে। 'মর্সীয়া' শব্দটি আরবী। এর অর্থ শোক করা, মাতম করা, ক্রন্দন করা এবং বিলাপ করা। কারবালা যুদ্ধ পূর্ব যুগে কোন মৃত-ব্যক্তির জীবনের গৌরবময় অংশের প্রশংসা কীর্তন প্রসঙ্গে পনেরো হতে বিশটি শ্লোক বিশিষ্ট শোক গাথাকে মর্সীয়া বলা হত। কিন্তু পরে মর্সীয়া অর্থের পরিবর্তন ঘটে। কারবালার মরুপ্রান্তরে নিহত ইমাম হোসেন ও অন্যান্য বীর শহীদগণের উদ্দেশে লিখিত প্রশংসাসূচক কবিতাই বিশেষভাবে মসিয়া নামে অভিহিত হয়। ইহা 'কাসীদা' কবিতার বিপরীত। কোন জীবিত ব্যক্তির গুণকীর্তনের নাম—'কাসীদা' এবং মৃত ব্যক্তির গুণকীর্তনের নাম 'মর্সীয়া'। মহানবীজীর (দঃ) জীবিতকালে তাঁর প্রশংসামূলক যে সমস্ত কবিতা লেখা হত, সেগুলোকে 'কাসীদা' বলা হত। যেমন কাসীদাতুল বুরদা'। অর্থাৎ চাদরের কবিতা। কোন একজন কবি মহানবীজীর (দঃ) প্রশংসামূলক কবিতা লিখে তাকে শোনালে, তিনি কবিকে একটি চাদর উপহার দেন। তখন হতে ওই কবিতার নাম 'কাসীদাতুল বুরদা' অর্থাৎ চাদরের কবিতা। মসীয়ার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'ELEGY', এই শোকগীতি বিষাদক্লিষ্ট করুণ রসের অভিব্যক্তি।

উৎপত্তি : যুদ্ধের বর্ণনাকে আশ্রয় করে আরব দেশে কাব্য সৃষ্টি হত। এবং এই কাব্যে মর্সিয়া একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। মানুষের মন কোন প্রকারে উত্তেজিত হলে, তখন সেই উত্তেজিত ভাবকে কাব্যাকারে ব্যক্ত করা হত। এটি আরব দেশের তামসিক যুগের কথা। অবশ্য এ কথা সত্য, তামসিক যুগে মর্সীয়া সাহিত্যচর্চার যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, ইসলামি যুগে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। কেননা এই যুগেই যথার্থ মর্সীয়া সাহিত্যের উন্নতি বিধান হয়েছিল। পরম আত্মীয় বিয়োগের ফলে মানুষের মনে যে গভীর বেদনার ছায়াপাত হয়, তা মর্সীয়া রচনার মূল ভিত্তি। পৃথিবীর সব দেশেই এই বেদনাবোধ হতেই কাব্য সাহিত্য রূপ লাভ করেছে। আরব দেশের কাব্যও এর ব্যতিক্রম নয়। মর্সীয়া এই ধরনের বেদনার সৃষ্টি।

আরবী সাহিত্যে মর্সীয়া :

মর্সীয়া রচনাকারী কবিদের মধ্যে দু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজনের নাম খানসা, ইনি একজন মহিলা কবি। তাঁর ভ্রাতা সাখর কোন এক যুদ্ধে নিহত হলে তিনি হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। এবং মর্সীয়া রচনা করেন। দ্বিতীয় জন মোতাম্মিম বিননুবয়রা। কোন এক যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ কর্তৃক তাঁর ভাই মারা গেলে তিনিও জ্ঞানহারা হয়ে পড়েন এবং মর্সীয়া রচনা করেন। তখন ওমর ফারুকের যুগ।

হযরত ওসমানের মৃত্যু উপলক্ষে কাফ বিন মালিক নামক এক আরবীয় কবি মর্সীয়া কবিতা রচনা করেন। হযরত আলির শহীদ হওয়ার পর আবি আসবদ দাওয়ালী নামক অপর একজন কবি মর্সীয়া রচনা করেন। হযরত ওসমান ও হযরত আলির মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে কারবালার দুর্ঘটনা ঘটে। কারবালার দুর্ঘটনা একটি ভয়াবহ ব্যাপার। যদি আরব জাতির পূর্বের বৈশিষ্টগুলো বিদ্যমান থাকত, তাহলে কবিগণ এমন করুণ ভাষায় মর্সীয়া রচনা করতেন, যা সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারেও কোনদিনই নির্বাণ লাভ করত না। কিন্তু ইসলামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আরব জাতির বৈশিষ্ট্যগুলো যথেষ্ট পরিমাণে লুপ্ত হয়েছিল। জাতি আর বল্গাহীন ছিল না। ইসলামের আগমনের পর বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম বিশৃঙ্খল জীবন আর ছিল না। আরব তখন পরিমার্জিত পরিশোধিত পরিবর্তিত।

ফার্সী সাহিত্যে মর্সীয়া :

ফার্সী সাহিত্যের ওপর আরবী মর্সীয়ার বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফার্সী সাহিত্যের কবিগণের স্বতঃ উৎসারিত হৃদয় বেগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্য এই সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ফেরদৌসি এবং ফররুখী রচিত মর্সীয়া কাব্যের স্থানে স্থানে গভীর বেদনার ভাব চমৎকার রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। মহাকবি ফেরদৌসি তাঁর জগদ্বিখ্যাত শাহনামায় সুহরাবের মৃত্যুর পর তাঁর মাতার জবানীতে যে শোকগাথা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন, তা চির প্রণিধানযোগ্য ও চির প্রশংসার দাবিদার। পারস্য হতে ইরানী কবি ও সাহিত্যিকগণের ভারত আগমনের ফলে ভারতেও মর্সীয়া রচনার প্রচেষ্টা নতুন করে শুরু হয়।

ভারতে ফার্সী মর্সীয়া সাহিত্য :

ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি নগরী বাদশাহগণের রাজধানী রূপে পরিগণিত হয়। এবং ফারসী দরবারী ভাষার মর্যাদা লাভ করে। ফার্সী মারফত উত্তর ভারতে সাহিত্য সাধনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। কিন্তু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণবশতঃ মর্সীয়া কাব্যের তেমন কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না।

ভারতে উর্দু মর্সীয়া সাহিত্য :

ভারতের দাক্ষিণাত্যে উর্দু সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশলাভ ঘটে। উর্দুভাষায় মর্সীয়া কাব্যের উৎপত্তির মূলে দাক্ষিণাত্যের উর্দু কবিগণের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের দাক্ষিণাত্যে অর্থাৎ হায়দরাবাদে শিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সেখানকার কবিগণও রাজ-অনুপ্রেরণা লাভ করেন। সুতরাং ভারতীয় ভাষায় অর্থাৎ ফার্সী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় মর্সীয়া সাহিত্য পারস্য দেশীয় বণিক, দরবেশ ও পণ্ডিতগণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে, সে বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই।

হযরত ইমাম হাসান, হোসেন এবং অন্যান্য শহীদানের আত্মত্যাগের গুণ-বর্ণনা প্রসঙ্গে শোক গীতিকাই মর্সীয়ার রূপ গ্রহণ করে। এটি মুহররম মাসের প্রথম দশদিন মজলিস অনুষ্ঠানে পঠিত হয়। এবং তাজিয়াসহ শীয়াগণ মিছিলের সময় পথ দিয়ে চলবার কালে আবৃত্তি করে থাকে। বদায়ূন নিবাসী কবি নিযামী এর সংজ্ঞা নিরূপণ করতে বলেছেন 'কোন মৃত ব্যক্তির জীবনের গুণবর্ণনার ক্ষেত্রে ছন্দে রচিত বিলাপ অথবা দুঃখ প্রকাশকে মর্সীয়া বলা হয়। কিন্তু বর্তমানে কারবালার বিষাদময় ঘটনা কাব্যাকারে লিখিত হলে তাকে মসীয়া নামে অভিহিত করা হয়। পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ মনীষী হিউগস (HUSHES) এ কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বলেন মসীয়া কারো শবযাত্রা উপলক্ষে বিষাদগীতি ; বিশেষত মুহররম মাসে ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসেনের আত্মবিসর্জন উপলক্ষে কবিত্বময় ছন্দে যে শোকগাথা গীত হয, তাই-ই মর্সীয়া। এবং ইহাই বাংলা সাহিত্যে মর্সীয়া নামে পরিচিত।

বাংলা সমাজে মর্সীয়া

বাংলা দেশে ফার্সী উর্দু এবং বাংলা ভাষায় মর্সীয়া কাব্য ও কবিতা রচিত হয়েছে। মুঘল আমলে ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতিতে যে মুঘল প্রভাব নবীন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তার ছাপ বাংলার সমাজ এবং সাহিত্যেও পড়েছে। সম্রাট হুমায়ুনের সঙ্গে ইরানী সৈনিক, কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকগণের ভারতে প্রবেশ লাভ এবং ইরানের রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে বহু শিয়া মতাবলম্বী নর-নারীর বাঙলা দেশে আশ্রয়গ্রহণ, বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে বহু পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এই কারণে বাঙলা দেশে কবিগণ ফার্সী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় মর্সীয়া কাব্য রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

এতদ্ব্যতীত মুঘল সম্রাটগণ কর্তৃক বহু শিয়া আমির-ওমরাহ্ বাংলায় শাসক নির্বাচিত হওয়ায় বহু সাধারণ নরনারী শিয়াধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। একথা বললেও অত্যুক্তি করা হবে না যে, সকল যুগে সকল দেশেই রাজপ্রভাব অনিবার্য। সকল শ্রেণীর মানুষই এর দ্বারা কম-বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে। কোথাও রাজ-আজ্ঞা, কোথাও রাজ-পুরস্কার, কোথাও রাজদণ্ড মানুষ মাত্রকেই বিচলিত ও বিব্রত করে তোলে। ১৮৫৭ খ্রীঃ দিল্লির শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ নিজে ছিলেন শিয়া। তিনি কাব্য ও কবিতার যথেষ্ট গুণগ্রাহীও ছিলেন। সুতরাং ওই সময় মর্সীয়া সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। স্বয়ং সম্রাটের আকুতি ও অনুপ্রেরণায় বহু বড় বড় সাহিত্যিক ও কবির আবির্ভাব ঘটে। আরো কিছুদিন এইভাবে চলতে থাকলে, মর্সীয়া সাহিত্যের উন্নতির পরিকাঠামো কোথায় পৌছত, তা কে বলতে পারে! বিধাতা যেন বাদ সাধলেন।

হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির নেতাদের গভীর ষড়যন্ত্রে সম্রাট বাহাদুর শাহ্ ইংরেজের হাতে পরাজয় বরণ করলেন, বন্দী হলেন। রেঙ্গুনে নির্বাসনদণ্ড লাভ করলেন। দেশ স্বাধীনতা হারাল। দিল্লি সম্রাট হারাল। শিয়াগণ তাঁদের প্রাণপ্রিয় অভিভাবক হারাল। কিছুদিনের মধ্যেই শিয়া পণ্ডিত, কবি ও সাহিত্যিকগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু কলকাতা ও মুর্শিদাবাদে, গমন করেন। যার ফলে এ দুই স্থানে ফার্সী ও উর্দু ভাষায় মর্সীয়ার নিশানা ও মাতম ভাল হবেই লক্ষ্য করা যায়। তবে বর্তমানকালে মুহররমের মিছিল, মর্সীয়া, নিশানা ও মাতমের চেহারা দেখলে যে-কোন একজন নিরপেক্ষ মানুষ বলতে বাধ্য হবেন—'আহা! আনন্দের কি অপূর্ব মহড়া। অথচ কারবালা প্রান্তরের সকরুণ ঘটনা পৃথিবীর সমস্ত হৃদয়বিদারক ঘটনাকে ম্লান করে দেয়। (দ্রঃ—লেখকের উমাইয়া খেলাফত্ তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৪০)

১৮০০ খ্রীঃ ৪ মে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলীর শাসনকালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। এবং কলকাতা বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয়। এই সময় ইংরেজ শাসক ফার্সী ভাষা উঠিয়ে উর্দুকে প্রাধান্য দিলেন। ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বহু কবি-সাহিত্যিক কলকাতায় আগমন করেন। এবং মুহররম উপলক্ষে বহু মনোজ্ঞ কাব্যাদি রচনা করেন। এইভাবে কলকাতা মর্সীয়া সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র রূপে পরিগণিত হলো। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগণের মধ্যে মীর কাসিমের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। কলকাতা শহর বাংলার প্রাণকেন্দ্রের সম্মানলাভ করল। এবং এই কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলার সমাজজীবনেও মর্সীয়া তার হৃত গৌরব ও মর্যাদাকে ফিরে পেল। তবে অতীব দুঃখের বিষয়, মুহররমকে কেন্দ্র করে যত মর্সীয়াই রচিত হোক কোন কিছুই কারবালার ওই সকরুণ কাহিণীর হৃদয় বিদারক ঘটনার মর্মস্থলকে স্পর্শ করে রচিত হয়নি। আর যদিও বা কিছু কাগজে-কলমে রচিত হয়েছে। কিন্তু মুহররমের মিছিলে তার ছিটেফোঁটাও দেখতে পাওয়া যায় না। মুহররমের মিছিল দেখলে সাধারণত মনে হয় না কোন শোক মিছিল। মনে হয় কারো অভিষেক পর্ব উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু উর্দু কাব্য ও কবিতা কারবালার করুণ ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হয়। উর্দু ভাষাতে মর্সীয়া কাব্য রচনার রেওয়াজ বহুকাল যাবৎ চলছিল। ফার্সী ও উর্দু মর্সীয়া কাব্যের ধর্মীয় বোধ ও প্রেরণা হতেই বাঙলা দেশের বহু কবি ও সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় বহু মর্সীয়া কাব্য রচনা করেন। এখানেও রাজশক্তি যথেষ্ট পরিমাণেই কাজ করেছিল। মর্সীয়া কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবিগণ চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলের শিয়া সুবাদারদের প্রত্যক্ষ সহানুভূতি ও উৎসাহ লাভ করেছিলেন। এমনকি বাঙলা দেশের শিয়া শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ইমামবারাগুলোতেও মজলিস অনুষ্ঠানে জাকজমক সহকারে বহু কিছু প্রতিপালিত হত। এ কারণে কারবালা কাহিনী সারা বাঙলাদেশে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। কালক্রমে শিয়া শাসকগণের রদবদল হলেও সেখানকার মুসলিম জনসাধারণ বংশ পরম্পরায় কারবালার করুণ কাহিনীর প্রতি নাড়ির একটা যোগ অনুভব করতে থাকেন। কেননা মর্সীয়া বা কারবালা তখন তাদের রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এইভাবে ইমাম হোসেনের আত্মত্যাগের করুণ কাহিনী দেশের মানুষ ও মাটিকেও স্পর্শ করেছিল। এখানে শিয়া বা সুন্নীর কোন প্রশ্ন ছিল না। কেননা শিয়াগণ হযরত আলী ও বিবি ফাতেমাকে শ্রদ্ধা করেন ঠিকই, কিন্তু শেরে খোদা হযরত আলি ও নবী-নন্দিনী বিবি ফাতেমাকে অশ্রদ্ধা করে এমন মুসলমান সারা দুনিয়াতে একজনও আছে বলে আমার জানা নেই। তাঁরা দু'জনেই সারা মুসলিম জাহানের পরম শ্রদ্ধার পাত্র ও পাত্রী। এখানে শিয়া সুন্নীর কোন প্রশ্ন নেই।

কেন সুজলা সুফলা বাঙলা দেশে মর্সীয়া সাহিত্যের সবুজ শালবন দেখা দিল, এর পশ্চাতে কি শুধু একটি কারণই আছে, তা নয়। বহু কারণ আছে। তন্মধ্যে প্রধান দুটো। প্রথমটি রাজ-অনুপ্রেরণা। যা আমরা আলোচনা করলাম। দ্বিতীয়টি, বাংলার মানুষের মনেরও চাহিদা ছিল। কেবলমাত্র নিছক অনুপ্রেরণাতেও কাজ হয়। না। উভয় পক্ষ হতে প্রাণের সাড়াও থাকতে হয়। এই সাড়াও বাংলার মাটিতে জেগে উঠেছিল।

দীর্ঘদিন ধরে বাঙ্গালী মুসলমানগণ হিন্দু-পুরাণ পাঁচালী শুনে সাহিত্য-রস পিপাসা মিটিয়েছেন। কিন্তু পরে তাঁদের সমাজ-মানসে পরিবর্তন দেখা যায়। তাঁরা নিজেদের আপন ঐতিহ্য-নির্ভর কাব্য কাহিনী পাঠ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এবং এই প্রয়োজন বোধের তাগিদেই ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সংস্কৃতিমূলক সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। এবং এই সাহিত্যের অন্যতম শাখা হিসেবেই বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্যের প্রবর্তন ঘটে।

মুসলিম কবি ও লেখকগণ মুসলিম ঐতিহ্য-নির্ভর কাহিনী গ্রহণ করলেন ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতির ধারাকে অস্বীকার করতে পারলেন না। স্বীকার করাটাই স্বাভাবিক ছিল। এ সত্য বা এ রহস্য আমরা স্থাপত্য শিল্পেও দেখতে পাই। মুসলমানগণ যখন নানা দেশ-বিদেশ জয় করলেন তাঁরা তখন তাঁদের বিশাল বিশাল ইমারত বা দুর্গগুলোকে রোমান বা পারস্য ধাঁচেই তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীকালে আপন নিজস্ব ঐতিহ্যে দাঁড়িয়ে গেছেন। এবং সৃষ্টি করলেন সারা বিশ্ববুকে এমন দুটো ইমারত, যা আজও বিশ্ব-দরবারে ও বিশ্ব-স্থাপত্য শিল্পে অচিন্ত্যনীয় অকল্পনীয়ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ভারতের 'তাজমহল' ও স্পেনের 'আলহামরা'। অনুরূপভাবেই বাংলার কবি ও সাহিত্যিকগণ প্রথম দিকে তাঁদের কাব্য বা সাহিত্য কাঠামোর তেমন কিছু পরিবর্তন করেনি। তাঁরা পুরাণ-পাঁচালীর ধাঁচেই তাঁদের সাহিত্য সম্ভার গড়ে তুলেছিলেন। ওটা ছিল সাময়িক ব্যাপার। এটা ভারতের মাটিতেও সত্য। যখন মুসলিম কবি ও লেখকগণ একাদশ ও দ্বাদশ খ্রীস্টাব্দে ভারতের মাটিতে বা ভারতীয় সাহিত্যে সর্বপ্রথম রোমান্সের দুর্গ তৈরি করলেন, যখন পারস্য-উপন্যাস, আরব্য-উপন্যাস, আলফ্ লায়লা ও লায়লা মজনুর মত জগদ্বিখ্যাত উপন্যাসগুলো ভারতীয় সাহিত্যে পদার্পণ করল, তখন ভারতীয় লেখকদের জন্য প্রথম প্রথম তাদের নিছক অনুসরণ করা ব্যতীত পরিকাঠামোর কথা চিন্তা করা সম্ভব ছিল না। এটাই

মানবসমাজের স্বাভাবিক ধারা। শিশু প্রথম মাকে ধরেই চলতে শিখে। পরবর্তীকালে বহু সার্থক মায়ের জন্মও দিয়ে থাকে।

মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের রচিত ধারার মধ্যে দুটি ধারা আমরা লক্ষ্য করি। প্রথম ধারা বলতে সপ্তদশ, অষ্টদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে হরিবংশ প্রভৃতির অনুসরণে 'নবীবংশ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' 'পাণ্ডব বিজয়' প্রভৃতির অনুসরণে 'রসুলবিজয়', 'মহম্মদ বিজয়', 'কাসাসুল আম্বিয়া' প্রভৃতি পয়গম্বরদের উপর কাহিনীমূলক কাব্যাদি প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয় ধারাটিতে পাই হযরত মহম্মদ (দঃ) পরবর্তী খলিফাগণের বিজয় অভিযান ও ইমাম হোসেনের কারবালার করুণ কাহিনীকে ভিত্তি করে সাহিত্য সৃষ্টি।

এতদ্ব্যতীত আধুনিককালের পাশ্চাত্য আদর্শ ও শিক্ষাবাহী বহু সাহিত্যিক ও কবিগণ বহু কবিতা ও কাব্যাদি রচনা করে বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন—আবুল মা আলি, হামেদ আলি, মতীয়ুর রহমান খান, কায়কোবাদ, আব্দুল বারি আব্দুল মোনায়েম, সৈয়দ ইসমাইল সিরাজী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও কবি গোলাম মোস্তাফা মহররম ও কারবালার উপর অনেক কবিতা ও ইসলামি গজল গানের সৃষ্টি করে গেছেন। ইংরেজ আমলের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক মীর মুশাররফ হোসেনও বাংলা গদ্যে 'বিষাদসিন্ধু' রচনা করে সর্বজন খ্যাতি অর্জন করেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে, কেবলমাত্র কাব্য ও কবিতা রচনার ক্ষেত্রেই কারবালার বিষাদময় ঘটনা ও কাহিনী সীমাবদ্ধ নয়। পল্লীসাহিত্যেও মর্সীয়া রচিত হয়েছে। এবং তা বহুকাল যাবৎ এদেশের পল্লী অঞ্চল সমূহে গীত হয়ে আসছে। বাঙলা দেশের বহু লোক কবি কারবালার ওপর অসংখ্য পল্লীসঙ্গীত রচনা করেছেন। এবং তা বাঙলার আপামব জনসাধারণ দ্বারা সাদরে গৃহীতও হয়েছে। এই পল্লীসঙ্গীতগুলোর নাম 'জারীগান'। এই 'জারীগান' মর্সীয়া সাহিত্যভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। এছাড়াও আছে মর্সীয়া বাংলা গজল। এদের তাল ও সুর সম্পূর্ণ পৃথক। এককথায় জারীগান, গজল গান, মর্সীয়া গজল ইত্যাদি নানা সাহিত্য শাখা প্রভৃতি মুহররমকে কেন্দ্র করে একদিন বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে একটি বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার গড়ে তোলেছিল।

বিষাদ সিন্ধু

'বিষাদ সিন্ধু' সম্পর্কে যে কথাটি নিঃসন্দেহে বলা যায়, মীব মশাররফ হোসেন তাঁর সাহিত্যিক জীবনে পঁচিশের অধিক সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করলেও, একমাত্র বিষাদ সিন্ধুই তাঁকে কালজয়ী অমরত্বের গৌরব দান করেছে। বিষাদ সিন্ধুর জলদমন্ত্র ভাষাশৈলী পরবর্তী কালের মহম্মদ ববকতুল্লাহ লিখিত পারস্য প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিষাদ সিন্ধুকে সে যুগের বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন এটা একটি ধর্মীয় গ্রন্থ। তাই গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ মুসলমান নরনারী গ্রন্থটিকে ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করার পর জনপ্রিয়তা সেদিন তুঙ্গে উঠেছিল। সেদিনের গ্রামবাংলায় এমন কোন মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম ছিল না, যে গ্রামের বৈঠকখানায় সান্ধ্য প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে অগণিত মানুষ বিভোর চিত্তে বিষাদসিন্ধু শ্রবণ করত না। গ্রন্থের এই জনপ্রিয়তা গ্রন্থকারকে চরমভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল।

কেউ কেউ বলেন এটা ঐতিহাসিক গ্রন্থ, এটি ইসলামের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে বিরচিত। কিন্তু আমাদের মতে বা সত্যের নিরিখে বিষাদ সিন্ধু যেমন ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, তেমনি ঐতিহাসিক গ্রন্থও নয়। এটা ধর্মীয় গ্রন্থ নয় এই কারণে যে, ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থ পবিত্র কোরআন ও হাদিসের সঙ্গে এর কোনরূপই যোগ নেই। সুতরাং এটাকে ধর্মীয় গ্রন্থ বলা যাবে না। আবার একে ঐতিহাসিক গ্রন্থও বলা যাবে না। যদিও মূল ঘটনাটি ঐতিহাসিক, যদিও ইয়াজীদ ও হযরত হোসেন (রাঃ)-এর কারবালা প্রান্তরের অতীব মর্মান্তিক যুদ্ধ বনাম নরহত্যার কাহিনীটি ঐতিহাসিক, যদিও ইমাম হোসেনের আদর্শ

মহত্ত্ব বীরত্ব ত্যাগ ও নীতির জয়গান চরমভাবেই ঐতিহাসিক ঘটনা, যদিও ইয়াজীদের দুর্ব্যবহার, নিষ্ঠুরতা ও নৃসংশতা বিশ্ব-মানব ইতিহাসের বিরল কলঙ্ক, তবুও আমরা কোনভাবেই ইতিহাসের বিচারে বিষাদসিন্ধুকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলতে পারি না। কেননা, মীর সাহেব তাঁর গ্রন্থে মানব কল্পনার সীমা ও দেব অলৌকিকতার আসমানকেও অতিক্রম করেছেন। এই গ্রন্থে যুক্তিতর্ক, বিবেক-বিবেচনা, তত্ত্ব ও তথ্যের কোন বালাই নেই। সুতরাং কোন দিক থেকেই বিষাদ সিন্ধু ঐতিহাসিক গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করতে পারে না।

আমাদের মতে বিষাদ সিন্ধু উপন্যাস, তবে ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। কিছু ঐতিহাসিক উপাদানের সঙ্গে মিশেছে মীর সাহেবের সাহিত্য চেতনাবোধ, ঔপন্যাসিক শিল্প চেতনা। এর ওপর প্রতিটি পর্ব ও প্রবাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছে অসাধারণ রোমান্স, আকর্ষণণীয় অলৌকিকতা। আবার কোথাও কোথাও ঘটনাবহুল অতি নাটকীয়তা। যার ফলে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে এক সুমহান সাহিত্যসৃষ্টি ও আনন্দভরা উপন্যাস। কোন দুর্বলতা কোন জটিলতা মীর সাহেবের শিল্পী মন ও শিল্প চেতনাকে, সবার উর্ধ্বে তাঁর সৃষ্টি বোধকে গ্রন্থ মাঝে কোথাও মেঘাচ্ছন্ন করতে পারেনি। মীর সাহেবের সৃষ্টি কৌশল এখানেই চরম সার্থকতা ও সীমাহীন সফলতা লাভ করেছিল। লেখক হিসেবে এখানেই তাঁর বড় কৃতিত্ব। মীর সাহেবের পূর্বে কোন মুসলিম লেখকই পদ্য-বিবর্জিত এমন সুন্দর গদ্যকাহিনী-উপন্যাস রচনা করতে সক্ষম হননি। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে মীর সাহেবের বিষাদসিন্ধু বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের Land Mark বা দিকচিহ্ন স্বরূপ। বিষাদ সিন্ধুর অনুকরণেই অনেক মুসলিম লেখকের সৃষ্টি ও সাহিত্যধারা পটও পথপরিবর্তন করে নতুন দিকে ও নতুন খাতে নবীনের জন্ম দিল। তাই মুশাররফ হোসেন মুসলিম বাংলা সাহিত্যের যুগস্রষ্টা ও পথিকৃৎ।

বিষাদ সিন্ধুর উৎপত্তি ও উপাদান :

বিষাদ সিন্ধুর উৎপত্তি ও উপাদান কোন মূল আরবী বা ফার্সী গ্রন্থ থেকে নয়। তা হলে বিষাদ সিন্ধু এতখানি কল্পনা-নির্ভর হতে পারত না। কেননা মীর সাহেব তাঁর 'আমার জীবনী'-তে নিজেই স্বীকার করেছেন, আরবী ফার্সী সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানই বিষাদ সিন্ধু রচনাকালে তাঁর জন্য অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয়েছে। তিনি আরবী-ফার্সী ভাষাতে বা পবিত্র কোরআন হাদিসে অভিজ্ঞ বা পারদর্শী ব্যক্তি হলে বিষাদ সিন্ধু রচনাকালে এত সহজে এতখানি কল্পনা নির্ভর হতে পারতেন না। তখন বিবেকের দংশনে তাড়িত হতেন বিষয়বস্তুর তত্ত্বের ও তথ্যের দিক থেকে, যুক্তি ও তর্কের দিক থেকে। তিনি 'মকতুল হোসেন', 'শাহাদতে হোসানায়েন' ও 'শাহাদাতেন' গ্রন্থগুলো আরবী ভাষা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য আলোচনা করার কোন সুযোগ পাননি। আসল কথা—এই সম্পর্কে বাংলা ভাষায় যে সকল পুঁথি রচিত হয়েছিল, সেগুলো হতেই মীর সাহেব তাঁর গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করে ছিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে মিশিয়েছিলেন আপন প্রতিভাজাত কল্পনাশক্তি ও দুর্দান্ত ভাষা ভাণ্ডারকে।

বিষাদ সিন্ধুর ভাষা :

বিষাদ সিন্ধুর পটভূমি নির্বাচনে মীরের শিল্পীমন যথেষ্ট মহত্ত্বের ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত ও মেঘনাদবধ প্রভৃতি কাব্য ব্যতীত এরূপ পটভূমিকা প্রায় লক্ষ্য করা যায় না। বিষাদ সিন্ধুর সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব তার ভাষা সম্পদ। একটি মহৎ বিষয় যেন একটি মহৎ ভাষার বিবৃত হয়েছে। কল্পনা ও ভাষা এবং ভাষা ও ঘটনা-বিন্যাস এক অপরের পরিপূরক হয়ে যেন সাগর-গামিনী স্রোতস্বিনী জলধারার মতো মহাসাগরের দিকে এগিয়ে চলেছে বেগবান গতিতে। তাই সেদিন কোন পাঠক-পাঠিকার পক্ষে সম্ভব হয়নি—এই বেগবান গতি ও উচ্ছ্বাস আকর্ষণকে এড়িয়ে যাওয়া। বিষাদ সিন্ধুর মধ্যে আমরা ভাষা ও কল্পনার আশ্চর্য মহামিলন লক্ষ্য করি, যেখানে কোন কষ্ট কল্পনা নাই। তাই কোন জড়তাও নাই। সুতরাং বিষাদ সিন্ধু ঝরনা ধারার একটি স্বত উৎসারিত নদী।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার পুঁথি-সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে প্রণয়গাথা

আমার শ্রদ্ধেয় স্বর্গত মাস্টারমশাই আচার্য সুকুমার সেন বলেন—'রসের বৈচিত্র্য ও রসিকের ভিন্ন রুচিত্ব মেনে নিয়ে সহৃদয় যাঁরা অখণ্ড ইতিহাসের বৃহৎ ভূমিতে বাঙ্গালীর মন চিনতে ও জানতে চান তাঁদের কাছে হয়তো আমার এই বিগত দিনের নামহারা ফুলে মালা গাঁথার বার্তা ব্যর্থ হবে না।'

অধুনা বাংলা সাহিত্যের আসরে রোমান্টিক প্রণয়গাথা একটা বিশিষ্ট অধ্যায় জুড়ে আছে। বাংলা সাহিত্যে এ অধ্যায়টি পূর্বেও ছিল। কিন্তু এমনটি ছিল না। তখন সেটি ছিল নিছক দেব ও দেবীদের বস্তু। কল্পনার অতীত জগতের ইতিহাস। তাকে নামিয়ে নিয়ে এলো মানুষের এই মাটির ঘরে। এই নামানোর গৌরব ইসলামি বাংলা সাহিত্যের।

এই প্রসঙ্গে গবেষণাচার্য ডক্টর সুকুমার সেন বলেন—"এই ধারার জের টেনে এনেছিলেন মুসলমান কবিরা। হিন্দু কবিরা প্রধানত দেবমাহাত্ম্যকাহিনী নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন। বিশুদ্ধ প্রণয় কাহিনীর দিকে তাঁদেব তেমন কোন নজর ছিল না। হিন্দু কবিদের কাছে লৌকিক-সাহিত্য ধর্ম-সাহিত্যেরই অঙ্গ ছিল। কিন্তু মুসলমান কবিদের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের কোন আবশ্যিক যোগাযোগ ধরা পড়েনি। সুতরাং দেবমাহাত্ম্য নিবপেক্ষ বিশুদ্ধ কাহিনী রচনায তাঁরা (মুসলমানগণ) নিরঙ্কুশ ছিলেন। এই জন্যই হিন্দি ও বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক কাহিনী রচনায় মুসলমান কবিরাই অগ্রণী ও একাধিপতি।"

মানুষ কখনও ধর্মের আশ্রয়ে, কখনও বা তার আওতায় দাঁড়িয়ে যে-কোন কথা বলতে বা যে -কোন কাজ করতে চিরদিনই নিজেকে খুবই নিরাপদ মনে করে থাকে। যে কথা বলতে মানুষের শত বাধা, শত ভয়, যে কাজ করতে মানুষের শত বিপদের আশঙ্কা, সেখানে ধর্মের সামান্যতম ইঙ্গিত বা অনুমোদন পেলে সে যেন বাধা-বন্ধনহীন মুক্ত পথিক। মানবসমাজে বিবাহ নামক বন্ধনটি ধর্মের অনুমোদন, অনুমতি এবং প্রলেপ বা licence ব্যতীত আর তো কিছুই নয়। ধর্মের এই অনুমতিটুকু পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোটি কোটি যুবক-যুবতী তাদের দাম্পত্য জীবনের তরীটিকে প্রেমের দরিয়াতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। ধর্মের একদিকে আছে মনের বিশ্বাস এবং অন্যদিকে আছে সমাজে শাস্ত্রবিহিত শৃঙ্খলাবিধান। সেখানে নেই কোন যুক্তি, নেই কোন তর্ক। আছে শুধু ধর্ম। এবং যেখানেই আছে ধর্ম, সেখানে অন্য কারও স্থান নেই। স্থান কেবলমাত্র বিশ্বাসের। তিনি তত বড়ই ধার্মিক, যিনি যত বড় বিশ্বাসী। ধর্মে যুক্তি, চলে না। একদিন এক ব্যক্তি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ঈশ্বর সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে থাকায় ঠাকুর তাকে বললেন—'খাবি তো এক ঘটি জল, সাগর মেপে কাজ কি?' বিশ্বাসে মিলায় আল্লাহ্, তর্কে বহুদূর। মানুষের অতীব সীমিত জ্ঞান দ্বারা অসীম আল্লাহ্‌কে পরিমাপ করা যায় না। কোরআন : ১৮ : ১৯, ৩১ : ২৭

হিন্দু কবিরা যখনই কোন প্রণয়কাহিনীর সূত্রপাত করেছেন, তখনই সেখানে দেখা দিয়েছে নানা দেবদেবীর আবির্ভাব। কারণ সেখানে মানুষের কিছু বলার থাকবে না। অথচ অবলীলাক্রমে প্রেমের তরীতে পাল তোলা যাবে। যাত্রী হবে কেবলমাত্র দেব ও দেবীগণ। এইভাবেই হিন্দু কবিগণ প্রথমত দেবতাদের প্রেমভাণ্ডার মানুষের হাতে তুলে দেন।

মুসলমান কবিরা যে হিন্দু-কবিদের ধারা একেবারেই অনুসরণ করেননি, একথা বললে একেবারেই অবিমিশ্রিত সত্য বলা হবে না। তাঁরাও ওই পথ ওই নীতি প্রথমত পরোক্ষভাবে অনুসরণ করেছেন।

তা না করে পারেন না। না করাটাই অসঙ্গত। বাস্তব-বিরোধী। হিন্দু কবিগণ সমাজ নিয়ে বাস করেন। এবং মুসলমান কবিগণ কি সমাজজীবনের বাইরে? তা নয়। তাঁরাও সমাজের বিধিনিষেধ ও শাসন-অনুশাসন মানতে বাধ্য। কারণ যেখানেই সমাজ, সেখানেই ধর্ম। ওই যুগের মুসলিম সমাজের স্বনামধন্য কবি শাহ মহম্মদ সগীর যখন প্রথম ইউসুফ জোলেখার প্রণয়কাহিনী লিখতে শুরু করেন, তখন তাঁকেও মুসলিম সমাজের কাছে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পূর্বেই কৈফিয়তের জবাব রূপে বলে নিতে হয়েছিল যে, এটা পবিত্র কোরআনে আছে। ১২ : ২২-৫২। কেননা কবি মনে করেছিলেন—তাঁর আপন সমাজ হতে কিছু অঘটন ঘটে যেতে পারে। কবির আশঙ্কা নেহাত অমূলক ছিল না। কিন্তু ওই কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জাহানের যাঁরা অতিরিক্ত রক্ষণশীল, তাঁদের ফণা নত হয়ে গেল।

সেদিনের মুসলিম সমাজের রক্ষণশীল ধারা আজিও সক্রিয়। বর্তমান লেখক (ড° ওসমান গনী) ১৯৯৭ খ্রীস্টাব্দে কোরআনের নৈতিকতা নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থে মানব জাতির আদি পিতা আদম ও আদি মাতা মা হাওয়ার প্রেম প্রীতি ও পরিণয় জীবন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। আলোচনাটাও ছিল একেবারেই কোরআনভিত্তিক। তবুও কিছু রক্ষণশীল গোঁড়া মুসলমান রাত্রি একটা হতে দুটোর মধ্যে লেখককে ফোন যোগে জানিয়ে দেন—'আমরা তোমার প্রাণদণ্ড ঘোষণা করলাম। এই প্রসঙ্গে তাঁরা বহু বর্বরোচিত ভাষার প্রয়োগও করেন। তখন লেখক তাঁদের বিনীতভাবে জানিয়ে দেন যে, 'আপনাদের কথাটিকে সত্য বলে মেনে নিলে কোবআনকেই মিথ্যা বলতে হয়। আপনারা বলুন আমি কোনটি করব।' অতঃপর ওই গোঁড়া অন্ধ রক্ষণশীল মানুষগুলো নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন। কোরআনের নৈতিকতা পৃঃ ৭৪-৭৫, এবং কোরআন ২ : ৩৫, ১১৫, ১২১, ৭ : ১৯-২৭।

এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করার মতো। সে-যুগের হিন্দু কবিগণ, দেব দেবী ব্যতীত প্রেম খুঁজে পেতেন না। এবং এ যুগের কিছু গোঁড়াপন্থী মুসলমান সাধারণ মানুষ ব্যতীত অসাধারণের মধ্যে জীবনের সাবলীল ও স্বাভাবিকধারা প্রেম ও পরিণয় খুঁজে পান না। এরই নাম হয়তো ধর্মান্ধতা বা জ্ঞানান্ধতা ইত্যাদি। গ্রামের এক মৌলবী সাহেবের একটি বাচ্চা হলে কয়েক জন নিম্নবর্ণের মেয়ে বলল যে, 'সে কি মৌলবী সাহেবও ওই সব করেন।' এই ছিল সে যুগের ছবি।

স্বনামধন্য কবি মহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' রচনা করার পর মুসলিম কবিরা সাধারণ মানুষের প্রেমকে নিয়ে, সাধারণ মানুষকে নিয়ে প্রেমের কাছে চিত্তাকর্ষক আখ্যান-ব্যাখ্যান রচনা করলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করার বিষয় যে, কোন দেব-দেবী নেই। অতীন্দ্রিয়ের কোন ছাপ নেই। তবে এটাও লক্ষণীয় বিষয় যে, ধর্মের সীমারেখা কোথাও পার হননি। কেননা কোরআন সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভীষণ ঘৃণার চোখে দেখেছে। কোরআন— ২ : ১৯০, ৩ : ১৯২, ৫ : ৮৭, ৭ : ৫৫, ১১ : ৪৪। অবিবাহিত নরনারীর দৈহিক মিলনকে সর্বত্র ঘৃণা করা হয়েছে। ব্যাভিচারকে কোথাও প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। কেননা কোরআনের চোখে ব্যাভিচার অত্যন্ত ঘৃণিত বস্তু। কোরআন ৪ : ১৫, ১৯, ১৭ : ৩২, ২৩ : ৫, ২৪ : ২, ৩৩ : ৩০। যে কোন লেখার মধ্যে তাঁরা হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর আদর্শকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন। যেখানে অগণিত সাধারণ মানুষের বলার কিছু ছিল না। তাই তাঁদের রচিত প্রেমকাহিনীগুলোও ধর্মের অনুমোদন নিয়েই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও উত্থাপিত হয়েছিল।

স্বর্গের প্রেম মর্ত্যের মানুষের ঘরে ঘরে নেমে এল। নর-নারী, যুবক-যুবতীর প্রাণের গোপন প্রেম এতদিন কোরকে কুঁড়ি রূপে গোপন ছিল। আজ তা ফুল রূপে প্রকাশ পেল। বাংলা সাহিত্যের এই যে নবযুগ, তা ফুলে ও ফলে ভরে উঠল। বাংলা সাহিত্যের এই নবযুগের পশ্চাতে ছিল আরব ও পারস্যের অমর কবিগণের অসাধারণ অবদান। ওই অবদানই ইসলামি বাংলা সাহিত্য নামে বাঙ্গালীর বাংলা সাহিত্যকে করল সুজল-সুফলা ও শস্য-শ্যামলা। সুতরাং ইসলামি বাংলা সাহিত্যের প্রণয়-

গাথাগুলো অধুনা বাংলা সাহিত্যে তৈরি করল একটি রাজপথ, যেখানে একটি অখ্যাত গলি-পথও ছিল না। খুলে দিল একটি সিংহদ্বার, যেখানে একটি খিড়কিদ্বারও ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানের এক লেখক ইসলামি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রণয়কাহিনীগুলির একটি ফিরিস্তি দিয়েছেন।

খারাব করিল কত আশকের তরে
জোলেখা খারাপ হইল ইউসুফ উপরে।
লায়লি উপরে মজনু হৈল আশক
সংসার-বিখ্যাত যার আশকি সাদক।
শিরি ও খোস্‌রু ফরহাদ তিনজনে
আশক হইয়া মরে প্রেমের কারণে।
দামন উপরে নল আশক হইল
মধুমালতীর পরে মনোহর মজিল।
বদরে-মনির উপরেতে বেনজির
হাসেন বানুর পরে আশক মনির।
হাতেম তাহার লাগি ফেরে বারসাল
কত মুশকিলেতে আনে সে সাত সওাল।
গোলে-বকাওলি পরে তা জল-মুলুক
আশক হইয়া কত ফিরিল মুলুক।
কামকলা লাগি হৈল কুণ্ডার বেহাল
সয়ফুল-মুলুক পরে বদিউজ্জায়াল।
মেহের-নেগার পরে আশক আমীর
লড়াই করিল হন্দ এশকের খাতির।

আজ আমরা ভুলে গিয়েছি যে আমাদের প্রপিতামহেরা এই সব আশক-খারাবির গল্পেই মশগুল হতেন।*

ইউসুফ জোলেখা

ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের মূল উৎস কোরআন ও হাদিস, এবং বাইবেল।[১]

ইউসুফ জোলেখার পারসি কবিগণ :[২]

১। মহাকবি ফেরদৌসী

২। মহাকবি নূরউদ্দিন আব্দুর রহমান জামী

৩। সেখ আবদুল্লাহ আনসারী

বাঙালী কবি :

১। শাহ মহম্মদ সগীর

২। আব্দুল হাকিম

* ইসলামি বাংলা সাহিত্য : আচার্য সুকুমার সেন

১। কোরআন—সূরা ইউসুফ, ১২।

২। *Literary History of Persian* : E. G. Brown.

৩। ফকির মহম্মদ
৪। গরীবুল্লাহ
৫। হরিমোহন কর্মকার
৬। আব্দুল লতিফ
৭। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র।

কোরআন অনুসরণেই লিখিত মহাকবি ফেরদৌসীর ইউসুফ জোলেখা। এবং কোরআন ও ফেরদৌসীর অনুসরণেই শাহ মহম্মদ সগীর কর্তৃক বাংলা সাহিত্যে ইউসুফ জোলেখা কাব্যের প্রথম আবির্ভাব।[১] কবি গরীবুল্লাহ মহাকবি জামীকে অনুসরণ করেছেন।[২] আব্দুল হাকিমও তাই। ফকির মহম্মদ ও গরীবুল্লার কাব্যে কোন পার্থক্য নেই। হিন্দু কবিগণের বিষয়বস্তু এক হলেও নেহাত নকল নয়। আপন আপন ধাঁচে লেখা।

পবিত্র কোরআনে ইউসুফ জোলেখার কাহিনীকে 'আহসানুল্ কাসাস্' অর্থাৎ অতীব সুন্দর কাহিনী নাম দেওয়া হয়েছে। ১২ : ৩। আরব দেশে কেনান শহরে হযরত ইউসুফের পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) বসবাস করতেন। ইয়াকুব বাদশার দ্বিতীয় স্ত্রী রাহিলার কোন সন্তানাদি না থাকায় তিনি দিনরাত দুঃখ প্রকাশ করতেন। ইয়াকুব বাদশার অন্য স্ত্রীর ছিল দশটি সন্তান। সপত্নীর সন্তান সংখ্যা দেখে স্ত্রী রাহিলা অধীর হয়ে পড়তেন।

ইউসূফের মাতা রাহিলার স্বপ্ন :

একদা রাহিলা বিবি স্বপ্ন দেখলেন—'আছমানের চাঁদ যেন সন্ধ্যাইল পেটে।' বিবি রহিলার অধীর আবেদন খোদার দ্বারে গৃহীত হলো। তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা স্বামীকে জানালেন। স্বামী অন্য কাউকে বলতে নিষেধ করলেন। যথাসময়ে বিবি রাহিলা এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। পুত্রের নাম রাখা হলো ইউসুফ।

ইউসুফের রূপ সম্পর্কে :

ইউসুফের রূপ সম্পর্কে কবি বলেন—

'ছয় ভাগ রূপ আল্লাহ আলমে ভেজিল
তার বিচে চারি ভাগ ইউসুফেরে দিল।
দুই ভাগ রাখে সারা আলমের তরে'

ইউসুফের স্বপ্ন :

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে হযরত ইউসুফ একদা স্বপ্ন দেখলেন :

'আফতাব মাহতাব তারা মাথায় ছাতিতে
দশ তারা খাড়া ছিল পায়ের নীচেতে।
ইয়াকুব কহেন আর না কহিও কারে
ইলাহি করিবে বাদশাহ দুনিয়া উপরে।

১। মুসলিম বাংলা সাহিত্য ঃ ড° এনামেল হক, পৃ. ৫৬
২। ইসলামি, বাংলা সাহিত্য ঃ ড° সুকুমার সেন, পৃ. ১০৭।

একথা ইউসুফের অন্যান্য ভাইদের কানে পড়ল। তারা হিসেবমতো ইউসুফকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল; তারা বনে মেষ চরাতে যাওয়ার কালে ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। পিতা তাদের সানুনয় অনুরোধ রক্ষা করলেন। বনের কাছে গিয়ে ইউসুফকে এত প্রহার করল যে—

ইউসুফ বেহুঁস হয়ে জমিনেতে পড়ে
কেহ বলে জান নাই ইউসুফের ধড়ে।
ওলটি-পালটি কেহ ইউসুফেরে দেখে
কেহবা তাহিকক করে হাত দিয়ে নাকে।

ইউসুফকে কুয়াতে নিক্ষেপ :

ইউসুফকে মৃত্যু ভেবে কুয়াতে নিক্ষেপ করে তারা বাড়ি ফিরল। পিতাকে বলল—ইউসুফকে বাঘে খেয়েছে। পিতা শোনামাত্র বেহুঁশ হয়ে যান। এবং জ্ঞান ফিরে পেয়ে সেই বাঘকে দেখতে চান। তখন দশ ভাই এক বুড়ো বাঘকে ধরে নিয়ে গেল এবং বাঘ জবানবন্দী দিল :

বাঘ কহে শুনহে ইয়াকুব পয়গম্বর
কি লাগি বদনাম কর আমার উপর।

কুয়া থেকে ইউসুফের উদ্ধার :

মালেক নামে এক সওদাগর ওই জঙ্গলে যাচ্ছিলেন। তিনি ঐ কুয়াতে জল তোলার জন্য লুটা নামালেন। ফেরেস্তা জীব্‌রাইল ইউসুফকে বললেন—ওই দড়ি ধরে উপরে উঠতে। ইউসুফ তাই করলেন। তখনো ওই দশ ভাই সেখানে ছিল। তারা দেখে ছুটে এলো। সওদাগরকে ধাওয়া করলো সওদাগর বললেন—এ আমার ভৃত্য। ওরা বলল—আমাদের ভৃত্য। আপনি কিনে নিন। সওদাগর তাই করলেন।

জোলেখার প্রথম স্বপ্ন :

পশ্চিম দেশের বাদশা তৈমুছের জোলেখা নামে এক চরম রূপবতী ও গুণবতী কন্যা ছিল। একদিন জোলেখা ইউসুফকে স্বপ্নে দেখে এবং তাকে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়। এই ভাবে জোলেখা ইউসুফকে তিনবার স্বপ্নে দেখে এবং নিজ অবস্থা বর্ণনা করে। ইউসুফ স্বপ্নে জোলেখাকে আপন ঠিকানা বলেন।

আজিজ মেছেরের সঙ্গে জোলেখার বিবাহ :

তখন মিশর দেশের বাদশা রাইহান। এবং তাঁর উজির আজিজ। জোলেখার সম্মতি ব্যতীতই আজিজ মিশরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। দুর্ভাগ্যবশত আজিজ মিশর তাঁর পুরুষত্ব হারালেন। পুরুষত্ব যে একেবারেই হারালেন, তা নয়। বরং যখনই তিনি জোলেখার সংস্পর্শে বা তাঁর বিছানায় আসতেন, তখনই হারাতেন। এমতাবস্থায় জোলেখা স্বামীকে বললেন তাঁর জন্য পৃথক একটি বালাখানা তৈরি করে দিতে। তিনি তাই করে দিলেন। জোলেখা সেখানে বসবাস আরম্ভ করলেন। কিন্তু স্বামীকে ত্যাগ করে বাপের বাড়ি গেলেন না। যুবতীরা সাধারণত স্বামী নপুংসক হলে তাঁকে ত্যাগ করেই থাকেন। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা।

হযরত ইউসুফ মিশরে আনীত :

সওদাগর মালেক বহু লোকজন নিয়ে ইউসুফকে বিক্রি করার জন্য মিশরের বাজারে হাজির হলেন। সারা শহরে শহরত করে দেওয়া হলো এক অচিন্ত্যনীয় সুন্দর যুবক বিক্রি হবে। একথা বিবি জোলেখারও কানে গেল। জোলেখা তাঁর স্বামী আজিজ মিশরকে বললেন—ওই গোলামটিকে কেনার জন্য। আজিজ মিশর ইউসুফকে খরিদ করে স্ত্রী জোলেখাকে উপহার দিলেন। সে যুগে দাস-

দাসী উপহার দেওয়া প্রচলন ছিল। এমনকি মহানবীজীর যুগেও ছিল। মিশররাজের পক্ষ থেকে তিনি বিধবা খ্রীস্টান মহিলা মেরীকে (মরিয়ম) দাসী রূপে উপহার পেয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে স্বাধীন করে দেন। এবং বিবি মরিয়ম মহানবীজীকে স্বামী রূপে বরণ করেন। বিবি জোলেখা গোলাম ইউসুফকে সানন্দে নিজ কাছে রাখলেন।

বিবি জোলেখা গোলাম ইউসুফের কাছে আপন মতলব বর্ণনা করে। কেননা জোলেখা আজ তার স্বপ্নের মানুষটিকে পেয়ে গেছে।

এই মোর প্রাণধন এই মোর পতি
ইউসুফ আমার প্রাণ অভাগীর গতি।
জোলেখা আপন বেশ আপনি করিয়া
ইউসুফ হুজুরে রহে সতত বসিয়া।

* * *

মোর পানে চেয়ে কথা কহনা আপনি
জ্বলন্ত আগুনে মোর ঢেলে দাও পানি।

* * *

শুনহে জোলেখা বিবি এ বড় তকদির
গোলাম হইয়া মিলে সাহেবিনীর সাথ
আওল আখেরে সে গোলাম কমজাত।
যদি তোমার শোনে সেই আজিজ খছম
মারিবেক মোর তরে হইনে শরম।

জোলেখা বিবির বিচিত্র হপ্তখানা :

ফিকিবে বানায় বুড়ি হপ্তমবাসব
সারি সাবি সাতখানি বানাইল ঘর।
সাতটি দুয়ার করে ঘরের ভিতর
নেভাতে মনের আগুন জুড়াতে অন্তর।
ফিকিবে বানায় বুড়ি হপ্তমবাসর॥
প্রথম ঘরেতে চিত্র করিল অঙ্কন
সে চিত্র হেরিলে হয় মন উচাটন।
দ্বিতীয় খানায় চিত্র করিয়া তাকায়
জোলেখা ইউসুফ দোন আনন্দে খেলায়।
ইউসুফ ভজিতে চাহে জোলেখা পালায
ইউসুফ ধরিয়া হাত তাহাকে বসায়।
তৃতীয় বাসর চিত্র সেরে ভুলে মন
ইউসুফ জোলেখা স্তন করিছে চুম্বন।
ইউসুফ জোলেখা দোন করে ঠেলাঠেলি
ইউসুফ টানিয়া ছেঁড়ে জোলেখা কাচলি।
উভয়েতে টানাটানি করে পরস্পর
ফিকিরে বানায় বুড়ি হপ্তমবাসর।
চাহারাম খানায় চিত্র করিল এমন
সে চিত্র হেরিলে ভুলে মহামুনির মন।

পঞ্চম খানার চিত্র শোন মন দিয়ে
জোলেখার সাজ করে ইউসুফ বসিয়া।
ষষ্ঠ খানার চিত্রে ভুলে মনি জন
নানা ভাবে চিত্র তাহে করিল অঙ্কন।
জোলেখায় নিয়ে ইউসুফ কোলে বসাইয়া
শত শত চুম্বন দেয় মুখে মুখ দিয়া।
হপ্তম খানার কথা শুন সব লোক
ইউসুফ জোলেখা 'পরে হইয়া আশক
আশক মাশুক দোন থাকিত বসিয়া
ইউসুফ আরামে রহে জোলেখা লইয়া।

হপ্তমখানায় জোলেখা ইউসুফের নিকট আপন মতলব চাহে

জোলেখা হপ্তমঘরে গিয়া কহে বাণী
ধরিয়া ইউসুফ হাত বুঝায় আপনি।
বৈসহ সোনার তক্তে মোকে কোলে লিয়া
আমার আগুন দেহ শীতল কবিয়া।
ইউসুফে ধরিয়া বলে মোরে দেহ কোল
কহিতে কহিতে হৈল জোলেখা পাগল।

নেভাও প্রেমের জ্বালা আগুন আমার
আগে ভজ পিছে বাত পুছিব তোমার।
কহিতে কহিতে ধরে ইউসুফের হাত
পুরাও মনের সাধ শোন প্রাণনাথ।
ইউসুফ শুনিয়া লাজে হেঁট করে মাথা
শুনহ জোলেখা বিবি মোর এই কথা।
কদাচিত মোরে না করিলে এই কাম
আল্লার দরগায় তুমি পাইবে বদনাম।
জোলেখা মনেতে বড আনন্দিত হইয়া
ইউসুফের ইজারবন্দ ফেলিল খুলিয়া।
তবে পয়গম্বর জাদা হয় হেঁট মাথা
মেহেস্তের জিব্রিল আসি কহে এই কথা।
পয়গম্বরের বেটা হয়ে কর এই কাম
আওল আখেরে গোনা বড়ই বদনাম।

হপ্তম বাসরঘর কুঞ্জি কুলুপ তার
ফন্দি করে বন্ধ করে সকল দুয়ার।
ইউসুফ পালাইয়া যায় ভাবিয়া দেলেতে
আপনি কেওয়ার খুলে আল্লার কুদরতে।
জোলেখা কহেন আমি ধরেছি দাওন
ছাড়িয়া না যাও মোরে শুন প্রাণধন।

হপ্তম দুয়ারে দাওন ধরিল আসিয়া
ভাগিতে পিছের দাওন রাখিল কাড়িয়া।
আজিজ হুজুরে ইউসুফ পালাইয়া গেল
জোলেখা মনের আশে ভাবিতে লাগিল।

জোলেখা অচেতন হয়ে ঘরে পড়ে রইল। আজিজ খবর পেয়ে ছুটে এলেন। তখন জোলেখা বলতে লাগল :

গোলাম কিনিয়া দিলে আমাকে পুষিতে
আখেরে মরণ হইল গোলামের হাতে।
মানুষ করিলাম আমি পালিয়া পুষিয়া
আমাকে ভজিতে চাহে গোলাম হইয়া।

* * *

ইউসুফ শুনিল যদি আজিজের বাত
কহিতে লাগিল তারে জুড়ে দোন হাত।
এ বাতে সাক্ষী মোর আছমান-জমিন
ভাতিজারে কর তুমি বিচারে আমিন।
করিবে ইনসাফ সেই হেরিবে নজরে
খাড়া হইয়া কহে ইউসুফ্ আজিজ হুজুরে।

ছ'মাসের ছেলে সাক্ষী :

হযরত ইউসুফ ছ'মাসের ছেলেকে সাক্ষী নির্বাচন করলেন। সে যদি বলে ইউসুফ দোষী, তা হলে ইউসুফ তা মেনে নেবেন।

ছয় মাসের ছাওয়াল সেই মাথা তুলে চায়
আজিজে হেরিয়া লড়কা উঠিয়া দাঁড়ায়।

এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখার জন্য শহরের সমস্ত মানুষ হাজির হল।

ছয় মাসের লড়কা দেখ করেন বিচার
হেরিতে ধাইল লোক শহর-বাজার।
ছাওয়াল কহেন—শোন ইউসুফ নফর
তোমার গায়ের জামা করিঁব নজর।
সামনেতে দাওন যদি চিরে থাকে জোরে
তবে গোনা'গার তুমি হইবে আখেরে।
পিছেতে দাওন যদি চিরে সেই মতে
তবে জোলেখার গোনা জানিবে দেলেতে।

বিচারে প্রমাণ হলো জোলেখা দোষী। তখন আজিজ ইউসুফকে আপনার কাছে রাখলেন। ওদিকে ইউসুফের বিরহে জোলেখা পাগল-প্রায়।

ইউসুফে না দেখে হইল জোলেখা চঞ্চল
আপনার দোষে আমি হলেম পাগল।

অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ জোলেখার এরূপ অবস্থা দেখে নানা কথা বলতে থাকল। তখন একদিন জোলেখা ওই সমস্ত মহিলাদের আমন্ত্রণ করলেন। যখন সকলেই হাজির হলো, জোলেখা

তাদের সকলের হাতে একটি লেবু ও একটি ছুরি দিলেন। পরে ইউসুফকে সেই ঘরে আনলেন। সকল মহিলাই লেবু কাটতে গিয়ে হাত কাটলেন।

মোহিত হইল সব ছুঁরত দেখিয়া
ইউসুফের পানে সব থাকিল চাহিয়া।
ইউসুফের ছুরতে ভুলিল সব নারী
লেবু কেটে হাত কাটে খোরাসানি ছুরি।

* * *

সরম পাইয়া সবে কহে আপনাকে
নাহক আমরা বলি জোলেখার দোষ
এরূপ দেখিয়া কারো নাহি থাকে হোশ

জোলেখা পরে স্থির করল, ইউসুফকে বন্দীখানায় রাখতে হবে। যেন সে আমার মত মেনে নেয়, এবং অন্য কোন মহিলাকে দেখতে না পায়।

দেখিতে না পায় যেন দোসরা আওরত
জোলেখা আপন মনে করিল মছলত।
দুঃখ পেয়ে মানিবেক আমার ফরমান
ভবেতে করিবে মোর ভজন গুজরান।
আজিজ শুনিয়া তবে জোলেখার বাত
বন্দীখানায় ভেজে দিল ইউসুফনেকজাত।

বন্দীখানায় ইউসুফ ও ছাকিবাকির স্বপ্ন :

ইউসুফ সাত বছর বন্দীখানায় থাকেন। ওই বন্দীখানায় ছাকি ও বাকি নামে দু'জন লোক ছিল। তারা একদা স্বপ্ন দেখে বড়ই অস্থির বোধ করে এবং ইউসুফকে তাদের স্বপ্নের কথা জিজ্ঞাসা করায় ইউসুফ তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দিলেন। ব্যাখ্যানুযায়ী বাকি শহীদ হয় ও ছাকি জায়গীর পায়। ইউসুফ আপন দুরবস্থার কথা বাদশাকে বলার জন্য ছাকিকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু ছাকি ভুলে যায়।

বাকি স্বপ্ন দেখেছিল যে, তার মাথাতে একটি পাকা ফলের ঝুড়ি এবং কতকগুলো কাক ওই ফলগুলো খাচ্ছে। এবং বাকি স্বপ্ন দেখেছিল যে, তার দু' পা দুদিকে বিস্তৃত, পূর্বে ও পশ্চিমে। প্রথম জনের শূল হয়েছিল এবং দ্বিতীয় জন রাজত্ব লাভ করেছিল।

বাদশার স্বপ্ন :

একদিন বাদশাহ স্বপ্ন দেখলেন যে, সাতটা দুর্বল গরু সাতটা তাজা গরুকে খেয়ে ফেলল। বাদশা এর রহস্য জানার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। ছাকির মনে পড়ল ইউসুফের কথা। তিনি বাদশাকে জানালেন ইউসুফেব কথা। বাদশা রায়হান ছাকিকে ইউসুফের কাছে পাঠালেন। ইউসুফ ছাকিকে জানিয়ে দিলেন বাদশার স্বপ্নের রহস্য। সাত বছর দেশে প্রচুর ফসল হবে এবং পরের সাত বছর আকাল যাবে। বাদশা যেন আকাল সাত বছরের জন্য ফসল সংগ্রহ করে রাখেন।

ইউসুফ বলেন বাত সাত বছর জানি
ফসল হইবে বড় বরষিবে পানি।
তাহার পিছেতে আকাল হবে সাত সাল
আকালেতে মরিবেক অনেক কাঙ্গাল।
সুকালের আনাজ ফসল যে জমা করিবে
আকালের সাত সাল সেই দানা খাবে।

হযরত ইউসুফের মুক্তি :

বাদশা রায়হান, ইউসুফ, উজির আজিজ ও জোলেখা এবং অন্যান্য মহিলাগণকে ডাকলেন। জোলেখা প্রাণ খুলে তার জীবনের সমস্ত কথা বাদশাকে জানালেন। এবার ইউসুফ দোষমুক্ত হলেন। জোলেখা বলেন :

কেবল উজির মেরা নামকা খছম
জোলেখা বলেন এই আমার শরম।
জোলেখার নির্বন্ধ যেই বিধাতার ঘটনা
ইউসুফ আমার সনে না করে ভজনা।
ইহার খাতিরে আমি করিনু ফিকির
তবু না পাইনু মন ইউসুফ নবীর।

হযরত ইউসুফের উজির হওয়ার বয়ান :

বাদশা রায়হান ইউসুফের জ্ঞানে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে উজির পদে বাহাল করলেন। ইউসুফ উজির হয়ে প্রথম ফসল সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন। প্রথম সাত বছরে পরবর্তী সাত বছরের প্রস্তুতি নিলেন। সমগ্র দেশে আকাল পড়ল। ইতিমধ্যে জোলেখার স্বামী উজির আজিজ মারা গেলেন। স্ত্রী জোলেখা তাঁর পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির মালিক হলেন। ইউসুফকে পাওয়ার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত ধনসম্পত্তি উজাড় করে ফেললেন। আজ জোলেখার বালাখানা, দাস-দাসী ও ধনসম্পদ বলতে কিছুই নেই। অতীত জীবনের সেই রূপলাবণ্য ও যৌবনও আর নেই। সে আজ পাগলিনী। পথের ভিখারি। এই সময়ে একদিন ইউসুফ লোক-লস্কর সহ বের হলে পথিমধ্যে জোলেখার সঙ্গে দেখা। তখন ইউসুফ তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

কোথা গেল মালমাত্তা সে রূপ-যৌবন
কোথা গেল দাসদাসী কত লোকজন।

তখন জোলেখা বলেন—আমার মধ্যে যে প্রেমের আগুন জ্বলছে, তুমি তোমার ছড়িটি আমার বুকে স্পর্শ কর। তাহলে বুঝতে পারবে। ইউসুফ ওই রূপ করলে তাঁর কাপড়ে আগুন ধরে যায়।

জোলেখার পুনরায় যৌবনপ্রাপ্তি এবং ইউসুফের আসক্তি :

ইউসুফ জোলেখাকে জিজ্ঞাসা করেন—'তুমি কি চাও?' উত্তরে জোলেখা বলেন—'বিগতদিনের যৌবন'। তখন ইউসুফের আল্লার কাছে প্রার্থনা করেন। আল্লাহ মঞ্জুর করেন।

ইউসুফ মাগেন দোয়া আল্লাহ রাহে মতি
জোলেখা থাকেন যদি পাক হালে সতী।
তোমার কবমে আল্লাহ ভাবনা কিসের
জোলেখা মাঙ্গেন যাহা দেহ তুমি ফের।
* * *
ইউসুফ দেখিয়া তবে বিবি জোলেখারে
আশকে অবশ হল দেখে বারে বারে।
জোলেখা বলেন ইউসুফ কেন কামাতুর
দেল হইতে ওই কাজ কর তুমি দূর।

ইউসুফ-জোলেখা কাহিনীর সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনা জোলেখার বিগত যৌবন ফিরে পাওয়া এবং তাঁর বিছানেতে এলে পূর্ব স্বামী মন্ত্রী আজিজের পুরুষত্ব লোপ পাওয়া। একটি রমণীর সতীত্ব

রক্ষা করার জন্য তাঁর স্বামীর পৌরুষত্ব লোপের প্রয়োজন ইসলামে নেই। কেননা মহানবীজী (সাঃ) বহু বিধবার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ওই বিধবাদের জীবনে বা যৌবনে ওই রূপ ঘটেনি। তাঁরা স্বামী নিয়ে সংসার করেছিলেন এবং অনেকের বাচ্চাও ছিল। পবিত্র কোরআনে বিগত যৌবন ফিরে পাওয়া বা স্বামীর পুরুষত্ব লোপ ইত্যাদির কোন উল্লেখ নাই। তাই জানা যায় না, প্রকৃত ইতিহাস কি। কোন পুরুষ বা রমণী স্বামী-স্ত্রী রূপে সহবাস করলে কারোরই সতীত্ব নষ্ট হয় না। বিধবা বা বিপত্নীক হয় এই পর্যন্ত।

জোলেখার সঙ্গে ইউসুফের মিলন :

বাদশা রায়হান জোলেখার কাছে পয়গাম পাঠালেন। জোলেখা সম্মতা হলেন। উভয়ের বিবাহ হল।

নেকার ছামানা তবে মাথায় তখন
ইউসুফ জোলেখা নেকা হৈল দু'জন।
ইউসুফ জোলেখা সনে খোস্যালিত মন
রস রঙ্গে দু'জনাতে করিল গোজরান।
জোলেখায় পুছে ইউসুফ অনুমান করে
এক বাত কহ বিবি আমারে হুজুরে।
এতদিন তুমি ছিলে আজীজের সাথে
এখন আমারে রাখ দেল খোসালেতে।
জোলেখা বলেন সেই আমার খছম
তাতে মেতে এক সাথে না ছিল সঙ্গম।
শুনবে সাহেব মেরা সব কহি আমি
মেরা সাথে কহি তার না ছিল মর্দামী।
ইউসুফ্ খোসাল বড় জোলেখার বাতে
মেছের মল্লুকে রহে দোনা খোসালেতে।

ইউসুফ আজিজ নাম ধারণ করে মিছেরের বাদশা :

রায়হান বাদশা ইউসুফের রাজ্য পরিচালনায় এতই মুগ্ধ হলেন যে, তিনি ইউসুফকে আজিজ উপাধি দান করে মিছেরের বাদশা করলেন।

ইনসাফ করিবে তুমি রায়েতে প্রজার
আজি হৈতে বাদশা তুমি সকলই তোমার।
আজিজ বলিয়া রাখে ইউসুফের নাম
তক্তে বসাইয়া তারে করিল সালাম।
শস্য ছাগল গরু আনে পালে পালে
খিলাইল কত লোকে দারুণ আকালে।

হযরত ইয়াকুবের দশ বেটা মেছেরে :

আজ বহুদিন পর ইউসুফের সেই দশ সৎ-ভাই এসেছে শস্য নিতে। কিন্তু তারা কেউই জানে না যে, তাদের ভাই ইউসুফ আজ এখানে বাদশাহ। কিন্তু ইউসুফ সবই জানেন। তিনি প্রথম তাদের পিতার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। পরে পরিবারের অন্যান্যদের কথা জিজ্ঞাসা করায় তারা ইউসুফ সম্পর্কে বলেন—তাকে বনে বাঘে খেয়েছে। ইউসুফ তাদের শস্যাদি দিলেন এবং বললেন—অন্যদিন যখন

আসবে তখন তোমাদের অন্য এক ভাইকেও সঙ্গে আনবে, সেও শস্য পাবে। অন্য ভাইটি ছিল ইউসুফের আপন ভাই—বনি আমিন। তারা তাদের পিতাকে সব কথা বলেন। পিতা বনি আমিনকে পাঠাতে রাজি হলেন।

বনি আমিন-সহ দশ ভাইয়ের মিছেরে গমন :

এবারে এগারো ভাইকেই শস্য দেওয়া হল। তারা শস্য নিয়ে রওনা হলেন। শস্য দেওয়ার সময় ইউসুফ নিজ হাতে বনি আমিনের বস্তাতে একটি সোনা বাটি ভরে দেন। এবার কল্পিত ঘটনার আশ্রয়ে ইউসুফ ওই এগারোজনকেই ফিরিয়ে আনলেন। সন্ধান করা হলো। বনি আমিনের বস্তাতে বাটি পাওয়া গেলে সকলকে ছেড়ে দিয়ে বনি আমিনকে বন্দী করা হল।

ইউসুফের কাছে হযরত ইয়াকুবের কেতাবাত (পত্র) :

হযরত ইয়াকুব ইউসুফের কাছে একটি পত্র পাঠালেলেন। তাতে তিনি তাঁর অতীত জীবনের দুঃখময় কাহিনী তুলে ধরলেন। যা ছিল ইউসুফ কাহিনী। এবং কাতর অনুরোধ করলেন—আমিনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। দশ ভাই ওই পত্র নিয়ে ইউসুফের কাছে হাজির হল। এবার ইউসুফ তাদের আপন পরিচয় দিলেন এবং ছোট ভাই আমিনকে বাদশার পোশাকে দরবারে হাজির করলেন। তারা তখন ভয়ে আড়ষ্ট।

ইউসুফ বলেন ডর না কর দেলেতে—
বোঝা বাঁধা কাঁটার ছড়ি ভাঙ্গিলে যে গায়
কুয়াতে ডালিলে যাবে বেঁধে হাত পায়
ইউসুফ কহেন আমি সেই তো বেচারা।

পরে ওই দশ ভাই পিতাকে শুভ সংবাদ দেয় :

বাবাজি লও আগে খুশির খবর
ইউসুফ মিছের শাহা তক্তের ওপর।
ইয়াকুব খোসাল শুনে হাজারে হাজার
মোর্দারের ধড়ে যেন জান বসে তার।

ইউসুফের সঙ্গে পিতা ইয়াকুবের মিলন :

ইয়াকুব নবী মিছেরে হাজির হলেন। বহুদিন পর পিতা পুত্রের মহামিলন। ইউসুফ তাঁর অতীতের সমস্ত কথা বললেন। পিতাও তাঁর অতীতের দুঃখভরা দিনগুলোর কথা বললেন ঃ

এক সাথে দুইজন গলাগলি হৈয়া
যার যার কাঁদে নবী ইউসুফে পাইয়া।
সেইত রোদন দেখে তামাম লস্কর
যার যার হয়ে সবে কাঁদিল বিস্তর।

অতঃপর রায়হান বাদশাও মারা যান। ইউসুফ মিছের শহরে রাজত্ব করতে থাকেন। তখন থেকে পিতা-মাতা ও ভাইগণ তাঁর কাছেই রইলেন।

ইয়াকুব মরিল পরে চল্লিশ বছর
ইউসুফ বাদশাহী করে দুনিয়া ভিতর।
* * *
গোজারে ইউসুফ নবী এলাহীর কাম
জোলেখা মরিল শেষে ইউসুফের শোকে।

হযরত ইউসুফ-জোলেখা প্রসঙ্গ আলোচনা

পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক। এই পথ প্রদর্শনে সে কেবলমাত্র ধর্মের কতকগুলো নিরস কাহিনীকেই একত্রিত করেনি। কোরআনে সর্বমোট আয়াত বা বাক্য ৬২৫০। এদের মধ্যে ধর্মীয় আয়াত মাত্র ২৫০। বাদ বাকি সবই সামাজিক আয়াত। শতকরা চারটি মাত্র ধর্মীয় আয়াত। তাই পবিত্র কোরআন ধর্মীয় গ্রন্থ অপেক্ষা সামাজিক গ্রন্থ হিসেবে গণ্য হয়। সেখানে মানব জীবনের ও এই জগতের সমূহ ঘটনা দৃষ্টান্তাকারে স্থান পেয়েছে। অতীতের বহু ঘটনার বহু কাহিনী, বহু জাতির উত্থান পতনের কারণ ও তার ইতিহাসও বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে মানুষ উত্থান-পতনের কারণসমূহ জানতে পারে। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-বিরহ-মিলন মানব জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। সৃষ্টি-রহস্যের মূল বস্তু। তাই সমাজের এই অধ্যায়টিও বাদ যায়নি কোরআনে। বরং সুন্দরভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে সর্বমোট ১১৪টি সুরা বা অধ্যায় আছে। তাদের মধ্যে ইউসুফ একটি সূরাব নাম। হযরত ইউসুফ হযরত ইয়াকুবের সন্তান। ইয়াকুব একজন নবী ছিলেন। হযরত ইউসুফের জীবন-কাহিনী এই সূরাতে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সমগ্র জীবনটাই যেন রোমান্সে ভরা। কখনও ভাইদের কর্তৃক নির্যাতিত, কখনও কোন মহিলা কর্তৃক অবৈধ প্রেমে আমন্ত্রিত। কখনও বন্দিশালায়, কখনও রাজার আসনে, কখনও প্রেমিকার বাহুবন্ধনে। বড়ই বিচিত্র জীবন।

বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ প্রণয়কাহিনী ছিল না বললেই চলে। যেটুকু ছিল দেব-দেবীর ঘটনা মাত্র। বাংলা সাহিত্যে প্রেম কাহিনীর প্রচলন হল মুসলিম প্রেম কাহিনী হতে। মুসলিম প্রেম-গাঁথা শুরু হলো—ইসলামি প্রেম কাহিনী হতে। এবং ইসলামি প্রেম কাহিনীকে জন্ম দিল পবিত্র কোরআনের সূরা ইউসুফ। অর্থাৎ ইউসুফ জোলেখার প্রেম-কাহিনী পবিত্র কোরআনের এই প্রেম কাহিনীটিকে আশ্রয় করে মুসলিম জাহানের তামাম প্রেম-কাহিনী যেন জন্ম নিল।

পৃথিবীর তামাম ধর্মকাহিনী বা পৌরাণিক কাহিনীগুলোর সাথে এক অন্যের যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পুত্রশোকে নবী হযরত ইয়াকুব (আঃ) অন্ধ হলেন। রাজা দশরথও তাই হলেন। এ যেন ভিন্ন জনে অভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ। হিন্দু কি মুসলমান, খ্রীস্টান কি বৌদ্ধ, সকল পুত্রহারা জননীর হৃদয়-বিদারক শোক একই অভিন্ন। আবার সন্তান সুখের আনন্দও একই।

প্রেম নারী জীবনের সহজাত প্রবৃত্তি। একথা বিবি জোলেখা চরিত্রে সন্দেহের এতটুকুও অবকাশ রাখে না। এই প্রেমজাত সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় সে সবই পারে। নারী এই অধ্যায়ে চির অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিবি জোলেখা ইউসুফকে পাওয়ার জন্য এমন কোন কিছু নেই, যা সে করেনি। শেষ পর্যন্ত বন্দীখানায় পুরেছে। সুতরাং প্রেম-সর্বস্ব নারী চরিত্রে প্রেমই প্রধান। প্রেমই মুখ্য। কিন্তু পুরুষ চরিত্রে প্রেম গৌণ। জোলেখা ছিলেন বিবাহিতা মহিলা। তবুও ইউসুফকে পাওয়ার জন্য কিনা করলেন। সেখানে ইউসুফ অবিবাহিত হয়েও সুন্দরী জোলেখার অনাবৃত চোখ ধাঁধানো দেহকেও স্পর্শ করলেন না। এখানে পুরুষ জীবনে আদর্শই বড় হয়ে দেখা দিল। তাই প্রেমে নারী বড় এবং আদর্শে পুরুষ।

তবুও পুরুষ যে নারীর কাছে চিরদিন ধরা দিয়ে থাকেন, হযরত ইউসুফ চরিত্রে তারও ব্যতিক্রম দেখি না। কোন একদিন ইউসুফকে এক দুর্বল মুহূর্তে আল্লার ইঙ্গিতময় নিদর্শন রক্ষা করে। ১২ ঃ ২৪। এটাকে পুরুষ চারিত্রের দুর্বলতা না বলে স্বাভাবিক সত্য বলতে পারি। এটা আসলে প্রকৃতির (Nature) জয়। তবুও পুরুষের জীবনে আদর্শ যে বড় কথা, তা ইউসুফ চরিত্রে প্রমাণের কোন অপেক্ষা রাখেনি। এখানেই ইউসুফের জয় ও কৃতিত্ব। নারী চরিত্রে সতীত্ব যে কত বড় ধন, সে কথাও সুন্দরভাবেই প্রমাণিত হলো। বিবি জোলেখা তাঁর বার্ধক্যেও আপন সতীত্ব জোরেই বিগত যৌবন ফিরে পেলেন। এখানে কেবলমাত্র সতীরই সতীত্বের জয় ঘোষণা হলো। সর্বশেষে হযরত ইউসুফ আপন দুষ্ট ভাইদের

ক্ষমা করে ক্ষমাশীল আদর্শ পুরুষের পরিচয় দিলেন। হযরত ইউসুফের জীবনাদর্শ ও জোলেখার প্রেম চিরস্মরণীয় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত থাকল।

লায়লা-মজনু

সকল দেশেই এক এক সময়ে এক-একটি জিনিসে হুজুক পড়ে। সে হুজুক নানা ধরনের হয়। আবার কালের ইতিহাসে তা একদিন বিস্মৃতির অতল জলে তলিয়ে যায়। বাংলা পুঁথি-সাহিত্য যেন ওইরূপ একটি তলিয়ে যাওয়া জিনিস। যাকে ইতিহাস তার নঙর দ্বারা কিছুটা আটকিয়ে রেখেছে বা রাখে।

১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে আমরা কলকাতায় সস্তা ছাপাখানার প্রাচুর্য ও প্রচলন লক্ষ্য করি। হিন্দু-মুসলমান উভয়ই এর উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সমস্ত ছাপাখানাতে ছাপা হত বাংলার পুঁথি সাহিত্য। এই পুঁথি-সাহিত্যের দুটি ভাগ লক্ষ্য করি। হিন্দু পুঁথি-সাহিত্য এবং মুসলিম পুঁথি-সাহিত্য। মুসলিম পুথি সাহিত্য ইসলামি বাংলা সাহিত্য বলেই প্রচলিত। এই দুটো ধারা পৃথক হলেও হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবেই এদের গড়ে তুলেছিলেন। অনেক হিন্দু প্রকাশক মুসলিম পুঁথি ছাপতেন এবং অনেক মুসলিম প্রকাশকও হিন্দু পুঁথি ছাপতেন। এখানে এটা ছিল ব্যবসামাত্র। যাই হোক সারা বাংলা ব্যাপী এটিএকটি বাঙ্গালী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। যে সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে একটি সহমিলন, সহানুভূতির সাড়া জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল। সেদিনের পল্লীবাংলায় দলিজ বাড়ি ও বৈঠকখানা বাড়িগুলোতে মানুষ দলে দলে মিলিত হত পুঁথি-সাহিত্য শোনার জন্য। সান্ধ্য আলো জেলে দিয়ে একজন পড়তেন, বাকিরা সব তন্ময হয়ে শুনতেন। কিন্তু আজ পল্লী-বাংলার চেহারা সম্পূর্ণরূপে বিপরীতমুখী। শান্তির নামগন্ধ নেই। আগের দিনের মানুষ শহর হতে পল্লী-বাংলায় যেত কিছুটা শান্তি পেতে। আজ আর সেদিন নেই। বাংলার পুঁথি-সাহিত্য বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে শান্তির যে বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। আজ তা অস্তমিত। শহর কলকাতাতেও পুঁথি-সাহিত্যের আদরের কোন কমতি ছিল না। অল্পশিক্ষিত-অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান সকলেই গভীর মনোযোগ সহকারে এই পুঁথি-সাহিত্য পাঠ শ্রবণ করতেন। পাঠকরা আনন্দ পেতেন। লেখক-প্রকাশকরাও যে যেমন দু'পয়সা পেতেন। ১৮৫০-এ যা আরম্ভ, ১৯০০-তে তার প্রবল জোয়ার, ১৯৫০-এ ভাঁটার টান লক্ষ্য করা যায়। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে তার ক্ষীণ দীপটিও চোখে পড়ে না। আজ তার অগণিত পাঠক পাঠিকা নেই। আছে অতীব নগণ্য সংখ্যক গবেষকগণ। আগামী দিনের ভাবী কালের সুদূর ইতিহাসে এই গবেষকবৃন্দের গবেষণার ফলশ্রুতিটুকুই পুঁথি-সাহিত্যের সাক্ষীরূপে রয়ে যাবে।

এই পুঁথি-সাহিত্য সারা বাংলাজুড়ে লেখা হয়েছিল। তবে ভুরশুট মান্দারন ছিল এই পুথি সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র। বর্তমানে ভুরশুট মান্দারন হুগলি ও হাওড়া জেলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছে। এই অঞ্চলের লেখকগণ ছিলেন সর্বাপেক্ষা অগ্রণী। কাজী সফিউদ্দিন বাংলার ইসলামি পুঁথি সাহিত্যের একজন স্বনামধন্য লেখক ছিলেন। তিনিও ছিলেন ভুরশুট মান্দারনের মানুষ।

পুঁথি সাহিত্যের প্রথম দিকের কিছু লেখক ও তাঁদের রচনা :

লেখক মহম্মদ দানেশ, তাঁর রচনা— 'গোলবে ছানুয়ার', 'চাহার দরবেশ', 'নূর-ইমান' ও 'হাতেম তাই'। দ্বারকনাথ কুণ্ডুর গোলবে সেনুয়ার। মহম্মদ খাতেরের 'মৃগাবতী', 'শাহ্‌নামা', 'আখবারুল ওজুদ', 'লায়লা মজনু', 'তুতিনামা', 'গুল ও হরসুজ', 'সওয়াল জওয়ার', 'মেয়ারাজ নামা' প্রভৃতি। চট্টগ্রামের দৌলত উজির বহরাম প্রগাঢ় ট্র্যাজিক প্রেমকাহিনী লয়লা-মজনুর প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন। অতঃপর মহেশচন্দ্র মিত্র, এরপর খাতেরের 'লায়লা মজনু' পাই ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে। ১২৭১ সনে পাই মুন্সী মোহম্মদের 'লায়লা-মজনু'। তাঁর লেখা থেকে আমরা কিছুটা বর্ণনা দিচ্ছি।

আরব দেশে এক বড় বাদশা ছিলেন। তাঁর কোন কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না। বেশ কাল পরে আল্লার মেহেরবানীতে তিনি এক পুত্রসন্তান লাভ করলেন। এবার এক শুভ মুহূর্তে পুত্রের নাম রাখার জন্য জ্যোতিষীগণের ডাক দিলেন। তাঁরা গণনায় দেখলেন এবং ফলাফল বললেন—

যখন জন্মিল এই লাড়কা তোমার
মহেন্দ্র মণ্ডল যোগ দিল সেতারার।
অদৃষ্টের কথা কিছু কহা নাহি যায়।
কপালের লেখা যাহা হইবারে চায়।
কিন্তু এই লড়কা হবে আশক সাদেক
কোন মতে কোন বাতে না হবে ফাছেক।
আশক হইবে এক রমণী দেখিয়া
উন্মত্ত হইয়া যাবে প্রেমেতে মাতিয়া।.....
অদৃষ্টের লেখা যাহা না হবে খণ্ডন
হইল কায়েস নাম তোমার রতন।
মজনু নাম হবে এর আলম বিচেতে
শিখিবে বহুত এলেম থোড়াই দিনেতে।

লায়লার জন্ম :

আরব দেশে এক বড় সওদাগর ছিলেন। তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না। সওদাগর বড়ই মনের দুঃখে দিন কাটাতেন। পরে আল্লার ফজলে তাঁর এক কন্যা-সন্তান হলো।

কিছুদিন পরে সওদাগর ঘরে
জন্মিল এক সুন্দরী
এমন সুন্দরী রূপের মুরারী
পয়দা হইল সেই নারী।

সওদাগর কন্যাকে বাদশার দরবারে আনলেন। সকলেই দেখলেন।

কন্যাকে দেখিয়ে হোসহারা হয়ে
আপনাকে ভুলে গেল।
কায়েস দেখিল থামিতে নারিল
প্রেমের তীরে বিন্ধিল।

মজনুর খৎনা :

কায়েসের বয়স যখন দশ বছর। পিতা ধুমধাম করে ছেলের খৎনা দিলেন।

মজনুর বাপ যবে শুনিল খবর
দশ-বছরের হৈল মজনুর উমর.......
ফজরেতে ডাকাইয়া আনিয়া হাজ্জাম
খৎনা দেলায় তার সুন্নতের কাম।

মজনু ও লায়লার পাঠ শুরু :

মজনু লায়লা একই মক্তবে পড়ে। কিন্তু দুজনের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার ঘনীভূত হতে থাকল।

যেই কেতাবের বিচে আশুক মাশুক আছে
নাহি কিছু পড়ে তার ছেওয়া।

রত হয়ে আশকেতে হাসি খেলি কৌতুকেতে
রহে দুহে মিলিয়া জুলিয়া।

একথা ধীরে ধীরে মক্তবের সকলেরই কানে পৌছল।

গোপনের কথা যাহা রাখিতে কে পারে তাহা
হইবে সে প্রকাশ ত্বরায়।
শক্ত লোহা বরাবরে হজম করিতে নারে
পেট ফেটে আপনি বেরয়।
এই কথা তার পরে সকলেতে ঘরে ঘরে
প্রকাশিয়া করিল জাহির।
জুড়িয়া আরব দেশ প্রকাশ হইল শেষ
প্রেমকথা মজনু ও লায়লার।

লায়লার মাতার আক্ষেপ :

পরের কথাতে আমি কন্যাকে আপনা
নানামতে কতরূপে করিনু লাঞ্ছনা।
অতি শিশুকালেই বা পিরীতি কে জানে
কলঙ্ক অখ্যাতি মিছে করে জনে জনে।
শহরের লোক সবে দুসমনি করিয়া
কহিয়াছে মিছি বাতে অপরাধ দিয়া।
ভ্রমরা বসিবে কেন কমল বিহনে
ব্যবহার কি জানিবে এমন অজ্ঞানে।
নাহি ফুটে যতক্ষণ কমলের কলি
কেমনে তাহার 'পরে বসিবেক অলি।
অফুটন্ত কুঁড়ি ফুল মধু নাহি যাতে
ভ্রমর বসিয়া কিবা পাইবেক তাতে।

লায়লার মক্তবে পড়া বন্ধ :

মক্তবে পড়িতে আর নাহিক যাইবে
পড়িয়া যে লাভ হইল কত কাল রবে।

মজনুকে দেখতে না পেয়ে লায়লার আক্ষেপ :

মক্তব বারণ হৈল আমার হকেকতে
কেমনে সে চাঁদমুখ পাইব দেখিতে।...
মোর মন উচাটন যাহার কারণে
কি করি উপায় তারে পাইব কেমনে।
কেমনে পাইব তারে সে প্রিয় কোথায়
হায় বিধি কি করিলি হায় হায় হায়।

লায়লাকে দেখতে না পেয়ে মজনুর আক্ষেপ :

পড়িতে নাহিক দিবে বাপ-মা তাহার
ইহা শুনে কাঁদে মজনু হয়ে জারজার।...

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পড়িল মাথায়
কহে হায় প্রাণপ্রিয়া রহিলে কোথায়।...
ইহা বলে মন দুঃখে হয়ে জারজার
হরফে মিলায়ে দেখে লায়লার আকার।

লায়লার বিচ্ছেদে মজনু ফকির :

দেখিতে প্রিয়সী রূপ মনের আশাতে
প্রেমদুঃখী হয়ে মজনু ফেরে পথে পথে।

ভিখারি বেশে মজনু লালয়ার দ্বারে :

কেবা আছ সাখাওত প্রভু সখা যারে
ভিখারি অতিত আমি ভিক্ষা দেহ মোরে।
লায়লা সে হাঁক শুনে বুঝিল মনেতে
কায়েস আইল ফিরে আমারে দেখিতে।
লায়লার দুয়ারেতে দাঁড়ায় আসিয়া
লায়লা তার সাথে মেলে গলায় ধরিয়া।

লায়লার বাহির দরজায় আসা নিষেধ :

এই সব কথা শুনে লায়লার মা রেগে আগুন। তাকে ডেকে অত্যন্ত বকাবকি করা হলো।

শুনে রানী ক্রোধ মনে বেটির উপর
গোসায় জ্বলিয়া হৈল আগ বরাবর।
বেটিকে ডাকিয়া কহে লাজ-ভয় গেল
যার প্রেমে মজে অত কলঙ্ক হইল।
ওরে কালামুখী তুই ভিক্ষা নিয়া আর
বাহিরেতে নাহি যাও কহি বারবার।

লায়লার ক্ষেদে মজনুর বনে গমন :

মোহাম্মদ মুন্‌শী কহে প্রিয়সীকারণ
মজনু ফকির বেশে চলিল কানন।

পরে মজনুর পিতা মজনুকে বন থেকে উদ্ধার করেন এবং এক ফকিরের কাছে নিয়ে যান। ফকির তদবির করেন।

লায়লার হাত হতে তাগা বানাইয়া
তাবিজ মজনুর হাতে দিবেক বাঁধিয়া।
আর লায়লা যে মোকামে থাকে বরাবর
মাটি থোড়া মাজাইয়া লিবে সেথাকার
সেই যে মাটির তরে ছোরমা করিয়া
কায়েসের দুই চোখে দিবে লাগাইয়া।
এ সব তদবির হইলে থামিয়া রহিবে
কদাচিৎ সেই নাম মুখে না কহিবে।

মজনুর সঙ্গে লায়লার সাদির পয়গাম :

এই ব্যবস্থাপনার পর মজনুর উন্মাদনা আর রইল না। তবে লায়লার চিন্তা মন থেকে দূর করতে পারল না। তবুও কিছুটা ভাল বলে মনে হল। এখন বিবাহের কথাবার্তা হচ্ছে। সকলেই রাজি। এমন সময় :

হেনকালে কোথা থেকে কুত্তা এক আচানকে
আসিয়া দাঁড়ায় সেইখানে। ...
মজনুকে কহেন সেই লায়লার কুকুর এই
পালিল সে করিয়া যতন
মজনু এই সমাচার জানিয়া-শুনিয়া তার
ধরে সেই কুকুরের গলে।...
কুকুরের পাও ধরে... উঠাইল বাহুর 'পরে
বহুত পিয়ার করে তারে।

এই সব দেখেশুনে লায়লার পিতা মজনুর পিতাকে বললেন :

মজনুর সাথে ভাই ... বেটি বেহা দিব নাই
আইবুড়া থাকে সেও ভাল।

মজনুর বাপ এক ফকিরের কাছে যায়। ফকিরের সঙ্গে মজনুর কথোপকথন। মজনু ফকিরকে বলে:

আমারে পাগল এবে কোন জন বলে
প্রেমহার গেঁথে আমি পড়িয়াছি গলে।
আশক প্রেমের ভাব যেবা নাহি জানে
অভাগা নাহিক কেহ তাহার সমানে।
প্রাণ সঁপিয়াছি আমি আশক্তে সদাই
পাইয়াছি আমি সেই প্রেমের বাদশাই।

কায়েস দ্বিতীয়বার বনে যায় :

ফকিরের সঙ্গে ওইরূপ কথাবার্তা বলে মজনু আবার বনে চলে যায়।

কায়েস বাদশার বেটা... আশকে হইয়া ঘটা
চলে গেল জঙ্গল মাঝার
উজির নাজির যত... সকলে হইল হত
কান্দে বাদশা হয়ে জারজার।

লায়লার সাদীর পয়গাম :

লায়লার রূপের কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ইবনে সালাম নামে এক বাদশা লায়লার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে উঠল। তখন বাদশার পিতা লায়লার পিতার কাছে গেলেন। লায়লার পিতা বাদশার পিতাকে অতীব সম্মান-সহ গ্রহণ করলেন।

লায়লা নামেতে বেটি আছে যে তোমার
আমার বেটার সাথে সাদি দেই তার।

লায়লার বিবাহ ইবনে সালামের সঙ্গে :

বাদশার বচন শুনে সওদাগর খুশি মনে
করে গিয়ে সাদির ছামান।

খেসকুরমা বেরাদবে ... সমাদর সবাকারে
পত্রপাঠ লিখিয়া পাঠান।
হুকুম পাইল যদি... লায়লা বিবির সাদি
দিল নাই সাহাজাদার সাথে।

লায়লার সখীদের প্রমোদ আলাপ :

কর তুমি বেশভূষা... পূর্ণ হবে মনো-আশা
জানি তেরা শুভ দিন অতি
বাসরেতে বর আসি ... করিবে তোমার খুশি
মিলিবে ধরিয়া তোরে গলে
হাসি খুশি কৌতুকেতে ... নিশি পোহাইবে সুখে
নবীন স্বামীকে নিয়ে কোলে।

লায়লার উত্তর :

ফের লো এমন বাত ... না কহিব মোর সাথ
তুই কিবা বুঝাইবি মোরে।
কি হইবে অলঙ্কারে... জিন্দেগির আশা ছেড়ে
আছি খালি মজনুর লাগিয়া।

সখী গিয়ে মাকে বলল। মা বোঝাতে লাগল :

এমন সন্তান তুই মোর গর্ভে হলি
কুল-মান তোর দায়ে গেল যে সকলি।
জন্মিলি যখন তুই জানিলে এমন
বিষ দিয়ে মারিতুম তোমার কারণ।
পাঠশালে পড়ে বিদ্যা শিখে যেই জন
হুঁশিয়ার হইয়া করে প্রভুর সাধন।
তুই তো শিখিলি বিদ্যা আসক্তের বাণী
মজনুকে ইয়াদ কর দিবস-রজনী।
পাগল হইয়া সেও আছে কোথাকারে
তার দায়ে মর তুমি কিসের খাতিরে।
রাখ এবে কথা মোর কর এই কাজ
লোক মাঝে রহে যাতে মা বাপের লাজ।

লায়লার উত্তর :

চাহ গলে দিয়া ছুরি মার পরাণেতে
আছি তেরা এক্তিয়ারে ছিউ চাহে যাতে।
মজনু প্রেমে প্রেমী হয়ে জীবনের আশা
ছাড়িয়া দিয়াছি আমি না করি ভরসা।

বাসরঘরে ইবনে সালামের সঙ্গে লায়লা :

সাহাজাদা দেখে রূপ লায়লা বিবির
উথলিল প্রেমনদী হইল অস্থির।

সহিতে নাহিক পারে আশক আগুনে
মনে করে হাত ধরে মিলি দুইজনে।
দেখে লায়লা মারে চড় মনের গোসায়
সাহাজাদা চাহে ফের ধরিতে গলায়।
লায়লা ফের মারে লাথ কুওতের সাথে
সাহাজাদা ভূমে পড়ে পালঙ্ক হইতে।
তারপর কহে লায়লা গোসা হইয়া মন
পরনারী চাহ দুষ্ট করিতে হরণ।
শোন দুষ্ট তোর তরে কহি বিবরণ।
মজনু আমার পতি জানে সর্বজন।
তুমি আইলে মোর 'পরে দাগ চড়াইতে
আমার মিলন নাহি হবে তেরা সাথে।
আপনার রাহ তুমি লেই না খুঁজিয়া
মান বাঁচাইয়া যাও ঘরেতে চলিয়া।...
মোর ভাগ্যে ইহা লিখিয়াছে পরওয়ারে
মজনু আমার গতি আউওল আখেরে।

লায়লার পিতামাতা সকলেই লায়লাকে ফজিহত্ করতে লাগল।

করিলি যে বদনাম জগৎ-মাঝার
লোকমাঝে মুখ দেখাইতে হৈল ভার।

তাপর লায়লার বাবা এক কুটনীকে মজনুর কাছে পাঠাল। লায়লা সম্পর্কে তাঁর বীতশ্রদ্ধভাব জানানোর জন্য। কুটনী বনে গিয়ে মজনুকে জানায়—তুমি আর কেন লায়লার আশায় বসে আছ। সে এক বাদশা পুত্রকে বিয়ে করে অতি আমোদে দিন কাটাচ্ছে। তখন মজনু এর সত্য-মিথ্যা জানার জন্য লায়লাকে পত্র দিল।

লায়লার কাছে মজনুর পত্র :

প্রাণ সমতুল্য তুমি প্রেয়সী আমার
হামেহাল মাগি দোয়া দর্গাতে আল্লার।
বাস করিতেছি বনে তোমার লাগিয়া
তব নাম স্মরণে আছি প্রাণেতে বাঁচিয়া।
দিবা-নিশি ফিরি বনে দোয়াতে তোমার
এখনো ধড়েতে প্রাণ আছে ত আমার।
মন সঁপিয়াছি আমি তোমার পীরিতে
হইনু জঙ্গলবাসী প্রাণ তেরা হাতে।...
প্রেয়সী কেমনে তুমি আমাকে ছাড়িয়া
বাদশার বেটার তরে করিয়াছ বিয়া।
খুসী খোসালিত দোহে আছ একসঙ্গে
হাসি খেলি হামেহাল কর নানা রঙ্গে।
আল্লাহ তালা তোমাকে রাখে মন সুখে
নব প্রিয়া ঘরে লিয়া রহ দুহে মুখে মুখে।

আমি ত পুরাণ মোরে গিয়াছ ভুলিয়া
তোমার পীরিতে আমি আছি বন্দী হইয়া।...
তুমি ত ভুলিলে প্রাণ আমি না ভুলিব
তোমার স্মরণে রব যতদিন জিব।
এই লেখা লিখেছিল ললাটে আমার
পাঠশালা হতে সবে করে তিরস্কার।...
তুমি প্রাণ সমতুল্য কি লিখিব গতি
বাক্য নাহি সরে মুখে লেখা হল ইতি।

মজনুর কাছে লায়লার উত্তর :

তুমি নাথ দুখিনীর প্রাণের সমান
হউক তোমার 'পরে আল্লাহ মেহেরবান
আমার দুখেতে দুখী আছহে অন্তরে
ত্যাজ্য করি মাতাপিতা জঙ্গল ভেতরে।...
মোর মত দুঃখী কেহ নাহি এই ভবে
ললাটে লিখন যাহা তাহা কে খণ্ডাবে।
আল্লাহতালা গতি করে পয়দা কৈল তুঝে
তোমার রমণী করে পাঠাইল মুঝে।
আমি তো রমণী, মজনু মোর প্রিয়া
দিবা-নিশি এই ধ্যানে আছি তো ভুলিয়া।...
সর্বদা আমোদে আছ কাননে এখন
বাহার দেখিয়া ঘোরো করিয়া ভ্রমণ।
পড়িয়া রহিছি আমি মোর অবস্থায়
বিরহ অনল মোর দেহ জ্বলে যায়।...
তুমি সদা মনসুখে খেলই বনেতে
জঙ্গলেতে পশুপক্ষী সবাকার সাথে।
কোকিল যে রব করে শুনিতে বাহার
মউর খঞ্জনে নাচে অতি চমৎকার।...
মন সুখে বন মাঝে মেওয়া খাও কত
আম-জাম বাদাম-আঙুর আর যত।...
না করিব ধর্ম নষ্ট যত দিন জিব
তব প্রেমে প্রাণ যায় জান্নাতি হইব।
দুই চক্ষে বহে বারি না পাই দেখিতে
ইতি করিলাম আর না পারি লিখিতে।

লায়লার পত্র পেয়ে মজনু খুশি :

যতন করিয়া মজনু চুমিয়া তাহায়
তাবিজ করিয়া রাখে বাঁধিয়া গলায়।

কুটনী ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। মজনু পশুপক্ষীদের সঙ্গে বন মধ্যে বসবাস করতে লাগল। পরে মজনু লায়লাকে স্বপ্নে দেখতে পেয়ে তার সন্ধানে বন ছেড়ে শহরের দিকে ধাবিত হলো।

প্রিয়সীর তরে মজনু স্বপনে দেখিয়া
হায় হায় করে মুখে উঠে চমকিয়া।
যোগী বেশে গলি গলি ফিরিতে লাগল
শহরের বিচে শেষে যাইয়া পৌছিল।

মজনুর সঙ্গে লায়লার সাক্ষাৎ :

মজনু পাগলের মতো লায়লার দরজার কাছে দাঁড়াল। লায়লা মজনুকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি তার গলা ধরল।

ধরিয়া নাথের গলা কাঁদে জার জার
লায়লা মজনুর বিনে ছিল বেকারার।

লায়লা ও মজনুকে এমত অবস্থায় দেখে দ্বাররক্ষী মজনুকে ধরতে যায়। তরবারি হস্তে মজনুর গর্দান মারতে যায়। এমন সময় দ্বাররক্ষীর হাত অচল হয়ে যায়। তখন দ্বাররক্ষী মজনুর নিকট ক্ষমাভিক্ষা করে।

কথায় কথায় ছিল দুহে খাড়া হয়ে
ধরিল মজনুর হাত দারওয়ান আসিয়ে।
সমসের লইয়া হাতে গোসা হয়ে মনে
চাহি কি খেচিয়া মারে মজনুর গর্দানে।......
মারিবার তরে তেগ উঠাইল হাতে
আঁকড়িয়ে গেল হাত আল্লার কুদরতে।...
এয়ছা কাম তুমি না করিবে আর
লায়লার ওয়াস্তে খাতা বখশিনু তোমার।

পুনরায় মজনুর বনে গমন :

তারপরে মজনু উঠিয়া সেথা হতে
লায়লাকে ছাড়িয়া ফের চলে জঙ্গলেতে।
কহে হীন কবিকার আল্লাহ সখা যার
জাহেরেত কিছুদিন দুঃখ হয় তার।

লায়লার মনে মনে মজনুর অলৌকিক শক্তি জাগ্রত:

তাজ্জব হইয়া লায়লা রহে আপনাকে
মজনুর এই সব কেরামত দেখে।
কহে মজনু হাকিকতে রৌশন জমির
মেজাজে জাহেরা যেয়ছা আশক মনির।
এলাহি এহাকে বড় মোরতবা দিয়াছে
সব আশকের বিচে নামি করিয়াছে।
মিলিবে কিসের তরে আমার সহিতে
মিলিয়াছে বাতুলের উফাদার সাথে।
খুশি আছে দেশ বিচে পাইয়া মাশুক
জ্বলি আমি অভাগিনী পাই অত দুঃখ।

নওফেল বাদশাহ শিকারে গিয়ে মজনুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি মজনুকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন। কেন মজনু এহালে বনবাসে জীবন কাটাচ্ছে। মজনু তার জীবনের সকল দুঃখের কথা বাদশাহকে জ্ঞাপন করায় বাদশাহ মজনুকে কথা দিলেন তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে মজনুকে দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

যাইয়া জঙ্গল 'পরে... শিকার খুঁজিয়া ফেরে
কোনখানে নাহি কিছু মেলে।
বাদশাহ তাহার পরে ... দেখিল মজনুর তরে
পেরেশান বনে গাছতলে।...
কি কামে ফকির বেশে... ফের তুমি দেশে দেশে
কেবা তুঝে করিল নৈরাশ।...
পরীজাদী এক বিবি... দেখিয়া তাহার ছবি
আশকে উদাস হইল মন।...
না হইবে পেরেশানি... তোমার মাশুকে আমি
তেরা তরে দিব মিলাইয়া।

নওফেল বাদশাহ লায়লার পিতাকে পত্র দেন। পত্র অমান্য করলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন।

লায়লা তোমার বেটি ছুরত জামাল
তার দায়ে ফেরে মজনু হইয়া বেহাল।
সাদি যদি দেহ তার মজনুর সাথে
বহুত বেহেতের হয় তুঝে এই বাতে।
নহে ত তোমার সাথে ওড়াই করিয়া
জরু জাত সব তেরা ডালিব মারিয়া

মজনুর সঙ্গে লায়লার বিবাহে লায়লার পিতার অসম্মতি :

এই কাম কদাচিত নাহিক হইবে
মজনুর কারণেতে একদিন জানিবে।...
কাছেই এ কথা শুনে চলিল সেতাব
যাইয়া বাদশার তরে শোনায় জওয়াব।

লায়লার পিতার সঙ্গে নওফেল বাদশার লড়াই। নওফেল বাদশাহ লায়লার পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত করে লায়লাকে বন্দী করে জঙ্গলে মজনুর কাছে হাজির করে। বাদশাহ অন্যান্য সকলকে ছেড়ে দিল।

শেষেতে লস্কর সব পৌছিল আসিয়া
লায়লা বিবিকে দিল হাজির করিয়া।

বাদশাহ লায়লার অসামান্য রূপে নিজকে হারিয়ে ফেলেন। এবং মনে মনে ঠিক করে যে-কোন উপায়ে লায়লাকে পাওয়া চায়।

দেখিয়া লায়লার রূপ বাদশাহ জাহাগীঁর
বুকেতে বিঁধিল তাঁর আশকের তীর।....
উতালা হইল মন জ্ঞান হারাইয়া
মজনুর সব কথা গেলেন ভুলিয়া।......

মারিয়া মজনু তবু ইহাকে লইয়া
আপনার ঘরে আমি যাইব চলিয়া।
কহে এ মজনুর জোড়া নহে কোন কালে
মিলাইয়া দিল বিধি আমার কপালে।

লায়লা ও মজনুর বিবাহ প্রস্তুতি :

উজির যাইয়া কহে মজনুর কারণ
আজ তব শুভ সাদি করহ সাজন।
খুশির খবরে দুঃখ সব গেল দূরে
খুশিতে গোছল করে সুখের সাগরে।

নওফেল বাদশাহ লায়লাকে পাওয়ার জন্য মজনুকে এক দাসীদ্বারা বিষপান করানোর ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু ভুলক্রমে বিষ পেয়ালা মজনুকে দিতে গিয়ে বাদশাহকে দেওয়া হয়। এবং বাদশাহ মারা যান। মজনু পুনরায় বন গমন করেন।

কেমনে পাইব আমি লায়লার কারণ
তার দিশা করে সবে বাঁচাও জীবন।....
সরবত তৈয়ার করে আন সিতাবেতে
জহর দিবেক তার এক গেলাসেতে।
সে পেয়ালা দিবে লিয়া মজনুর কারণে
তোমারে করিব খুশি রতন-কাঞ্চনে।......
মজনুর তরে যাতে বিষ দিয়াছিল
ভুলে সেই পেয়ালা বাদশার হাতে দিল।.....
নীলবর্ণ হৈল দেখ মুখে ভাঙ্গে লাল
মারিল নওফেল বাদশাহ হইয়া বেহাল।....
এয়ছাই কহিয়া মজনু করিয়া রোদন
মনদুঃখে বনে ফের করিল গমন।

নওফেল বাদশাহের এইরূপ ভাবে মৃত্যু হয়েছে শুনে লায়লার পিতা লায়লাকে ঘরে আনার জন্য বনে গমন করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় লায়লার উট দলছাড়া হয়ে কোথায় চলে যায়। আর কেউ জানতে পারে নি। পরে লায়লার উট এমন এক স্থানে হাজির হলো যেখানে মজনু বসেছিল। প্রথমত লায়লা মজনুকে চিনতে না পারায় জিজ্ঞাসা করে। পরে পরিচয় হয়।

মজনু ও লায়লার পুনর্মিলন :

লায়লার উট যবে একেলা হইল
পাহাড় জঙ্গল দিকে গমন করিল।....
খুশিতে ভরিয়া ধনি হাসে মনে মন
কি করে হদিস পাব সখা নিরঞ্জন।
এয়ছাই কহিয়া উট চলিল হাকিয়া
যেখানে বসিয়া মজনু পৌছিল যাইয়া।
আপন প্রিয়াকে লায়লা চিনিতে না পারে
পুছিল কে কহ তুমি জঙ্গল ভিতরে।......
লায়লাকে শুপিয়া প্রাণ বনে হইল বাসা
কোথা মোর ঘর বাড়ি নাহি হয় দিশা।.....

লায়লা যখন নাম শুনিল প্রিয়ার
খুশি হইয়া জ্ঞানহারা হৈল আপনার।
আখেরে চেতন পেয়ে কহে এই বাণী
মজনু মোরে মিলাইল বিধাতা আপনি।.....
লায়লা আমার নাম জগৎ-দুখিনী
শুন প্রিয়া মনসুখে মিলহ আপনি।
মনদুঃখ শান্ত কর ঘুচাও যন্ত্রণা
ফুটিল কমল কলি মেটাও বাসনা।......
বেহুঁশ হইয়া মজনু পড়িল ধূলায়
লায়লা আঁচল দিয়া বাও করে তায়।
আমার দুঃখের নিশী হইল আজি শেষ
মোর দুঃখে নিলে তুমি উদাসীর বেশ।
দেশ ছাড়ি ফের তুমি জঙ্গল ভিতরে
তাহার মজুরি আজ দিল বিধি তোরে।
দোহেতে পিয়াসে আজি জন্মকাল বধি
জিয়ন্ত কুণ্ডের পানি পাঠাইল বিধি।
মনসুখে খাও নাথ দেবী কর কেনে
নামিয়া প্রেমের ঘাটে খুশি হও মনে।
সৌরভ কমল কলি উঠিল ফুটিয়া
মনসুখে মধু খাও ভ্রমর হইয়া।
তোমার যে বস্তু আমি সঁপিনু হে তুঝে
মনে যাহা ভাল হয় কর বুঝে সুঝে।

মজনুর প্রেম আজ দেহ বাসনার উর্ধ্বে :

শুন ধনি গুণমনি মোর প্রাণপ্রিয়া
দেখিয়া তোমার মুখ জুড়াইল হিয়া।.....
মোর মন শান্ত তবে মধুর বচনে
শুন প্রিয়া এই বাত রেখ খালি মনে।
আমারে লজ্জিত নাহি কর এ কামাতে
আখেরেতে গোনাগার কলঙ্ক জগতে।

যবনিকা :

তারপর মজনু লায়লাকে নিয়ে সওদাগরের কাছ হাজির করে দেয়। ঘরে এসে লায়লা বিরহ ব্যথায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সময় মা কে কয়েকটি কথা বলে যায়—

শুন মা মউত এবে পৌছিল আমার
মালেকুল মউত খাড়া ছেরানা উপর।
আমার মউত বাদে মজনুর লাগিয়া
মোর এই সমাচার দিবে গো যাইয়া।
কহিবে মরিল লায়লা প্রেয়সী তোমার
যার তরে ছিলে তুমি অন্তরে বিমার।

মজনুর কানে পৌঁছল এ দুঃসংবাদ :

মালেকুল মউত সেথা পৌঁছিল আসিয়া
মজনুর পাকজান নিল নিকালিয়া।

বনের পশুপক্ষী মজনুর প্রাণহীন দেহ রক্ষা করে এবং হঠাৎ কয়েকজন হাজির হয়ে দাফনকার্য সমাধা করে।

পশু সবে মজনুর লাশকে ঘেরিয়া
কাঁদা আর ভাবাগোনা করেত বসিয়া।
ইহা বলে পশু সবে রহে আগুলিয়া
আচানক কয়লোক আসিল পৌঁছিয়া ঃ...
কাফন দাফন দিয়া মজনুর কারণ
তারা সব বনে হতে করিল গমন।

প্রসঙ্গ আলোচনা

ইউসুফ-জোলেখা ও লায়লা মজনু

পবিত্র কোরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ১২নং সূরাটির নাম সূরা ইউসুফ। এই সূরাটির বর্ণিত কাহিনী সম্পর্কে পবিত্র কোরআন প্রথমেই বলে নিয়েছে—'আমি তোমার (হযরত মহম্মদ দঃ) নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি।" ১২ ঃ ৩। কাহিনী বলতে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জীবন-কাহিনী। এই জীবন-কাহিনীটিকে আমরা প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত দেখছি। প্রথম ভাগে তাঁর বাল্যজীবন, যা বৈমাত্রেয় ভাইদের দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত। তাঁর জীবননাশের চরম প্রচেষ্টা। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লক্ষ্য করি নিরপরাধ নিরাসক্ত হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রেমে জোলেখা বিবি ভীষণভাবে আসক্ত ও বিচলিত। তৃতীয় অধ্যায়ে দেখি তাঁর বাদশাহী লাভ।

লায়লা-মজনুর জীবনে লক্ষ্য করি আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত প্রেমের নদী প্রীতির গভীর খাদে খরস্রোত বেগবান নদীর ন্যায় সজোরে প্রবাহিত। এখানে 'অন্তহীন' জোয়ার লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কোন ভাঁটা লক্ষ্য করিনি। এখানে লায়লা একাকী জোলেখা বিবির মতো মজনুর প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েনি। মজনুও সমভাবেই আসক্ত হয়েছিল লায়লার প্রতি। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে আমরা সংযমী পুরুষ নিরাসক্ত পেয়েছি। মনজুকে আমরা সে রূপে পাইনি। ইউসুফ-জোলেখার প্রেম-কাহিনীকে আমরা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে দূর অতীতের সমাজের বাস্তব-ঘটনা হতে জানতে পারছি। কিন্তু লায়লা মজনু সমাজ জীবনের ছবি হতে পারে। তবে কোন বাস্তব ঘটনা কিনা সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার কোন উপায় নেই। কেননা এটা উমাইয়া যুগের (৬৬১-৭৫০ খ্রীঃ) লেখা। সেটা জানা যায়, কিন্তু লেখকের নামও জানা যাচ্ছে না। অনেকে অনেক রকম বলেন। সুতরাং এখানেও ইউসুফ-জোলেখার সঙ্গে লায়লা-মজনুর একটা পার্থক্য থেকেই যাচ্ছে। তবে এই সব মিল-অমিল যাই থাক, এই দুটো প্রেম-কাহিনী থেকে আরব বা ইসলামি জগতের প্রেমকাহিনী যে বিশ্বজোড়া প্রেমের পিরামিড তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আলেফ্-লায়লা, আরণ্য উপন্যাস ও পারস্য উপন্যাস যার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আচার্য সুকুমার সেন বলেন—"অপভ্রংশের যুগে (পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী) রোমান্টিক-কাহিনী কাব্য ও প্রণয়গাথার বেশ প্রচলন ছিল। এই ধারার জের টেনে এনেছিলেন মুসলমান কবিরা। হিন্দু কবিরা প্রধানত দেব-মাহাত্ম্য কাহিনী নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন। বিশুদ্ধ প্রণয়কাহিনীর দিকে তাঁদের তেমন নজর ছিল না। হিন্দু কবিদের কাছে লৌকিক সাহিত্য ধর্মসাহিত্যেরই অঙ্গ ছিল। কিন্তু মুসলমান

কবিদের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের কোন আবশ্যিক যোগাযোগ ধরে পড়েনি। সুতরাং দেব-মাহাত্ম্য নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ কাহিনী রচনায় তারা নিরঙ্কুশ ছিলেন। এই জন্যই হিন্দি ও বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক কাহিনী রচনায় মুসলমান কবিরাই অগ্রণী ও একাধিপতি।"

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত ইসলামি বা মুসলিম প্রেমকাহিনী ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করে, তাদের মধ্যে ইউসুফ-জোলেখা ও লায়লা-মজনু প্রেমের গগনে ও প্রীতির আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ও তারকার মাঝে দীপ্তমান সূর্য ও চন্দ্রের মর্যাদা লাভ করেছিল। এমনকি এদের ইসলামি প্রেমকাহিনীর উর্বর বীজতলা বললেও বেশি বলা হবে না। পরবর্তীকালে মুসলিম জগতে যত প্রেমকাহিনী রচিত হলো, জন্মসূত্রে সবই এই দুটোর কাছে যেন ঋণী। পবিত্র কোরআনের বর্ণিত ইউসুফ-জোলেখার পূর্বে মুসলিম-জগতে এই পথে পা দেয়, এই বীর কে ছিল! পবিত্র কোরয়ান মুসলিম জগতে পুরুষ ও রমণী হৃদয়ের প্রেমাধ্যায়ের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে। যে অধ্যায়টি ভারতীয় সাহিত্যে অনালোচিত ও অনাস্বাদিত ছিল। পবিত্র কোর আনের এই ইঙ্গিতময় বর্ণনা ও ব্যঞ্জনা ছাড়া ভারতীয় প্রেমের ইতিহাসে এই সুপ্ত প্রেমাধ্যায়টি আরও কতকাল অলিখিত থাকত তা কে বলতে পারে।

ইউসূফ-জোলেখাকে যখন প্রেমনদীর প্লাবনের মূল ঝরনার উৎসে বলতে পারি, তখন লায়লা-মজনু ওই উৎসের প্রবাহিত প্রধান ধারা। ইউসুফ-জোলেখা পবিত্র কোরআনের সন্দেহাতীত বর্ণিত ঘটনা। তাই সে পরবর্তীকালে প্রেম-নদীগুলোর অসংখ্য বারিবিন্দুর জমাট মেঘমালা স্বরূপ। তাকে সামনে রেখেই আমাদের সমাজজীবনে মানুষের অসংখ্য প্রেমকাহিনী মানুষেরই কলমে জন্ম নেওয়ার শক্তি ও সাহস পেল। সৃষ্টি হলো প্রেমের জগৎ, প্রেমের সাহিত্য। লায়লা-মজনু সেই অসংখ্য সৃষ্টির একটি। তবে প্রধানস্বরূপ।

এই দুই প্রেম কাহিনীতে মানুষের সমাজজীবনের বিশেষ করে পুরুষ ও রমণী হৃদয়ের প্রেমের অধ্যায়ের দুটো গোপন অভিব্যক্তি আমরা সহজেই লাভ করলাম। লায়লা-মজনুর অমর লেখক তীব আন্তরিকতা ও সতর্কতার সঙ্গেই কোরআন বর্ণিত ইউসুফ-জোলেখার প্রেমাধ্যায়ের চূড়ান্ত মহাক্ষণটিকে গভীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেই অনুসরণ ও অনুধাবন করে তার যথাযথ প্রয়োগ প্রণালীতে লেখক তাঁর কলমের কালিকে কালজয়ী করতে সক্ষম হয়েছেন। লেখকের এই প্রয়োগ প্রণালীতেই লায়লা-মজনু গ্রন্থটি অমরত্বের তাজ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

তত্ত্ব বা তথ্যটি হলো, জোলেখা শত চেষ্টা, সব কলা, সব কৌশল, সব ছলনা অবলম্বন করেও শত জাল বিস্তার করেও ইউসুফকে তাঁর চোখ ধাঁধানো রূপ-লাবণ্যে ভরা দেহের যৌন সম্ভোগে নামাতে পারল না। অথচ যে-কোন সময়েরই যৌবনের সুন্দরী নারী দেহ যে-কোন পুরুষকেই পরাজিত করার সর্বপেক্ষা বড় অস্ত্র। যৌবনভরা সুন্দরী জোলেখা তাঁর সেই শেষ অস্ত্র বড় অস্ত্র বিবস্ত্র বক্ষের উচ্চ কুচানন, উলঙ্গ দেহের অষ্টাঙ্গ দ্বারা ইউসুফের প্রতি স্থির লক্ষ্য ভেদে অব্যর্থ বাণ মারলেন। ইউসুফ তাঁর পুরুষ হৃদয়ের সংযতার ঢালে বিবি জোলেখার ওই অব্যর্থ বাণকেও রুখে দিলেন। পুরুষ হৃদয়ের আদর্শ ও সংযমতার জয় ঘোষণা হলো। মর্ত্যের মানবপ্রেম অনায়াসে অবলীলায় স্বর্গে আরোহণ করলেন।

লায়লা-মজনুর অমর লেখক পবিত্র কোরআনের ঐ দৃশ্যটিকে অন্তরের সঙ্গে অনিমেষ নয়নেই লক্ষ্য করে দেহাতীত প্রেমকে প্রয়োগ করলেন তাঁর অমর প্রেম কাহিনীতে। ফলে কাহিনীও অমরত্ব লাভ করল। লায়লা মজনুর লেখক যদি কোরআনের বর্ণনানুয়ায়ী তাঁর রচিত প্রেমকাহিনীকে দেহাতীত করতে না পারতেন। তাহলে তাঁর রচিত গ্রন্থ লায়লা-মজনু কোনদিনই বিশ্বব্যাপী কালজয়ী গ্রন্থের সম্মান লাভ করত কিনা, তা কে বলতে পারে!

আমরা এই দুটি গ্রন্থেই লক্ষ্য করলাম পুরুষ ও রমণী হৃদয়ের দুটো অবাস্তব না হলেও বড়ই অস্বাভাবিক দুর্লভ বস্তু। সমাজজীবনে সচরাচর আমরা যা লক্ষ্য করি, তাই এখানে লক্ষ্য করলাম।

প্রেমের অধ্যায়ে সমাজের যেটি স্বাভাবিক ধারা, পুরুষ-মন কামনা করে নারীকে এবং নারী-হৃদয় সেই কামনাকে পূর্ণ করে। নারীর শত ইচ্ছা, শত বাসনা-কামনা থাকলেও সে প্রকারান্তে বললেও কখনও প্রস্তাব দেয় না। এইটাই নারী চরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম। কথায় বলে নারীর বুক ফুটলেও মুখ ফুটে না। কিন্তু আমরা এই দুটো গ্রন্থেই বিপরীতধর্মী দৃশ্য লক্ষ্য করলাম। দুটো গ্রন্থের দুই নারী বা প্রেমিকাই তাঁদের আপন আপন প্রেমিকের হাতে আপন আপন দেহ তুলে দিলেন। কিন্তু দু'জন প্রেমিকই ওই ভীষণ বস্তু হতে সংযমতার তুলনাহীন পরিচয় রেখে নিজেদের আপন আপন প্রেমিকার দেহ সম্ভোগ হতে বাঁচিয়ে রাখলেন। মর্ত্যের প্রেম স্বর্গীয় প্রেমে স্থান লাভ করল, দেহের প্রেম দেহাতীত হল। সুতরাং লায়লা-মজনুর অমরত্ব ইউসুফ-জোলেখার সঠিক অনুসরণের সোনার ফসল। পবিত্র কোরআনের প্রতিটি দৃষ্টান্তই অমরত্বের দাবিদার। কেবলমাত্র সঠিকভাবে কোরআনকে অনুসরণ করতে পারলেই চরম চমৎকার ফল পাওয়া যাবে।

আমরা ইউসুফ-জোলেখা গ্রন্থে আরও দুটো জিনিস লক্ষ্য করলাম। ইউসুফ-জীবনে ধৈর্যের ফল ও জোলেখা-জীবনে সতীত্বের মূল্য। হযরত ইউসুফ (আঃ) সারা জীবন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। তার ফলও তিনি দু'হাতে পেলেন। কোরআন : ২ঃ১৫৩, ১৭৭, ৩ ঃ ২০০, ৪ ঃ ২৫, ১১ ঃ ১১৫, ৭০ ঃ ৫, ৮ ঃ ৪৬, ৬৬, ২৯ ঃ ৫৮-৬০, ৫৬ ঃ ১০০। এবং বিবি জোলেখাও তাঁর সতীত্বের চরম মূল্য বার্ধক্যেও নব-যৌবন ফিরে পেলেন। পুরুষের সততা ও সংযমতা এবং নারীর সতীত্ব এবং লজ্জাশীলতা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম অলঙ্কার। জীবনকে করে ভূষিত, এবং একদিন নিয়ে আসে অমূল্য পুরস্কার।

চাবি ও তালা

সমাজ-সম্পদে যদি পুরুষচাবি
সমাজ-রক্ষণে তালা নারীর দাবি।
ছোট নয় বড় নয় কেহ কারও চেয়ে
উভয়ই হয়েছে বড় অপরে পেয়ে।
বালক-বালিকা দেহে দিলেন আল্লাহ্
দুই-ই তাঁহারই দান চাবি ও তালা।
বালকে করিলে যুবক বালিকা যুবতী
মিলিতে মোহনা মুখে দিলে মহাগতি।
কাড়িলে যৌবন আবার গোপন বাসরে
করিলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পড়তি প্রহরে।
নহে শুধু নর-নারীর যৌনজীবন
তাঁহারই কুদ্‌রতে ভরা বিশ্ব-ত্রিভূবন

দেখিয়া সম্মুখে কোন পরমা সুন্দরী
তরঙ্গায়িত নাহি হলে জীবনের তরী,
যৌবননদীতে জোয়ার কেন হে আসে,
প্রাণ দিয়ে কেন চাই অন্যেরে পাশে।
প্রতিটি মানব-অঙ্গ বিধির বিধান
মানুষ রাখুক তার বিধির সম্মান।
কোথাও প্রত্যক্ষ আছে কোথাও পরোক্ষ
বিধাতার মহা ভেদ মহান লক্ষ্য।

নিখিলের নিয়ামত রাখে যারা দূরে
অবলীলায় পাওয়া ধন অবহেলা করে।
বলেন নবীজী মোর সাবধান করি—
শয়তান রক্তেতে বহে দিবস-শর্বরী।
ষড়রিপু না মারিয়া জেলখানায় ভরো,
জীবন্ত রাখিয়া তাদের জড়-বন্দী করো।'
কাম-ক্রোধ-লোভশূন্য হও যদি তুমি
জীবন জগতে তখন শুষ্ক মরুভূমি।
ভুল হোক ভ্রান্তি হোক থাক পথে ত্রুটি
ভুল-ভ্রান্তি জীবনের জন্মগত জুটি।
বারবার একই ভুল নাহি যদি হয়।
গফুর্-গযফার পাশে জানিও নিশ্চয়।
সতর্ক রাখিয়া শুধু অবৈধ সম্ভোগে
নাহি বাধা বিধাতার কোন উপভোগে।
ত্যাগ ক'রে শুধু এক অবৈধ সম্ভোগ
বিধাতার যত দান কর উপভোগ।
বিধাতা দেখিতে চান সাজানো সংসার
দেখিতে বেজার বাসেন বৈরাগ্য তোমার।
দেখিতে উৎসুক তিনি তব শৃঙ্খলতা
সুখ ও সম্ভোগ মাঝে রবে সংযমতা।

মোদের প্রাণের মাঝে রবে সখা-সই
আমরা মানব বটি দেবতা তো নই।
হে মোর মহান আল্লাহ যৌন-অবদান
প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা তোমারই বিধান।

সংসার তোমারই সৃষ্টি রম্য-উপবন
মানবে করিতে লীলা দিয়েছ যৌবন।
দিয়েছ প্রেমের নদে বেগবান ধারা।
পড়িলে স্রোতের টানে ভাসিবে তারা।

প্রেমের পাথারে ভেসে জোলেখা বিবি
ধরিতে ব্যাকুল ছিলেন ইউসুফ নবী।
আল্লাই করেন রক্ষা উভয়ে তখন
যৌবন জোয়ারে ভাসে উভয়ই যখন।

ইউসুফের সংযমতায় জোলেখা বিবি
টানিতে ব্যর্থ হলেন ইউসুফ নবী।
জোলেখা রক্ষা পেলেন ডুবু-ডুবু ক্ষণে
ইউসুফের ধৈর্যবল ধীরতার গুণে।

নারীরে নারীত্ব দিয়ে দিলে যাহা দান
প্রেম তার জীবনের সহজাত গান।
পুরুষে পিপাসা দিয়ে পাশে দিলে কূপ
নিবারিতে তৃষ্ণা জল রমণী স্বরূপ।

তৃষ্ণার্ত করিল নরে তোমারই গরিমা
পিপাসাতে জল নারী তোমারই মহিমা।
কেহ নাই কোন কালে এই খেলারুখে
এ খেলা খেলিতে হবে সুখে ও দুখে।
সৃষ্টির সিন্ধুকে যদি পুরুষ-চাবি
রক্ষণ তাহার তালা নারীর দাবি।
ফোটাতে মানব-ফুল শিশু দলে দলে
কোরকে রেখেছ কুঁড়ি পাপড়িতলে,
ফোটাতে সকাল-বিকাল অযুত প্রসূন
যুবক-যুবতী বুকে দিলে আমন্ত্রণ।
প্রেম ও প্রীতির শাখে নিত্য অনুরাগে
ফুটিল যৌবন-ফুল জীবন-বাগে।

সংসারে স্বরূপ সংজ্ঞা মাতা ও পিতার
ভালবাসা স্নেহ-মায়ার প্রকাশ্য পাহাড়।
বলিবারে চাই আমি মহান আল্লাহ্—
দুই-ই তোমার খেলা চাবি ও তালা।

—কাব্যকানন

*কোরআন ঃ ২ ঃ ৩৫, ১৭২, ২২৩, ৪ ঃ ২৪-২৬, ৭ ঃ ১৯-২৭, ১২ ঃ ২৩-৩৫, ১৭ ঃ ২৪, ২৩ ঃ ৫-৭, ৫১, ২৪ ঃ ৩০-৩২, ২৮ ঃ ৭৭, ৩১ ঃ ৩৪, ৭০ ঃ ২৯-৩১, ৪৬ ঃ ১৫।

গোলে বকাওলি
অনুবাদক ঃ শ্রীযুক্ত উমাচরণ মিত্র
শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মিত্র
ছাপাখানা : লক্ষ্মীবিলাস, ২৬৫, চিৎপুর, কলকাতা,
১৭৮০ খ্রীঃ

অনুবাদকের বিনয় :

পারস্য হইতে এই ইতিহাস সার
ইচ্ছা হইল বঙ্গ ভাষায় করিতে প্রচার
বান্ধববর্গের অনুরোধে বিশেষত
ভাষান্তর করা গেল স্ব-স্ব সাধ্যমতো।.....
অগণ্য সৌজন্যে দৈন্যে দয়া প্রকাশিয়া
অশুদ্ধ আছয়ে যত দিবেন শোধয়া।

পারস্য ভাষায় গোল অর্থ ফুল। এবং বকাঅলি এক পরী-রাজার পরমা সুন্দরী মেয়ের নাম। তার একটি বাগান আছে। ওই বাগানের একটি ফুলের নামও বকাঅলি।

ভারতবর্ষের পূর্বে প্রসিদ্ধ নগর শর্কস্তান। তার নরপতি জৈনাল মলুক। অতি সুমতি। তাঁর দুই ভার্যা। সুরূপা ও সুভব্যা। সুরূপার চার পুত্র। কনিষ্ঠার কোন সন্তানাদি নেই। একদিন রাজা সংবাদ পেলেন কনিষ্ঠা গর্ভবতী। তখন তিনি রাজ্যের অন্যান্য ভূপগণকে ডাকলেন রানীর গর্ভে কি সন্তান আছে। কেমন সন্তান হবে ইত্যাদি জানার জন্য। ভূপগণ সকলেই সমবেত হয়ে গণনা করে জানালেন, এক সুপুত্র জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু রাজা পুত্র দর্শন করলে অন্ধ হবেন।

কিন্তু এক অমঙ্গল আছয়ে লিখন
আপনি হবেন অন্ধ হেরিলে নন্দন।
শুনিয়া ভূপতি হৈল হরিষে বিষাদ
পুত্র হয়ে একি দেখি হইবে প্রমাদ।

সকলে মিলে ঠিক করলেন রানীর জন্য একটা পৃথক স্থান করা দরকার। রানী সেখানে প্রসব করবেন। সেইরূপ করা হলো। রানী যথাসময়ে প্রসব করলেন।

দশমাস অন্তে রানী নির্দ্ধারিত কালে
প্রসবিল সুকুমার রাজদণ্ড ভালে।

পুত্রের নামকরণ :

রজার কর্ণগোচর হল। তিনি বহু মণিমুক্তা বিতরণ করলেন। এবং পুত্রের নাম রাখলেন তাজল মুলক (তাজ্-উল-মুল্‌ক্ অর্থাৎ দেশের মুকুট)।

পুত্রের শুনিয়া রূপ অতি অপরূপ
তাজল মুলুক নাম রাখলেন ভূপ।

পুত্রের জন্য বহু বিচক্ষণ শিক্ষক নিযুক্ত করা হলো। পুত্র চৌদ্দ বছর বয়সে পা দিল। সে আজ বুদ্ধিমান যুবক। বহু বন্ধুবান্ধব-সহ সে এখন ঘোড়াতে চেপে নদীতীরে বেড়াতে যায়। একদিন রাজা মৃগয়ায় বের হলেন এবং অকস্মাৎ পুত্রদর্শনে অন্ধ হলেন।

এই রূপে চতুর্দশ বর্ষেতে কুমার
সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইল প্রচার।.....
কখন বেড়ায় অশ্বে আরোহণ করি
নদীতে বেড়ায় কভু ভাসাইয়া তরী।....
একদিন অকস্মাৎ হইল ঘটন
দৈবের লিখন কভু না হয় খণ্ডন।
মৃগয়া করিতে রাজা বাঞ্ছা করি মনে
পাত্র-মিত্র আদি লয়ে চলিল কাননে।.....
দৈবাৎ দেখিল রাজা বিদ্যুতের প্রায়
অশ্বারোহী নব্যভব্য কয়জন যায়।
পুনরায় চতুর্দিকে করে নিরক্ষণ
অন্ধকার ভিন্ন অন্য না হয় দর্শন।

তখন রাজা সকলকে ডাকলেন। কি উপায়ে এর প্রতিশোধক করা যায়। একজন বলেন—বকা আলি ফুলে এর প্রতিকার হবে।

শেষে উক্তিমতে যুক্তি করিলেক সার
বকাঅল পুষ্পেতে হইবে প্রতিকার।

যখন এই ফুল কেই সংগ্রহ করতে পারল না, তখন রাজার বড় রানীর চার পুত্র ওই ফুল সংগ্রহে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল।

সকাতরে নিবেদিল নৃপতি চরণে
আমরা সকলে যাব পুষ্প অন্বেষণে।....
প্রতিজ্ঞা করিল তবে করিয়া মন্ত্রণা
আরোগ্য করিয়া ভূপে ঘুচাব যন্ত্রণা।

বহু লোক-লস্কর, হাতি ঘোড়া, জাহাজ ইত্যাদি নিয়ে শুভক্ষণে যাত্রা করল। তারপর তারা গিয়ে পৌছল ফেরদৌস নগরে। সেখানে দেখে এক বিশাল রাজপ্রাসাদ। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল ওটা আয়ারা রাজকন্যার বাড়ি। সে বিবাহের জন্য পণ করেছে পাশা খেলা।

কি জাতি বলহ শুনি কি নাম তাহার
জিজ্ঞাসিল এ ভুবন সুশোভন কার।
আয়ারা নামেতে কন্যা পরমা সুন্দরী....
পাশা খেলা করিয়াছে বিবাহের পণ
যেজন জিতিবে তারে করিবে বরণ।
বাজি প্রতি লক্ষ মুদ্রা স্থির করি পণ
খেলিতে বসিল ক্রমে রাজপুত্রগণ।

রাজপুত্রগণ পাশা খেলায় হেরে গিয়ে আয়ারার কাছে বন্দী হয়।

যুবতী হইয়া রাজি হারাইয়া সেই বাজি
ধন সব আসিল ভাণ্ডারে।
নৃপতির পুত্রগণে অন্য অন্য বন্দীসনে
আজ্ঞা দিয়ে রাখে কারাগারে।

আয়ারার পরাজয় তাজল মুলক কর্তৃক :

রাজার চার পুত্রের সঙ্গে ছিল তাজল মুলক। সে ছিল ছদ্মবেশে। যখন চার পুত্র আয়ারার সঙ্গে পাশা খেলায় হেরে গিয়ে বন্দী হলো, তখন তাজল মূলক একজনের দোকানে আশ্রয় নেয়। এবং চিন্তা করে কি করে আয়রাকে পরাজিত করা যায়। একদিন দেখল এক বুড়ি দৈনিক আয়ারার কাছে আসা-যাওয়া করে। তখন সে বুড়ির কাছে যোগাযোগ করল। বুড়ি তাকে ভালবাসল। পরে সে বুড়ির কাছ থেকে আয়ারার সকল ভেদ জেনে নিল। আয়ারা জিতত এক মুষিকের সাহায্যে। তখন তাজল মুলক ওই মূষিককে জব্দ করার জন্য একটি বিড়ালকে সঙ্গে নিয়ে আয়ারার কাছে গেল। এবার আয়ারা প্রমাদ গুনল। এবার সে হেরে গিয়ে জীবন যৌবন সব কিছু হারাল।

এই রূপে অল্পক্ষণ... পয়েতে বাড়িয়া পণ
সব ধন হারাল সুন্দরী
উদ্যান সহিত বাড়ি.... হাতিনাতি ঘোড়াগাড়ি
ক্রমে সব হারে সহচরী।
শেষেতে যৌবন ধন... খেলায় রাখিয়া পণ
কামিনীর হইল পরাজয়।
মিত্র কহে রসবতী... বিধি মিলাইল পতি
লও নৃপসুতের আশ্রয়।

আজ তাজল মুলক তার সমস্ত ইতিহাস আয়ারাকে জ্ঞাপন করল। তার চার ভাই মুক্তি পেল। পিতার অবস্থা জানাল। তাঁর কষ্ট নিবারণের জন্যই সে বিদেশে এসেছে। তখন আয়ারা তাকে জানাল

বকা অলি ফুলের ইতিহাস। পরীর রাজার এক কন্যা আছে। তার নাম বকা অলি। তার বাগানে পুষ্প আছে—বকা অলি নামে। সেখানে আঠার হাজার দৈত্য প্রহরী আছে। সেখানে যাওয়ার কোন উপায় নেই। কিন্তু তাজলমুলক যাবেই। এ তার প্রতিজ্ঞা।

শুনি রসবতী হয়ে ম্লানমতি
নয়নে বহিছে ধারা
বলে প্রাণকান্ত যাইলে নিতান্ত
একান্ত হইব সারা।
নিদারুণ পণ করিয়া যৌবন
অর্ধেক হইল প্রায়
তুমি হলে বাম কে পুরাবে কাম
এ দুঃখ জানাব কায়।

তাজল মুলকের বকা-অলি পুষ্পান্বেষণে গমন এবং দৈত্যের সহমিলন। হাজির হলো এমন এক জায়গায়, যেখানে বিরাট পর্বত মাথার উপর।

রজত পর্বত প্রায় আকার বিশাল
সম্মুখে আসিছে যেন কালান্তরের কাল।

সেখানে পৌছে তাজল মুলক সেখানকার দৈত্যগণকে ডাকতে শুরু করল। আমাকে বিনাশ করো এই বলে। দৈত্য তার মুখে আক্ষেপের কথা শুনে খুবই সদয় হলো। এবং তার সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করল। তাজল মুলক সব কথা খুলে বলল। দৈত্য কথা দিল তাকে সাহায্য করবে এবং আপন বাসায় নিয়ে গেল খাওয়াবার জন্য। তাজল মুলক বলল—তুমি যদি ঘি-ময়দা ও চিনি আনতে পার, আমি তোমার জন্য ভাল ভাল খাবার তৈরি করে দেব। দৈত্য তাই করল। তাজল মুলক ভাল ভাল খাবার বানাল। দৈত্য খেয়ে খুব খুশি। দৈত্য বন্ধুবান্ধবদেরও ডাক দিল। তারাও খেল। তাদের মধ্যে তাপরেব বলে একজন তাজলকে কথা দিল সাহায্য করার জন্য। তাপরেবের বোন হামালা ছিল দৈত্যদের প্রধান। তাজলকে তার কাছে পৌছে দেওয়া হল।

নানবিধ খাদ্য তাহে রাজার কুমার
প্রস্তুত করিয়া দিল পর্বত আকার।
বলে দৈত্য আর একদিন এই মত
প্রস্তুত করিয়া দেহ খাদ্যদ্রব্য যত
আত্মীয় বান্ধবগণে করি নিমন্ত্রণ
এমন সুখাদ্য ভক্ষ্য করাই ভোজন।...
ভোজনের পর্বে তবে দৈত্য দলবন্ত
কুমারের বিবরণ কহে আদি-অন্ত।
ছাড়াইয়া নদনদী আর কত বন
উত্তরিল গিয়া পরে হামালা সদন।

হামালার পালিত কন্যা মাহমুদার সঙ্গে তাজল মুলকের বিবাহ ও বকাঅলি উদ্যানে গমন :

হামালা তাজলকে পেয়ে খুশি হলো। কারণ সে বাগানে এক কন্যাকে কুড়িয়ে পায়। সে এখন বিবাহযোগ্যা। তাজলকে পেয়ে সে বাসনা পূর্ণ হলো। কিন্তু তাজলের মনে কোন শান্তি নেই। হামালা কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে সব কথা বলল। তখন হামালা বাগানের প্রধান মূষিককে জানাল যে জামাতা বাগান দেখতে যাবে। তাজল বাগানে হাজির হলো।

মূষিক রাজপুত্র লয়ে উদ্যানে যাইল
কোথায় বকা অলি জিজ্ঞাসা করিল।
বর্ণনে অতীত সে উদ্যান মনোরমা
ভেবে নাহি কিছু পাই করিতে উপমা।

বকা অলি দর্শন :

তাজল প্রথম একটি অতীব সুন্দর ফুল দেখে মনে করল এই বকা অলি। তারপর দেখে এক মহারত্ন নারী। যার সৌন্দর্যের কোন শেষ নেই।

করদ্বয় রক্তাম্বুজ ... তাহার মৃণাল ভুজ
কন্টক বিহীন শোভা পায়।...
কমল কোরকদ্বয় ... কতযুগ গৃহে রয়
তদাগ্র চম্বুক নহে অলি।

তাজল বকা অলি সহ হীরাঙ্গুরী বিনিময় এবং মাহমুদাকে নিয়ে হামালার কাছ থেকে বিদায় নিল।

ইহা করি স্থির... নিজাঙ্গুরী বীর
তাহার করেতে দিল।
পুনঃ স্বীয় হার ... গলেতে তাহার
মন সাধে পরাইল।
হীরাঙ্গুরী তার ... হেরিয়া কুমার
পরি নিজ কর গলে
আইল সত্বর ... হইয়া কাতর
প্রাণ রাখি সেই স্থলে।

তাজলের ফেরদৌস নগরে আয়ারার সঙ্গে পুনর্মিলন :

বহু নদ-নদী পাহাড়-পর্বত পার হয়ে তাজল আয়ারার সঙ্গে আবার মিলিত হলো। তখনো তার চার ভাই আয়ারার কাছে তাহের সমস্ত কিছু বাজি হেরে বন্দীরূপে আছে। আয়ারা বলল—তাঁরা মুক্তি পাবে একটি শর্তে। তাদের উরুদেশে একটি ছাপ থাকবে যে, তারা আয়ারার চিহ্নিত গোলাম ছিল। তারা তাই করল।

আয়ারার আছিল চিহ্নিত গোলাম
ভবে সবে গৃহে যাবে লয়ে যত ধন
নতুবা বকিবে বৃদ্ধ যাবৎ জীবন।
পরামর্শ পরস্পর করিয়া বিস্তর
সম্মতি হইল ছাপ লতে তদন্তর।

এই ভাবে চার ভাই মুক্তি পেয়ে আপন দেশ শর্কস্তানে হাজির হল।

তাজলের স্বদেশে গমন, সঙ্গে আয়ারা ও মাহমুদা :

তাজল স্বদেশে ফেরার জন্য প্রস্তুত হলো। সে তার ইচ্ছা প্রেয়সীদ্বয়কে জানাল। তারাও মহাখুশি। সকলেই বহু মূল্যবান সামগ্রী-সহ শর্কস্তানে হাজির হলো। সেখানে গিয়ে হামালাকে হাজির করার জন্য তার চুল উন্মুক্ত করল। সঙ্গে সঙ্গে হামালা হাজির হল। তখন তাজল হামালার দৈত্যগণকে দিয়ে তৈরি করলেন এক বিশাল প্রাসাদ।

নিশাচর কহে মন্ত্রী আশ্চর্য কেমনে
ঈশ্বরের অসাধ্য কি আছে ত্রিভুবনে।

অপাঙ্গেতে ত্রিভুবন যে-জন সৃজিল
পবন যখন তার আজ্ঞা নিয়েছিল।
হইলে তাহার দয়া পুরুষ স্ত্রী হয়
রমণী পুরুষ হয় একথা নিশ্চয়।

রাজকন্যা রাজপুত্রে পরিণত :

একজন রাজা ছিলেন। তাঁর সবই মেয়ে। তাঁর কনিষ্ঠা রাণী গর্ভবতী ছিল। রাজা বললেন—তারও মেয়ে হলে তিনি বনে গমন করবেন। কনিষ্ঠা রাণী প্রসব করলেন মেয়ে। রাজাকে সংবাদ দেওয়া হলো ছেলে। রাজা যথাসময়ে রাজপুত্রের বিয়ের ব্যবস্থা করলে রাজকন্যা তখন প্রমাদ গুনল। মনের ক্ষোভে বনে গমন করে। সেখানে দৈত্যবর ছিল। তখন রাজকন্যা রাজপুত্রে পরিণত হলো।

মন্ত্রীর তাজল মুলকের কাছে গমন :

মন্ত্রী তাজল মুলকের কাছে গমন করলে তাজল তাঁকে যথোচিত সমাদর করে রাজাকে আমন্ত্রণ করেন। রাজা দলবল নিয়ে হাজির হলো। ওই দলে বকা আলিও ছিল। এবং বকা অলি বুঝল এই চোরই তার ফুল চুরি করেছে। এইভাবে পিতাপুত্রের মিলন হলো :

ইহা শুনি তৎক্ষণাৎ... রাজপুত্র প্রণিপাত
ভূপতির চরণে করিয়া
বিনয়ে কহে ভূস্বামী... তব সে কুপুত্র আমি
অন্ধ ছিলে যাহারে হেরিয়া।

তাজল মুলকের ভ্রাতাগণ আয়ারা কর্তৃক অপমানিত :

রাজা যখন অন্যান্য চার ছেলেকে নিযে তাজল মুলকের সঙ্গে মিলিত হলেন, তখন তাজলকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে বিবাহ করেছে কিনা। তাজল বলল—করেছি। দুই স্ত্রী সঙ্গেই আছেন। তখন তিনি তাদের দেখতে চাইলেন। তখন তাজল স্ত্রীদের টিপে দিলেন। তারা যেন দরবারে না আসে এই বলে যে, ওখানে দাস আছে। রাজা শুনে হতবাক। এখানে দাস কোথায়। সবাই পুত্র।

পবে আয়ারা ওই চার ভাইকে চিনতে পারল। তারাও চিনতে পারল। লজ্জাতে সবার মাথা হেঁট হল। এবং তাজল তার পিতাকে সব কথা জানাল।

বকা অলির স্বদেশে গমন :

বকা-অলি আপন দেশে গমন করে তাজল মুলকের রূপ বর্ণনা করে। এবং তাজলের নিকট বকা অলির পত্র :

তাপিতা তরুণী তব বিরহ অনলে
জ্বলে জ্বলে যে যন্ত্রণা জুড়াই কি জলে।
লয়করি লোকরাজ লই হে স্মরণ
মম মণিহার লয়ে মজাইলে মন।
লুকায়ে কি লাভ লুটি লইয়া অন্তর
কহ কেনে কামিনীরে করিলে অন্তর।
আছি অহর্নিশি অতি অন্তরে আকুল
সিন্ধুসম সীমাশূন্য সন্তাপের কুল।
নারী নিবারিতে নারি নিদারুণ জ্বালা
শরীরে স্মরের শর সদা কহে বালা।

দুর্নিবার দুঃখ দলি দয়া করি দীনে
বাঁচাও এ ঘর ক্ষোভে খলতা বিহনে।
রাখহে রসিকরাজ রমণীর মান
শিব স্মরি শীঘ্র আসি সুস্থ কর প্রাণ।
ইঙ্গিতে পদের আদ্য বর্ণে গুণধাম।
তিরোহিত তব নাম মম মনস্কাম।

বকা অলির কাছে তাজল মুলকের উত্তর :

বর্ণনে অতীত তব ও বিধু বয়ান
কাননে করক্ষী করে কটাক্ষে পয়ান।
অন্তরে আমার অদ্য আনন্দ আসার
লিপির লিখনে লীন লোচন আমার
দিবানিশি দহে দেহ দুঃখ দাবানলে
বাসনা বারণ করি বারিধির জলে।
নিশ্চয় নাশিব তায় নীরে নিম্মজিয়া
শিখাইব সন্তানে সলিলে সমর্পিয়া।
জানি হে যৌবন তব জলধি জীবন
গিয়া মগ্ন করি গাত্র জুড়াব জীবন।
তেমন ত্বরায় হলে তা পয়ে ধরিয়া
ছেদি ছিন্ন ছিন্ন করি প্রেম ছুরি দিয়া।

বকা-অলি হামালাকে রাজপুত্রের কাছে পাঠান :

বকা-অলি তাজলের পত্র পেয়ে তার জন্য অধীরা। সে আর তার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না। হামালাকে ডেকে পূর্বাপর সব কথা জানাল। হামালা বায়ুভরে সেখানে হাজির হলো। বকা-অলিও হাজির হল। রাজপুত্র-সহ সকলে মিলে আনন্দে মেতে উঠল।

এবার মালাবদল :

সখীগণ উভয়ের ইচ্ছা বুঝতে পেরে মালা গাঁথার জন্য ফুল সংগ্রহ করল। মালা গাথা হল। উভয়ের মধ্যে মালাবদল হল।

উভয়ের মন বুঝে সখীগণ, করিল গমন গাঁথিতে মালা....
হরষিত মন হইয়া তখন লইয়া সুজন কুসুমমালা
প্রিয় গলে দিল, বদন চম্বিল, শিহরি উঠিল, অনাথ বালা...
মত্ত রসরাজ, সাধিতে স্বকাজ এতক্ষণ বাদ, আর কি সহে
অতি ব্যগ্রমতি হয়ে চাহে রতি, কহে রসবতী করুণা কর।

তাজলের সঙ্গে বকা অলির মিলন :

ধরিল কামিনী গলে... হেরিল বাসনাছলে
করিল সুন্দরী কত ছল।
বলিল কি কর রঙ্গ ... গলিল লজ্জায় অঙ্গ
জ্বলিল অন্তরে কামানল।

লাজে মগ্নারসবতী ... কাজে দিল অনুমতি
সাজে দোঁহে রতি সাবধানে।
বসিল রসিকজন ... খসিল কটি বসন
পশিল মধুপ মধুপানে।
জুটিল নাগর আসি ... টুটিল আশঙ্কা রাশি
উঠিল উথিল কামবান।
ফুটিল প্রেমের কলি... লুটিল অমিয় অলি
উঠিল উথলি কামবান।

উদ্যানে উভয়ের মিলন :

তব কাছে আছে প্রিয় ঔষধ ইহার
দান দিয়া কর দূর দুর্গতি আমার।
রসিকা রমণী তবে ইঙ্গিত বুঝিল
লাজে যুবরাজ আর উত্তর না দিল।
মৌন হিরে মন বুঝে নাচার উন্মত্ত
মন সাধে আরম্ভিল অনঙ্গের বত্ত

বকা অলির মাতা কর্তৃক তাজল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত :

যখন তাজল ও বকা অলি প্রেমে মত্ত। তখন বকাঅলি দেখতে পেয়ে রাগে তাজলকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করল।

দেখে নিজ কন্যা নিদ্রা বিহুলে
অচেতন পরপুরুষ কোলে।...
তাজল মুলুকে ধরিয়া বলে
ছুড়িয়া ফেলিল সাগর জলে।

পরী বকা-অলির প্রতি মা রাণীর ভর্ৎসনা

দেবতার জাতি হয়ে
মজিল মানুষ লয়ে।...
কেমনে যৌবন ধন
করিলি অর্পণ।

এবার বকাঅলিকে বন্দী করে কারাগারে পাঠান হল। বকা অলি ওখানে বিরহ বেদনায় পুড়তে থাকল।

এদিকে তাজল সমুদ্র হতে বনে গমন করল। এবং দুই পক্ষীদ্বারা জানতে পারল, ওই বনে এক বৃক্ষ আছে। যার ডালে অনেক কাজ হয়। তাজল তাকে উদ্ধার করল। যার সাহায্যে উড়তে শিখল। উড়তে উড়তে এক সরোবর দেখল। সেখানে স্নান করল। সঙ্গে সঙ্গে নাবী মূর্তি লাভ করল। হঠাৎ এক অশ্বারোহীর সঙ্গে দেখা। অশ্বারোহী এই পরমা সুন্দরীকে পেয়ে মনের সুখে যাত্রা করল। অশ্বারোহী বাড়ি পৌছল। সুন্দরী গর্ভ ধারণ করল। যথাসময়ে সন্তান প্রসব করল। পরে একদিন এক হ্রদে স্নান করতে গিয়ে বিশাল এক কালী মূর্তি পেয়ে বসল। মনের দুঃখে বনে গমন করল। ওখানে এক হ্রদে স্নান করে পূর্ব চেহারা লাভ করল।

এবার রাজপুত্র তাজল উড়তে উড়তে এক দেশে এক রাক্ষস পুরীতে হাজির হলো। ওই দেশে এক পরমা সুন্দরীর সঙ্গে দেখা হল। পরমা সুন্দরী মনের দুঃখে রোদন করছে। জানতে পারল তার

নাম বকা-অলি। দু'জনে তখন মনের সুখে গল্প আরম্ভ করল। হেনকালে রাক্ষস-পুত্র হাজির। তাজল তাকে বধ করতে ইচ্ছা করল। রাক্ষস-পুত্রও তাকে সাবধানবাণী শোনাল।

কার সাধ্য আছে ... আসে যম কাছে
সংহারিব এই ক্ষণে।

যুদ্ধে রাক্ষস হেরে গেল।

শূন্যভরে আসি পরে
তার ধরে কেশে
উর্ধ্ব পানে তুলে টানে
নাহি জানে কে সে।

রাজপুত্র তাজলের বাহ্যাজার বাটিতে গমন। বকা-অলির মা রাক্ষস বধে খুব খুশি হলো। পরে বকা অলির সঙ্গে তাজলের শুভ পরিণয়।

কৌতুকে কামিনীগণ রাজার নন্দনে
বাসরে বসায় লয়ে আনন্দিত মনে।...
ত্রিভুবনে মান্য হয় রমণী রতন
রসির্কে বাহারে করে অঙ্গের ভূষণ।...
কি জানি সবার মন করিতে রঞ্জন
যদি নাহি পারে হবে কলঙ্ক ভূষণ।
এই রূপে বাক্যচ্ছলে বাড়িল সর্বরী
নাগরে প্রশংসা যায় যতেক সুন্দরী।

রাজপুত্র তাজলের কামিনী লয়ে স্বদেশে গমন :

জনক-জননী পদে প্রণামি কামিনী
স্বামীর সহিত গেল হইয়া সঙ্গিনী।
শূন্যভরে যায় সরে ত্যাজি কত দেশ
কুমারের উদ্যানেতে উত্তরিল শেষ।

বকা অলি দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় :

একদিন দেবরাজ ইন্দ্রের মনে বকা-অলির কথা মনে পড়ায় সে অন্যান্য সকলকে জিজ্ঞাসা করল। তারা ফুলের কথা বলল। দেবরাজ আশ্চর্য হল। চার পরীকে হুকুম দিল বকা-অলিকে ধরে আনতে। তারা তাই করল। বকা অলি তখন তাজলের সঙ্গে সুখনিদ্রায় ছিল। বকা অলি মানুষের সঙ্গে মিশেছে। সুতরাং তাকে আগুনে শুদ্ধ করতে হবে। তাই করা হল। তাজল খবরও পেল না।

একদিন দেবরাজ অমর নগরে
সভায় বসিয়া লয়ে যতেক অমরে
বকা অলি-নৃত্যকীরে হইল স্মরণ।...
সুন্দর পুরুষ তাহে হেরে বকা অলি
বরিয়াছে নরকুলে দিয়া জলাঞ্জলি।...
এখান আনহে তারে বলি আজ্ঞা করে।...
পুনর্বার পবিত্র করিতে তব দেহ
অনলে সঁপিছে তাই ত্যাজ্য করি স্নেহ।

বকা অলির তাজলকে নিয়ে ইন্দ্রালয়ে গমন। বকা অলি ইন্দ্রালয়ে এসে নাচল। আবার স্বামীর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তাজল এ সব কিছুই জানল না। তবে বকা অলি তাকে জানাল। এবং তাকে

নিয়ে ইন্দ্রালয়ে গমন করল। তাজল খুব ভাল বাজনা জানত। দেবরাজ এতে খুব খুশি হয়ে বকা অলিকে একটি বর দানে ইচ্ছা প্রকাশ করে। বকা অলি এই সুযোগে নিজেকে মানুষের কাছে অর্পণের বর চাইলে দেবরাজ ক্রোধে শাপ দিল। এবং বারো বছরের জন্য সিংহল দ্বীপে নির্বাসন দিল।

রাজপুত্র তাজলের সিংহল দ্বীপে গমন। এই শাপে তাজল প্রমাদ গুনল। বহু কষ্টে এক সরোবরে পৌছল। সেখানে চারজন পরীর সঙ্গে দেখা হল। তাকে তারা কথা দিল বকা অলির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে। মিলিয়ে দিল। কিন্তু তাজল দেখল বকা অলির অর্ধেক শরীর ওই শাপে অবশ। তখন সে তাকে ভাল করার জন্য উপায় খুঁজতে থাকে।

রাজপুত্র তাজলের প্রতি রাজকুমারী চিত্রাবতীর আসক্তি :

রাজপুত্র তাজল নানাভাবে শহরে ঘুরতে থাকে। তার রূপ দেখে রাজা চিত্রসেনের কন্য চিত্রাবতী তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। রাজা একথা জানতে পেরে রাজপুত্রের কাছে প্রস্তাব পাঠাল। রাজপুত্র অস্বীকার করায় রাজা তাকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করল। তবুও রাজপুত্র রাজি হল না। অবশেষে রাজকন্যা তাকে রাজি করাল। বিবাহ হল।

বিশেষত বিবেচনা করি মনে মনে
বুঝিল বিবাহ করা উচিত এ জনে।...
কামিনী কৌতুকে গলে বরমাল্য দিল।

তাজলকে বকা-অলির ভর্ৎসনা :

বকা অলির রোজ রাতে ভাবে রাজপুত্র কোথায় গেল। একদিন এলে তাকে জিজ্ঞাসা করল। সে কোথায় ছিল। তখন তাজল সব কথা খুলে বলল। এদিকে রাজা চিত্রসেন জামাতাকে দেখতে না পেয়ে পরীদের নির্দেশ দিল ওই কানন ও মন্দির ধ্বংস করতে। তাই করা হল।

বকা অলি পূর্ব শরীর ফিরে পেল :

ইতিমধ্যে বকা অলি তাব পূর্ব শরীর ফিরে পেল। তখন রাজপুত্র তাজল স্বদেশে ফেবা স্থির করল। রাজা চিত্রসেনকে জানানো হল। রাজা সম্মত হলেন। রাজকন্যা চিত্রাসেনকে সঙ্গে পাঠানো হল। তাজল চার স্ত্রীকে নিয়ে স্বদেশে ফিরলেন।

আয়ারা-মাহমুদা-বকা-অলি-চিত্রাবতী :

ভার্যাদ্বয় রসরাজ সঙ্গেতে লইয়া
নিজ দেশে চলিলেন প্রফুল্ল হইয়া।
শুভক্ষণে গমন করিয়া নিকেতনে
প্রণাম করিল পিতামাতার চরণে।...
তদন্তর তাজল মুলক স্থির হয়ে
সুখে কালবঞ্চে চারি কামিনী লয়ে।

গ্রন্থকারের বিনয় :

পারস্য হইতে এই ইতিহাস সার
ইচ্ছা হইল বঙ্গভাষায় করিতে প্রচার
বান্ধববর্গের অনুরোধে বিশেষত
ভাষান্তর করা গেল স্ব স্ব সাধ্যমতো।...
অগণ্য সৌজন্যে দৈন্যে দয়া প্রকাশিয়া
অশুদ্ধ আছয়ে যত দিবেন শোধিয়া।

গোলে বকাঅলি প্রসঙ্গ আলোচনা

সাহিত্যের সোনার কাঠির জাদুদণ্ডে সমাজের অনেক অবাস্তব কাহিনী যেন বাস্তবে রূপ পায়। আবার অনেক সময় বর্ণনার তারতম্যে অনেক বাস্তব কাহিনীকে অবাস্তব বলে মনে হয়। প্রকাশভঙ্গি যদি পাঠক-পাঠিকার প্রাণে আনন্দ ও অনুভূতি জাগাতে পারে তাহলে সে সাহিত্য উচ্চস্তরের। যদি কোন সৃষ্টি প্রাণে সাড়া জাগাতে না পারে, তাহলে সে সাহিত্য যতই বাস্তবধর্মী হোক না কেন, সে কাহিনী মাত্র। ঘটনার ফিরিস্তি মাত্র। কেননা সাহিত্যের যে শাশ্বত ধর্ম, তা সমাজের কেবলমাত্র কঙ্কালের কাহিনী বলা নয়। তা জীবনের অন্তরতম, নিগূঢ়তম ও নিবিড়তম সত্যকে সরলভাবে সরসভাবে রূপ দেওয়া। এই দিক দিয়ে 'গোলে-বকা অলি' সাহিত্যের আসরে সম্মানের দাবিদার।

গোলে বকা অলি পারস্য সাহিত্য হতে আনা। পারস্য ভাষায় গোল অর্থ ফুল। এবং বকা অলি এক পরীরাজার মেয়ের নাম। এবং ওই মেয়ের একটি বাগান ছিল। ওই বাগানের একটি ফুলেরও নাম।

এর কাহিনী যে কল্পনাপ্রসূত তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাহিনীটিই কল্পনাভিত্তিক। যা অনেক সময়ই বাস্তব-বিরোধী হয়ে উঠেছে। কনিষ্ঠা রানীর সন্তান হলো। সন্তান দেখে রাজা অন্ধ হলেন। এ সব অতি কল্পনা ছাড়া আর কি হতে পারে। যেমন জঙ্গনামা অধ্যায়ে পাই যে—'ঘোড়ায় চাপিয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল। আবার লাখে লাখে কেটে যায়। অবশেষে গুণে দেখে বত্রিশ হাজার''। প্রণয় গাথা অধ্যায়েও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ওই যুগে এটা খুব একটা দোষণীয়ও ছিল না। এরই নাম হয়তো যুগের দাবি।

রাজার কনিষ্ঠা রাণীর পুত্র তাজল মূলক আয়ারা রাজকন্যার হাত থেকে তার অন্যান্য বৈমাত্রেয় ভাইদের উদ্ধার করে। এ ঘটনাটির উপর ইউসুফ-জোলেখার প্রভাব লক্ষণীয়। পাশা খেলার যে বৃত্তান্ত, তা ভারতীয় প্রভাব হতে মুক্ত নয়। কাহিনীর মধ্যে বিড়াল ও মূষিকের যে পালা। এটা সকল পুঁথিরই যেন একটি অংশ। রমণী পুরুষ হওয়া। আবার আপন রূপ ফিরে পাওয়া। এরূপ আরো কাহিনীগুলো শিশু ভোলানোর মতো সৃষ্টি করা হয়েছে। কাহিনীর মধ্যে বারবার যে পরীর আগমন, এটা মানুষের বাস্তব সমাজকে অস্বীকার করার নামান্তর মাত্র।

ইসলামি পুঁথি-সাহিত্যের প্রণয় গাথার অধ্যায়ে আরও যে অসংখ্য পুথি আছে, তার সঙ্গে গোল বকা অলির তেমন কোন মূলগত পার্থক্য দেখি না। তবে বর্ণনাভঙ্গি পাঠক-পাঠিকাকে মুগ্ধ করতে পেরেছে। এইটাই এর বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যের মানদণ্ডে সৃষ্টিটাই তো বড় জিনিস। কি নিয়ে সৃষ্টি হলো সেটা বড় কথা নয়। কেমন সৃষ্টি হলো এটাই বড় কথা। এখানেই গোলে বকা অলির মাহাত্ম্য।

অন্যান্য অনেকেই গোলে-বকা আলি রচনা বা অনুবাদ করেছেন, কিন্তু মিত্রদ্বয়ের কাজটা অনেক উন্নত মানের।

এখানে একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করছি। তখনকার দিনে ভারতীয় সাহিত্যিকগণ, কবিগণ প্রণয় গাথাতে দেব-দেবী নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। মানুষের কোন স্থান ছিল না। কিন্তু পারস্য বা ইসলামি সাহিত্যে লক্ষ্য করছি যে তাঁরা বেহেশ্তের ফেরেস্তা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না। পৃথিবীর অতি সাধারণ মানুষকে না নিলেও রাজা বাদশাদের নিয়েই প্রেম কাহিনীগুলো রচনা করেছিলেন। তাই গোলে-বকা অলির প্রধান নায়ক তাজ-উল্-মূলক অর্থাৎ দেশের মকুট। দেশের মানুষ নয়। এবং স্বর্গের দেবতাও নন।

নিজাম পাগলের কেচ্ছা

মোহঃ ইউসুফ খাঁ

পূরব দেশে এক সওদাগর ছিলেন। তাঁর প্রচুর ধনরত্ন ছিল। কিন্তু কোন সন্তানাদি ছিল না। যার জন্য তিনি সর্বদা মনের দুঃখে থাকতেন। একদিন এক ফকিরের সঙ্গে দেখা হলো। দরবেশ সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর দুঃখের কারণ কী। সওদাগর মনের দুঃখ জানালেন। দরবেশ তাঁর জন্য দোয়া করলেন। তিনি এক পুত্রসন্তান লাভ করলেন। নাম রাখা হলো কিঙ্কর। কিঙ্কর বড় হয়ে বিদেশে বাণিজ্যযাত্রা করলেন।

কত চিত্র দিল আর খুশি হয়ে মন
জাহাজ কিনিয়া সাথে দিলেন নূতন।

কিঙ্কর এক রাজকন্যার রূপের কথা শুনে অস্থির হয়ে পড়ে।

কমলাবতী বলি তার রেখেছিল নাম
নামে লায়েক বটে সেই গোলআন্দাম।
কি কব ছুরত তার নাজুক আন্দাম
তামাম বদন তার ছিল গোলকাম।
হরিণী জিনিয়া আঁখি গজেন্দ্র গমন
কোকিলের ক্ষত সেই কহিত বচন।
ফিরোজা রঙ্গের শাড়ি হামেশা পড়িত
মাথার চুলেতে এক চুটি বানাইত।
পাছায় লুটিত যেন সাপের মতন
ভুজঙ্গ আসিয়া যেন করিছে দংশন।
কিঙ্কর শুনিয়া ইহা বেহুঁশ হইল
কিছুক্ষণ পরে তার হুঁসেতে আইল।

কিঙ্কর কমলাবতীকে পাওয়ার আশায় তার দেশে গমন করল।

সংসারের যত সুখ দিয়া বিসর্জন
চলিল কিঙ্কর সাধু কন্যা দরশন।
যদি নাহি দেখ পাবে. পাপ প্রাণ না রাখিবে
অনলেতে দিবে ঝাঁপ ত্যাজিবে জীবন।
বহু কষ্টের পর কিঙ্কর কমলাবতীর দেশে হাজির হল।
কিঙ্কর দেখিয়া তারে চিনিতে পারিল
পেয়েছিল যত দুঃখ সব ভুলে গেল।
কহিলেন শুন ওহে বিদেশী পাগল
কাহার লাগিয়া তুমি হইলে বিকল।
আখেরেতে অনেকক্ষণ গুজারিয়া গেল
নিজাম আমার নাম কহিয়া উঠিল।

উজিরজাদার ওপর রাজকন্যা কমলাবতী আসক হয়ে পড়ে। দু'জনে একই মক্তবে পড়তে যেত। নিজাম পাগল রাজকন্যার পুঁথি বহন করত। একদিন রাজকন্যা উজিরজাদাকে বলল :

শুনহে উজির পুত্র আমার বয়ান
এসকের জ্বালায় আর নাহি বাঁচে প্রাণ।

বারেক আমারে তুমি ঠাণ্ডা কর নাথ
আইসহ মিলন করি দোহে একসাথ।
নচেৎ এ জ্বালা আর কেমনে সহিব
তোমার কারণে আমি প্রাণ তেয়াগিব।......
কহিল কন্যার তরে বিনয় করিয়া
এইরূপে কতক্ষণ ভাবিয়া-চিন্তিয়া।
এ কাম আমার দ্বারা কভু না হইবে
প্রকাশ হইলে পরে মাথা কাটা যাবে।
রাজকন্যা কহে হেথা নাহি কোনজন
প্রকাশ পাইবে বল করিয়া কেমন।
কেবল নিজাম এক আছেত পাগল
তাহার মুখেতে কভু নাহি সরে বোল।
অতএব বলি নাথ প্রাণ জ্বলে যায়
বারেক এ জ্বালা হতে বাঁচাও আমায়।
একথা শুনিয়া পাত্র ভাবিল অন্তরে
প্রাণ তেয়াগিবে কন্যা না করিলে পরে।......
নিতান্ত এ কর্ম যদি করিবারে বল
এদেশ হইতে তবে অন্য দেশে চল।
একথা শুনিয়া কন্যা মঞ্জুর করিল
তারপরে যে যাহার পাঠে মন দিল।
অধীন গোলাম কেচ্ছা রচিয়া যে ছিল
নিজাম পাগল তাহা সব শুনেছিল।

প্রসঙ্গ আলোচনা :

তখনকার দিনে প্রেম কাহিনীর একটা হুজুক পড়েছিল। নিজাম পাগলের কুকীর্তি সেই হুজুকের ফসল। লেখক এই কেতাবে কোন নতুন কথার সমাবেশ করতে পারেননি। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যেও কোন সংঘাত নেই। পড়লে মনে হবে নিছক ছকে আঁকা একটি কাহিনী।

গতানুগতিক ধারাতে নিঃসন্তান রাজার সন্তান লাভ। পরে সেই সন্তান অন্য রাজকন্যার প্রেমে পড়ে। রাজকন্যা হাতছাড়া হলে তাকে উদ্ধার। উদ্ধারকালীন সময়ে অন্য জনের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। তাকে পাওয়ার পর অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। পরিশেষে সবগুলোকে হত্যা করে একজনকে বহাল করে।

কমলাবতীকে লাভ করতে গিয়ে নিজাম পাগল যেভাবে উজিরজাদাকে হত্যা করল ও রাজকন্যাকে নিয়ে বিদেশে যাত্রা করল, উভয়ই বাস্তব-বিরোধী ঘটনা। উজিরজাদাকে বন্দী করার পূর্বে ঘটনাটি দরবারে বা গোপনে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। তা হয়নি। সুতরাং উজিরজাদাকে বন্দী করার কোন পরিবেশই সৃষ্টি হয়নি। অধিকন্তু বহু দেশ-দেশান্তরে যাত্রা করল রাজকন্যাকে নিয়ে। যাত্রা ছিল ছলে-বলে-কৌশলে। যাত্রা যাই হোক, যাত্রা পথে দুজনের মধ্যে কোন কথাবার্তাও হল না। রাজকন্যার কাছে নিজাম অপরিচিত রয়েই গেল। এটা যেন একটা অভিনয় মাত্র। প্রেমিকা তার প্রেমের জোয়ারে প্রেমিকের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে চলল। অথচ সমগ্র যাত্রাপথে একটি কথাও হলো না। এ যেন সতর্ক পুলিসের হাতে চোর। এই সমস্ত পুস্তকগুলি পড়ে মনে হয় এগুলো

সমাজের বাস্তব ছবি নয়। লেখকের কষ্টকল্পিত কাহিনীমাত্র। তবুও তখনকার দিনে এই সমস্ত পুস্তকের যথেষ্ট কাটতি ছিল। এই জন্যই এদের সাহিত্য মর্যাদা অস্বীকার করা যাবে না। বর্তমান যুগে গদ্য-কবিতা যতজন লেখেন, ততজন পাঠক-পাঠিকা আছে বলে মনে হয় না। তবুও সাহিত্য। এই গদ্য কবিতাগুলো সম্পর্কে ডঃ মোঃ এনামুল হক, ডঃ মোঃ শহীদুল্লাহ, ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমার কাছে ওই রূপই মন্তব্য করেছিলেন। তবে সাহিত্য বলতে দ্বিধা করেননি। কেননা সৃষ্টি যখন সৃষ্টি রূপে টিকে যায়, তখন তা সাহিত্য হয়ে ওঠে। আলোচনা-সমালোচনা পরের কথা। ও-দিনের প্রেমকাহিনীগুলো তাই সে-যুগের সুন্দর সাহিত্য।

ইসলামি বাংলা সাহিত্যের প্রণয়গাথা অধ্যায়ে ওই যুগে বেশ কিছু সংখ্যক প্রেমের কাহিনী পাওয়া যায়। যাদের বর্ণনাভঙ্গি এক, যাদের চরিত্রগুলোও এক। যাদের বিষয়বস্তু এক। কেবলমাত্র বিভিন্ন নামে প্রকাশ পেয়েছে। ওই পুস্তকগুলোর একটি তালিকা দিলাম। বইগুলো সবই পারসিভাষায়।

১। গোলে হরমুজ, অনুবাদক শ্রীহরিমোহন কর্মকার, শ্রীদ্বারকানাথ রায় কর্তৃক সম্পাদিত। কাজী সফিউদ্দিন কর্তৃক সম্পাদিত। কাজী সফীউদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশকাল : ১৭৮১-১৭৮৮ খ্রীঃ।

২। দেওগান্দার পুঁথি, অনুবাদক দাত্রমল্লা, পিতা মোহঃ উজির। সন ১২৬০ সাল, মাহ্ আষাঢ় । রমজান।

৩। তেরছি নেগাহ একটি উর্দু গজলের সঙ্কলন। বইটি বাংলা অক্ষরে লেখা। গান বা গজলগুলো বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন লেখক-লেখিকার দ্বারা বিরচিত। বরভা নিবাসী শ্রীবজলুর রহমান কর্তৃক সংগৃহীত। সং ১৩২২ সাল। পৃ. ২৮

৪। মধুমালতী, রচয়িতা মুহম্মদ কবির। এই বইটির সর্বাপেক্ষা বড় গুণ এর কল্পনা পাঠক পাঠিকার চিত্তকে আঘাত করে না। কল্পনা সীমাকে ছাড়িয়ে যায়নি।

ইসলামি বাংলা সাহিত্যের প্রণয়গাথা অধ্যায়ে এরূপ বহু গ্রন্থ আছে। তখনকার দিনে এরূপ বই লেখা ও পড়া, একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় দেড়শ’ বছর পূর্বের কথা আজ হয়তো চিন্তা করাটাও কঠিন হবে। তবে আজ থেকে আর কিছুদিনের মধ্যে ইসলামি সাহিত্যের এই নব্যধারাটি হয়তো একেবারেই শুকিয়ে যাবে। তখন আর কেউ ভরা গাঙে জোয়ার দেখবে না। তখন হয়তো এমনও হবে, এই নদীর নাম-নিশানাও থাকবে না। কেবলমাত্র দেশের মাটিতে এরূপ ঘটে না। মানুষের মনের মাটিতেও এরূপ ঘটে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক কাহিনী

'রোমান্টিক কাহিনী কাব্যে মুসলমান কবিদের বরাবরই একচ্ছত্রতা ছিল। কিন্তু কাব্যের বিষয় সর্বদা ফারসী সাহিত্যের অনুগত ছিল না।'

—আচার্য সুকুমার সেন

রোমান্টিক কাব্যগুলোর মূলে যে সত্য যে সম্পদ ও যে শক্তি নিহিত আছে, বা থাকা প্রয়োজন, তা প্রেমিক-প্রেমিকার প্রাণের গোপন প্রেমের দুর্বার মিলনাকাঙ্ক্ষা। যে-আকাঙ্ক্ষা ঘটনাস্রোতকে দেয় দুঃসাহসিক অভিযানের অনুপ্রেরণা ও দুর্বার গতিবেগ।

সাগরাভিমুখে মিলন মোহনায় মিলিত হওয়ার জন্য দুই প্রেমের নদী এমনই বেগবান গতিতে ছুটছে, যে কোন অলঙ্ঘনীয় বাধাকেও মানে না। গতিধারাকে করে দুর্বার। অভিমানকে করে দুঃসাহসিক। নায়ক-নায়িকাকে করে উদ্ভ্রান্ত পথিক। তাদের বাধা দিতে পারে না কোন দুর্গম গিরি, কোন কান্তার মরু, কোন দুস্তর পারাবার। সকল অলঙ্ঘনীয়কে তারা লঙ্ঘন করে। এই উদ্যমই তাদের সকল অভিযানের মহাশক্তি মহাসম্পদ। রোমান্স তাই চলতে থাকে বাধার বন্ধনে, কন্টকিত পথের মত কন্টকে এবং ঘটনা ও দুর্ঘটনার নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে। ইসলামি বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক কাহিনীগুলো এদিক দিয়ে সার্থক সৃষ্টি।

কোন অজানার দেশে অসীম সাহসের ওপর ভর করে পাড়ি জমানোর জন্য প্রেম হয়েছে বাহন। আশুক মাশুকের বুকে দিয়েছে প্রচণ্ড গতিবেগ। যেখানে একত্রিত হয়েছে নানা বিপদসঙ্কুল ঘটনারাশি।

'এইসব কাহিনী কাব্যের বিষয় রূপ কথাসুলভ রোমান্টিক গল্পমাত্র, সুতরাং এগুলির বস্তু সুনির্দিষ্ট দেশকালের পরিধির বাইরের।'

—আচার্য সুকুমার সেন।

আলেফ-লায়লা

সাহিত্য কী। মানুষের চিন্তা-ভাবনার সরল ও সহজ প্রকাশ। যে-বহির্প্রকাশকে মানুষ গ্রহণ করে, বিশ্ববরণ করে। যুগে-যুগে দেশে-দেশে এমন দু'-একটি সাহিত্য সৃষ্টি হয় যেগুলো তাদের সৃষ্ট যুগের চাহিদাকে পূরণ করেও পরবর্তী যুগের চাহিদা বা প্রয়োজনকেও মিটিয়ে দেয়। সেগুলোই সর্বযুগের সর্বদেশের সাহিত্য। এই সাহিত্যগুলোই একদিন বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান লাভ করে। আজ পর্যন্ত বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে যারা স্থান লাভ করেছে, 'আলেফ-লায়লা' (সহস্র রাত) তাদের অন্যতম।

'আলেফ-লায়লা' শব্দ দুটি আরবী। এদের অর্থ সহস্ররজনী। এই সুবিশাল গ্রন্থ ঠিক কখন রচিত হয় বা কে রচনা করেন তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। এটা নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিশেষ করে ইংরেজি পারসী ও উর্দু ইত্যাদি ভাষায়। যতদূর জানা যায়, এটা রচিত হয় আব্বাসিয় খেলাফতের প্রথম যুগে। আব্বাসিয় খেলাফতকাল ৭৫০-১২৫৮ খ্রীঃ। আব্বাসীয় যুগের বাগদাদ খলিফা হারুণ-অর-রশিদের খেলাফতকালে (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ) এটা রচিত। এই দিক দিয়ে লায়লা-মজনু এর অপেক্ষা বেশি বয়সের দাবি রাখে। কেননা তার রচনাকাল উমাইয়া খেলাফতকাল ৬৬১-৭৫০ খ্রীঃ।

এই বিশালাকার গ্রন্থটি রচনার মূলে উৎস বা রসদ কী, কোন জিনিস লেখককে সাগরসম সম্পদ দান করেছিল। সেটা ছিল স্ত্রী-জাতির প্রেমজাত প্রতারণা। এই ঝরনা হতেই আলেফ-লায়লা নদী প্রবাহিত। অতঃপর হাজার রাতের কাহিনী তার আপন পথে এগিয়ে গেছে।

বাদশা তাঁর প্রিয়তমা বেগমের বদ্-স্বভাবে খুবই বিরক্ত হয়ে এক রাতে অধিক কোন নারীকে শয্যা পাশে না রাখার প্রতিজ্ঞা করেন। সেইমতো রোজ রজনী শেষে প্রভাতকালে তাঁর এক রাতের সঙ্গীনীদের কোতল করার রেওয়াজ বা প্রথা চালু করেন। একদিন এক উজির কন্যার পালা পড়ে। উজির কন্যা তাঁর এক ছোট বোনকে নিয়ে হাজির হন বাদশার কাছে। রাত্রে শয়নকালে বোনকে রেখে দেন একটু দূরে। এবং বোনকে যেমন শেখান ছিল, সে ঠিক সেইমতো বলে বসল—আমাকে একটি কেচ্ছা শোনাও। বাদশা অনুমতি দিলেন। এক কেচ্ছা শেষ হলে অন্য কেচ্ছা শুরু হয়। রাত্রি শেষে কেচ্ছা অসমাপ্ত রয়ে যায়। এইভাবে বাদশার কেচ্ছা ভাল লাগায় রাতের পর রাত কেচ্ছা চলতে থাকে—হাজার রাত পর্যন্ত।

যে কারণে সহস্র রজনী জন্ম নিল, যে কারণে বাদশা প্রতিজ্ঞা করলেন—প্রতি প্রভাতে শয্যা সঙ্গিনীর প্রাণদণ্ড। তার একটি ফিরিস্তি :

কহে কাজী সাফিওদ্দি লোভেতে পড়িয়া
জোড়ে যদি মূল কেচ্ছা বুঝিতে নারিয়া।
এ কারণে মূল কেচ্ছা কহিতে লাগিল
শহরে ইয়ার বোলে বাদশা এক ছিল।
বড় খুব জুরাত ছিল আওরাত তাহার
পেয়ার করিত খুব বাদসা নামদার।
উপপতি করেছিল সেই যে রমণী
বাদশা জানিয়া তাই মারিল তখনি।
আপসোস করেন বাদশা দিলে এ প্রকারে
প্রাণ সমতুল ভাল বাসিতাম জারে।
আমার রমণী হইয়া করে এয়ছা কাজ
নাবী জাতে বিশ্বাস নাহিক হৈতে আজ।
কে বলে সরলা নারী নাহিক সরল
ছলভরা সর্বদাই হৃদয়ে গরল।
নারীতে জন্মিল ঘৃণা বাদশার অন্তরে
করিল কারবার সাহা এরূপ প্রকারে
রোজ এক রূপসিকে বিবাহ করিব
সারা রাত রেখে তাবে বিহানে মারিব।
সেইমত জাহাপনা করিতে লাগিল
কতশত রূপসীর পরাণ বাধিল।
সে-বাদশার উজিরের ছিল একটি বেটি
অতিশয় রূপবতী গুণে সরস্বতী।
দুনিয়াজাদ নামে ছোট বোন তাহার
বিবাহের রাত্রে সাথে লয় আপনার।
বহিনকে হেকমতের বাত শিখাইয়া
পালঙ্কে সাহার জেরে রহিল সুইয়া।
বহিনকে সেই ঘরের পালঙ্ক ছায়ানে
সোয়াইল বিচ তক্তাপোষ দরমিয়ানে।

বাদশা আসিয়া যবে শয়ন করিল
দুনিয়াজাদী শিক্ষামত কাঁদিতে লাগিল।
সহরে ইহার পুছিলেন ইয়ার জাদিরে
কান্দেন বহিন তেরা কিসের খাতিরে।
জদি মোরে হুকুম দেয় বাদশা নামদারে
আজাএব কেচ্ছা এমন সোনাই তোমারে।
বাদশাবি খেয়াল করে শুনিতে লাগিল
অর্ধেক বলিতে কেচ্ছা রাত পোহাইল।
বহুত পছন্দ সাহা করিল কেচ্ছারে
এরাদা করিল পুরা শুনিবার তরে।
এইরূপে কেচ্ছা সাঙ্গ না হইতে তাহাই
সে কেচ্ছার মধ্যে কেচ্ছা দোছরা জোগায়।

হাজার কাহিনী আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দু'-একটি কাহিনী ভূমিকা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে গাধা ও বলদের কাহিনী এবং রাখাল বালকের কাহিনী অন্যতম।

গাধা ও বলদের কাহিনী

আরব দেশে এক সওদাগর ছিলেন। তাঁর বহু ধনরত্ন ছিল। গরু-মহিষ, ঘোড়া-গাধা, ছাগল-ভেড়া, কুকুর-বিড়াল আরও বহু পশু-পক্ষী ছিল। সওদাগর নিজে পশুপক্ষীর কথা বুঝত। একদিন সওদাগর বসে আছে। তখন বলদ ও গাধা কথাবার্তা বলছে। বলদ গাধাকে বলল, ভাই গাধা, খেটে খেটে মরে গেলাম। কী করি, তুমি আমাকে বুদ্ধি দাও। তখন গাধা তাকে বলল—সে যেন অসুখের ভান করে খাওয়া বন্ধ করে এবং কম খায়। বলদ তাই করল। তখন সওদাগর তার মুনিষকে নির্দেশ দিল আগামীকাল থেকে ওই গাধাটাকে লাঙলে জুড়তে। নির্দেশমতো গাধাকে লাঙল টানতে জোড়া হলো। দুদিনের মধ্যেই গাধার অবস্থা একেবারেই কাহিল। সে বলদকে জিজ্ঞাসা করলো, বলদ এখন কেমন আছে। বলদ বলল—খুবই ভাল। এবার গাধা চিন্তা করল, যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে তার অবস্থা বড়ই কঠিন হয়ে যাবে। সে আর বাঁচবে না। তখন সে মনে মনে স্থির করল কিছু একটা করতে হবে এবং তাই করল। গাধা বলদকে বলল—'ভাই বলদ, আমি তো খেটেখুটে বেঁচে আছি। কিন্তু তোমার সম্পর্কে যে কথা শুনলাম, তাতে আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। সওদাগর আজ বলছে, বলদটাকে আর কত বসে বসে খাওয়াব। কাল ওকে কসাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেব। সে ওকে জবাই করে আমাকে কিছু টাকা দেবে।' একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ধড়ফড় করে উঠে পড়ল বলদ। অসুস্থ বলদ সুস্থ হয়ে গেল। গাধা এ যাত্রা নিষ্কৃতি পেল। বলদ আবার হাল-চাষ করতে আরম্ভ করল।

কুকুর ও মোরগের কাহিনী

সওদাগর গাধা ও বলদের কথাবার্তা শুনে হাসছিল। এমন সময় বেগম সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করল, সে হাসছে কেন? তখন সওদাগর উত্তরে বলল—জীব-জন্তুদের কথা শুনে। তখন বেগম বলল—সে কী করে পশুপক্ষীদের কথা বোঝে, এ ভেদরহস্য তাকে জানাতে হবে। তখন সওদাগর বলল—ও কথা বললে সে মারা যাবে। কিন্তু বেগম নাছোড়বান্দা। সে না জেনে ছাড়বে না। সওদাগর তখন ভীষণ বিপদে পড়ল। হতাশায় চুপ করে বসে পড়ল। কুকুর প্রভুর এই মনস্তাপ বুঝতে পারল। সে মোরগকে বলল, মোরগ বড়ই বেইমান। তার প্রভু জীবন-মরণ সমস্যায় জর্জরিত। আর সে একশো মুরগী নিয়ে নিত্য আমোদে মগ্ন। তখন মোরগ কুকুরকে বলল—তার প্রভু একটি নাদান

কাপুরুষ। সে তার একজন মাত্র বেগমকে ঠিক রাখতে পারছে না। আর মোরগ তার একশো স্ত্রী-মুরগিকে একাই ঠিক রেখেছে। তখন কুকুর জিজ্ঞাসা করল কি করতে হবে? তখন মোরগ বলল—কিছুই করতে হবে না। সওদাগর কেবলমাত্র একটি লাঠি হাতে অন্দরমহলে ঢুকবে এবং একটু এদিক-ওদিক দেখা মাত্রই ঠেঙাতে আরম্ভ করতে হবে। সওদাগর মোরগের বুদ্ধি নিয়ে শান্তি পেল।

রাখাল বালকের কাহিনী

একদিন এক রাখাল বালক তার বহু দিনের তিলে তিলে জমানো ঘি দ্বারা একটি ভাঁড় পূর্ণ করল। মনের আনন্দে ঘিয়ের ভাঁড়টিকে মাথার উপরে ঝুলিয়ে রাখল। একদিন এক সন্ধ্যায় সে ওই ভাঁড়টির দিকে লক্ষ্য করে নানারূপ আশার জাল বুনতে থাকল। সে ভাবতে থাকল সে তার ওই ঘি ভাঁড়টি নিয়ে বাজার বিক্রি করবে। এবং বহু টাকা পাবে। এবং ওই টাকার দ্বারা আরও বহু গরু-ছাগল কিনবে। তখন সে আরও ঘিয়ের মালিক হবে। এবং আরও অনেক টাকা পয়সা হবে। তখন সে একটি রাজপ্রাসাদ তৈরি করবে। যাকে দেখে অনেক রাজকন্যা তাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দেবে। তখন সে এক পরমাসুন্দরীকে বিয়ে করবে। সুন্দরী তার কথা না শুনলে সে তাকে ধমক দেবে। তাতেও কাজ না হলে সে তার হাতের লাঠিটি দিয়ে তাকে প্রহার করবে। কেমন করে প্রহার করবে। তার মহড়া দিতে গিয়ে হাতের লাঠিটিকে মাথার উপর ঘুরিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ঘিয়ের ভাঁড়টি ভেঙে চুরমার হয়ে তার মাথা ও শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। রাখাল বালকের দিবাস্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। মানুষের আশাবাদী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অতিরিক্ত কোন জিনিসই ভাল নয়। আলেফ লায়লার অধিকাংশ কাহিনীই নারী-কেন্দ্রিক। কিন্তু সবগুলি নয়।

প্রসঙ্গ

ইসলামি বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক অধ্যায়ে আলেফ-লায়লার স্থান অতি ব্যাপক। আলেফ-লায়লা বিশ্বসাহিত্যের এক বিরাট কৃতী। যে ক্ষণজন্মা প্রতিভা এর জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি তুলনাহীন। কিন্তু যাঁরা এর অনুবাদ করেছেন, তাঁরা সে রূপ কিছু নন। যেমন রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃত স্বাদ-নিছক অনুবাদে পাওয়া সহজ নয়।

তবে আলেফ-লায়লার অনুবাদ যেমনই হোক, সে যে সারা বিশ্বে সাড়া জাগিয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সুদূর আরবের সৃষ্টি, সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা বাংলার ঘরে ঘরে অসংখ্য আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে আনন্দ দিল, মোহাভিভূত করল, এ কি কম কথা! পরবর্তীকালে খুব কম সাহিত্যেই এরূপ কালজয়ী সাড়া জাগাতে পেরেছে। আগত ও অনাগত কালের এ যেন এক ক্ষণজন্মা সৃষ্টি।

এই বিশালাকার গ্রন্থে নারী চরিত্রকে যেভাবে দেখানো হয়েছে, তা বিশেষ সুবিধার নয়। নারী চরিত্র এত নিন্দনীয় হওয়ার পিছনে নারীর যত দোষ আছে, তা অপেক্ষা শতাধিক দোষ আছে তদানিন্তন পুরুষকুলের। তখনকার পুরুষকুল নারীকে কেবলমাত্র ভোগ্যবস্তু ব্যতীত আর কিছুই চিন্তা করেনি। একটি নিছক ভোগ্যবস্তু ত্যাগ-তিতিক্ষার কি মহিমা তুলে ধরতে পারে। নিজে মহানুভব না হয়ে বারবার অপরের কাছ থেকে মহানুভবতা কামনা করাটাও তো কেবল অন্যায় নয়, পাপও। মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ) বলেন—'অপরের কাছে তুমি যে ব্যবহার কামনা কর, তুমি সেই ব্যবহার আগে প্রয়োগ করো।'

হোক তব ব্যবহার মানব সমাজে
যেরূপ পাইলে তুমি খুশি হও নিজে।

ইসলাম নারী জাতিকে যে চোখে দেখেছে, মুসলমানগণ আজিও সেই চোখে দেখতে পারে নি। স্বয়ং মহানবীজী (দঃ) নারীজাতিকে যতটা তুলে গেলেন, তার পর আর একচুলও উন্নতি হয়নি। বরং

প্রকারান্তে নানা ঘোর-প্যাঁচে নামানো হয়েছে। উমাইয়া হতে আব্বাসিয়া যুগ পর্যন্ত আমরা তাই দেখতে পাই।

পুরুষকুলের অধিকাংশের একটি বদ্ধ ধারণা, নারীকে বা স্ত্রীকে সতীবালা হতেই হবে। কিন্তু পুরুষ মহাশয় যা হবেন, তাই হোন, তাতে কোন ক্ষতি নেই। এ চিন্তা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক।

শুধাই নিজেরে কি হে
হবে যেই পতি
সেই মন, সেই প্রাণ
সে কতটা সতী।

পারস্য উপন্যাস

ইসলামি বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক অধ্যায়ে যে সমস্ত পুঁথি বের হয়েছে, পারস্য উপন্যাস তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরাধিপতি, নাম তওঙ্গরনবি। বাদশার এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম ফোরখরাজ, কন্যার নাম ফরোখনাজ। কন্যা ভরা যৌবনে পদার্পণ করলে তার অতিশয় রূপ-লাবণ্যের কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন দেশ-বিদেশ থেকে কন্যার পানি ভিক্ষা করে রাজপুত্রগণের পত্র আসে।

একদিন সিন্ধু অধিপতি বাদশাকে পত্রে জানালেন যে তাঁর পুত্র ফরোখনাজের প্রেমে পাগল। সুতরাং তিনি ফরোখনাজকে পুত্রবধূ করতে চান। যদি বাদশা রাজি থাকেন, তাহলে কোন কথাই নেই। নতুবা সিন্ধু অধিপতি জোর করে ছেলের বিয়ে দিয়ে তাঁর কন্যাকে তুলে আনবেন।

এরূপ পত্রপাঠে কাশ্মীররাজ ভীষণ চটে গেলেন। এবং নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন। অন্দর মহলে গেলেন। রাণীকে সব কথা খুলে বললেন। রাণী বললেন—এ তো বড় অন্যায় কথা। তাঁরা মেয়ের বিয়ে কোথায় দেবেন, না দেবেন সেটা তাঁদের ব্যাপার। অধিকন্তু মেয়েরও মতামত নিতে হবে। তবে যাই হোক, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। নচেৎ দু-কুলই যাবে। কেননা সিন্ধুরাজ শক্তিধর সম্রাট। তাঁর সঙ্গে তাঁরা পারবেন না। অবশেষে বাস্তবকে মেনে নিয়ে রাজা-রানী বিয়েতে সম্মত হলেন। এবার মেয়ের মতামত জানতে চাইলেন। মেয়ে জানিয়ে দিল, সে বিয়েই করবে না।

তখন রাজারানী ধাত্রীমার দ্বারা কারণ জানতে চাইলেন। ধাত্রী জানতে পারল দুটো কারণ—(১) রাজকন্যা প্রায় শিকারে যেতেন। কন্যার রূপ-লাবণ্য দেখার জন্য পথিপার্শ্বে বহু পুরুষের ভিড় হত। এমনকি অনেকে ভিড়ের চাপে মারাও যেত। তখন রাজা কন্যার শিকারে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। এতে পুরুষ জাতির প্রতি কন্যার খুবই ঘৃণা জন্মাল। (২) একদিন কন্যা স্বপ্নে দেখে এক হরিণ জালে পড়েছে। বহু চেষ্টা করেও বের হতে পারল না। অবশেষে এক হরিণী এসে তাকে জাল থেকে মুক্ত করল। কিন্তু তাকে মুক্ত করার সময় হরিণী নিজেই জালে জড়িয়ে পড়ে। কিছুতেই বের হতে পারছে না। তখন হরিণীর এই বিপদকালে হরিণ একবারও পেছনে না তাকিয়ে তাকে ফেলে পালিয়ে গেল। এ ঘটনা থেকে রাজকন্যার মনে সমগ্র পুরুষজাতি সম্পর্কে একটি তীব্র বিষাক্ত ও বিরূপ মনোভাব জেগে ওঠে।

এবার রাজা ধাত্রীমাতাকে রাজকন্যার মনোভাব পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা চালাতে বললেন। ধাত্রী মা রাজকন্যাকে একের পর এক করে হাজার কেচ্ছা শোনাল। যে কেচ্ছা গুলিতে পুরুষ চরিত্রের যথেষ্ট গুণগান ছিল। এইভাবে রাজকন্যার মতের পরিবর্তন হল। সে বিয়ে করতে রাজি হল। বিয়ে হল পারস্য রাজপুত্র ফারকচাঁদের সঙ্গে। উভয় উভয়কেই পূর্বে স্বপ্নে দেখেছিল।

সন ১৩১৭ সাল, পৃষ্ঠা ৭৩৪। অনুবাদক : হবিবুল হোসেন ও আয়াজুদ্দীন আহম্মদ।

পুঁথির মধ্যে বিশেষ বিশেষ কাহিনীর মধ্যে আবুল কাসেমের কথা, চীন-পতি ও চিত্রস্থানী রাজকন্যার কথা, কাউলফ ও দেলারার কথা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজা বদরুদ্দিন ও তাঁর বিমর্ষ মন্ত্রীর কথাও উল্লেখযোগ্য।

আবুল কাশেম যেন শুনতে পাচ্ছে, কে যেন তার পাশে দাঁড়িয়ে বলছে ঃ

কোথা সেইজন, জানে কোন জন
যে মানুষ তরে, এই দেহের সৃজন।
কোথা সেই জন, যারে চায় মন
জীবন যৌবন করিতে অর্পণ।

প্রসঙ্গ আলোচনা :

পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন পারস্য উপন্যাস। সে যুগের সৃজনীশক্তির অধিকারীগণের এটি অমরকৃতী।

তখনকার দিনে শক্তিধর রাজাবাদশাগণ কোন পরমা সুন্দরীর নাম শুনলেই তাকে শয্যা-সঙ্গিনী করার প্রত্যাশায় লোভের ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিতেন। এ নিয়ে হানাহানি-খুনোখুনিরও শেষ থাকত না। বর্তমান জীবজগতে যেটা লক্ষ্য করি, একটি মাদি প্রাণীকে পেতে অসংখ্য মদাপশুর প্রাণান্তযুদ্ধ। বনে বাঘ-সিংহ, হাতি ও গণ্ডারের মধ্যে যে যুদ্ধ অনেক সময় একে অন্যকে প্রাণেও বধ করে ফেলে। রাজ-বাদশাদের মধ্যেও ওই বীভৎস যুদ্ধের প্রচলন ছিল। পারস্য উপন্যাসের পটভূমিকা তারই একটি দূর স্মৃতি। তবে রক্ষে, এখানে যুদ্ধটি বাধেনি। রানীর সুবুদ্ধিতে রাজা সম্মত হয়েছিলেন।

আমরা ভালভাবেই লক্ষ্য করেছি যে আলেফ- লায়লা রচিত হওয়ার মূলে যে কারণটি দেখানো হয়েছে, তা নারীর চরিত্রভ্রষ্টতা। যার জন্য রাজা প্রত্যহ একজন রাণী বলি দিতেন। এই মহা গ্রন্থে নারী চরিত্রকে তুলোধুনা করা হল। এবার পারস্য উপন্যাসে লক্ষ্য করছি ওই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। রাজকুমারী বিবাহ করতে রাজি ছিলেন না পুরুষ চরিত্রের নোংরামি, হেংলাপনা ও বেইমানী ইত্যাদি কারণে। রাজকুমারীর মন থেকে পুরুষ সম্পর্কে এই বদ্-ধারণাকে দূরীভূত করার জন্য ধাত্রীমা যে হাজার কাহিনীর অবতারণা করলেন, সেখানে পুরুষ চরিত্রের মহিমাকীর্তন সজোরে এবং সুকৌশলে ঘোষিত হল। তাহলে আমরা সর্বশেষে কি লক্ষ্য করলাম। বিখ্যাত আলেফ-লায়লা নারী-চরিত্রকে ভ্রষ্টা আখ্যা দিয়ে তুলোধনা করল। এবং পারস্য উপন্যাস নানা কাহিনীর মাধ্যমে নরচরিত্রকে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের পাশে বসিয়ে দিল। তাহলে মায়ের জাতি, বোনের জাতি নারী জাতি সম্পর্কে সেদিনের স্বনামধন্য লেখকগণের সাধারণ প্রবণতা কি ছিল, এককথায় নারী-বিদ্বেষী মনোভাব ও চিন্তাধারা।

সকল যুগের সকল মানুষকে স্বীকার করতেই হবে, নর-নারী দুই-ই দোষে-গুণে সৃষ্ট। কেউই একাকী কেবলমাত্র দোষে বা কেবলমাত্র গুণে সৃষ্ট নয়। যুগের হাওয়া যাই বলুক, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, পুরুষ-রমণী, নর-নারী সকলেই একই স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলের অভিন্ন বস্তুর ভিন্ন নাম। আমি এখানে অবাক বিস্ময় বোধ করি যে, ইসলামের আগমনের ও মহানবীজীর (দঃ) আবির্ভাবের পরও কী করে মুসলিম দুনিয়া ওইরূপ চিন্তা করল।

সমাজ-পাখী

পুরুষ-রমণী সমাজপাখি
ইসলামের হুঁশিয়ার
একটি ডানায় নাহি থাকে বল
আকাশেতে উড়িবার।

যুবক-যুবতী ভেদাভেদ নাই
উন্নত পরিবার
উভয়েরই শ্রম সাধনার দ্বারা
গড়িবে এ সংসার।
এক যদি হয় মহীয়ান তবে
অন্য সে মহীয়সী
এক যদি হয় গরীয়ান তবে
অন্য সে গরীয়সী।
এক যদি হয় ভ্রষ্টা নারী
পাশে ভ্রষ্ট নর।
তাকে ভ্রষ্টা করিল যেজন
সে কি পুণ্যধর?
এক যদি হয় চরিত্রহীনা
পাশে চরিত্রহীন
উভয়ই তারা একসঙ্গেই
বেয়াদব-বেদ্বীন।
—কাব্যকানন

কোরয়ান—সূরা নিসা ৪ : ৩৪

দৌলত কাজী ও আলাওল (আরাকান রাজসভার দুই মহাকবি)

পাঠান রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী গৌড় দরবারের নির্বাপিত দীপশিখা যে কয়েকটি স্থানে উষার আলোকে নবীন রাগে জ্বলে উঠলো—কামতা, কামরূপে, ত্রিপুরায় দরঙ্গ কাছাড়ে, ছাঁটিগাঁ রোসাঙ্গে, মল্লভূম-ধলভূমে। গৌড়ের হোসেন শাহের ইতিহাসকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের আদি কাণ্ডটিকেই বাদ দিতে হয়। বাংলা সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পেল যাঁর দ্বারা, তিনি হোসেন শাহ। সুতরাং হোসেন শাহের দরবার যে বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উর্বর বীজতলাতে পরিণত হয়েছিল, এতে কোন সন্দেহ নাই।

এই বীজতলার বীজই পরে গিয়ে রোপিত হয় হোসেন শাহের প্রতিরাজ লসকর পরাগল খান ও তাঁর পুত্র নুসরৎ খান কর্তৃক চাটিগায়ে ও রোসাঙ্গে অর্থাৎ আরাকান রাজসভায়। তবে আরাকান রাজসভায় সংস্কৃতির এই বীজ যেভাবে কার্যকরী হয়েছিল, গৌড়ে তা হয়নি। তার একমাত্র কারণ, আরাকানরাজ তাঁর শস্যখেতে ফসল ফলাবার জন্য যে দুইজন অসাধারণ কৃষক পেয়েছিলেন, গৌড়রাজ তা পাননি। এই কৃষক দু'জন বাংলা সাহিত্যের দিকপাল মহাকবি দৌলত কাজী ও মহাকবি আলাওল। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গৌড়রাজ হোসেন শাহ যদি বীজ বুনে না যেতেন, তাহলে আরাকানরাজের ওই সবুজ শালবনে সোনার খেত দেখা দিত কিনা, কে জানে!

আরাকান রাজসভার রোমান্টিক কাব্যধারার দুজন মহাকবি, দৌলত কাজী ও আলাওল। দৌলত কাজীর কবিকৃতি 'লোরচন্দ্রাণী' অসমাপ্ত। রোসাঙ্গের রাজা শ্রীসুধর্মার উজির আশরফ খানের অনুরোধে কবি মূল হিন্দি অনুসরণ করে কাব্য আরম্ভ করেছিলেন। শ্রীসুধর্মার রাজত্বকাল ১৬২২-১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দ। কাব্যের রচনাকালও তাই। কাব্য সমাপ্ত হবার পূর্বেই কবি মারা যান। তখন আলাওল তা সমাপ্ত করেন। অনেকেই মনে করেন দৌলত কাজী বাঙ্গালী মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এমনকি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী কবিদের মধ্যে তিনিও একজন।

আলাওল :

দৌলতকাজী 'লোরচন্দ্রাণী' কাব্য অসমাপ্ত রেখে গেলেন। আলাওল তা সমাপ্ত করেন। দৌলত কাজী কাজ আরম্ভ করেছিলেন শ্রীসুধর্মার রাজত্বকালে আশরফ খানের অনুরোধে। তিনি মারা গেলেন। তিনজন নৃপতিও পেরিয়ে যান। পরে আসেন শ্রীচন্দ্র সুধর্মা। তাঁর লস্কর উজির সোলেমানের অনুরোধে আলাওল লোরচন্দ্রাণীর কাজ শেষ করেন।

এ সকল শেষ কথা অসাঙ্গ রহিল
সুধর্মার শেষে তিন নৃপতি চলি গেল।
তবে পুনঃ রাজ্যের হইল ভাগ্যোদয়
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম সে নৃপ মহাশয়।
এতেক ভাবিয়া ছোলেমান মহামতি
হরষিতে আদেশ করিলা আমা প্রতি।
এই খণ্ড পুস্তক পুরাও মোর নামে
দুগ্ধ মধু আনিয়া মিলাও এক ঠামে।

সোলেমানের অনুরোধে আলাওল ফার্সী ধর্মনিবন্ধ তোহফার অনুবাদ করেন। ১০৭৩ হিজরী, ১৬৬০ খ্রীঃ। দৌলত কাজী যেমন আশরফের অনুরোধে লোরচন্দ্রাণী অনুবাদ করেছিলেন। আলাওল তেমনই মাগন ঠাকুরের অনুরোধে জায়সীর পদ্মাবতী অনুবাদ করেছিলেন। আলাওলই সর্বপ্রথম বাংলা

সাহিত্যে বিশুদ্ধ ইসলামি ভাবের প্রণয়ন করেন। তিনি আরবী-ফার্সী বহু ধর্মগ্রন্থেরও অনুবাদ করেন। অন্য কোন কবিই এত বইয়ের অনুবাদ করেননি। তিনি শুধু মহাকবিই ছিলেন না। একজন বিখ্যাত ভাষাবিদও ছিলেন। বাংলা-সংস্কৃত, আরবী-ফার্সী, উর্দু-হিন্দি প্রভৃতি ভাষাতে তাঁর দখল ছিল অসাধারণ।

দুই মহাকবির মধ্যে তুলনা :

দু'জনেই ছিলেন রোসাঙ্গের রাজকবি। দু'জনেই ছিলেন মহাকবি। দু'জনেই মহাপণ্ডিত। দু'জনেই সূফী সাধক কবি। দুজনেই ভাষাবিদ। দুজনেই অনুবাদক।

এই দু'জন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন সাড়া তোলে। দৌলত কাজী কাব্যকলার নিকষে আলাওল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েও মুসলিম সমাজে বা সর্বসাধারণের মধ্যে আলাওলের নামটাই বড় আকারে দেখা দিল কেন? এর দুটো প্রধান কারণ লক্ষ্য করি। প্রথমটি, দৌলত কাজীর কাজ খুবই কম। সেখানে আলাওলের কাজ প্রভূত। দ্বিতীয়টি, দৌলত কাজী তাঁর সৃষ্টজগতে আবশ্যক-অনাবশ্যক কোন রকমেরই ইসলামি গন্ধ আনেননি। সেখানে আলাওল তাঁর সৃষ্টজগতে আবশ্যক ইসলামি গন্ধ আনতে দ্বিধাবোধ করেননি। যার ফলে মুসলিম সমাজে আলাওল কবিকুলের মাথার তাজ। আধুনিক কবি নজরুল ইসলামও আলাওলের পথ অনুসরণ করেই মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় কবির মর্যাদা লাভ করলেন। তিনি বলেন—

'আল্লাহ্ নামের বীজ বুনেছি
আমার হৃদয় মাঠে
ফলবে ফসল তুলব আমি
কিয়ামতের হাটে।'

দৌলত কাজী যেখানে গীতি কবি, আলাওল সেখানে কাব্যকথক। আলাওলের আবেদন সর্বসাধারণকেও আকৃষ্ট করেছে। তাই পরবর্তী যুগে তাঁদের স্মৃতিচারণ শোনা যায়।

'আলাওলের চণ্ডীদাসের কণ্ঠ কোথায় বাজে রে
সেই আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরই বাংলা রে।'

আলাওলের জীবনকাল (১৬০৭-১৬৮০ খ্রীঃ) ঃ

আজ থেকে প্রায় চারশ' বছর পূর্বে মহাকবি আলাওল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবন সুখে-দুঃখে জড়ানো ছিল। মহাকবি ফেরদৌসী আলবেরুনী ও সাদীর জীবনও এইরূপ ছিল। আলাওল ছিলেন ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের অমাত্যপুত্র। কোন একসময় পিতা-পুত্রে জল-পথে যাচ্ছিলেন। নৌকায় ডাকাত পড়ে। পিতা প্রাণ হারান। পুত্র বন্দী রূপে রোসাঙ্গের ফৌজ দলে বিক্রিত হন। মহাকবি সাদীর জীবনেও এরূপই ঘটেছিল। পরে মহাকবি সাদী তাঁর আপন প্রতিভা বলে দিন-মজুরের কাজ হতে মুক্তি পান। আলাওলও অনুরূপভাবেই ছাড়া পান। এবং রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মার মহাপাত্র সোলেমানের পরিষদে স্থান লাভ করেন। পরে তাঁরই অনুরোধে লোরচন্দ্রাণী সমাপ্ত করেন। তোহফার অনুবাদ করেন। পদ্মাবতীরও অনুবাদ করেন। অতঃপর মাগন ঠাকুরের অনুরোধে ফার্সী আখ্যায়িকা কাব্য 'সয়ফুল-মুলুক বদিউজ্জামান'-এর অনুবাদ আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে মাগন ঠাকুরের মৃত্যুতে কাজে বাধা পড়ে। এবার কবি শ্রীচন্দ্র সুধর্মার প্রধান সেনাপতি মোহ মূসার আশ্রয় পেলেন। মূসার অনুরোধে ফার্সী কাব্য 'হপ্ত পয়কর'ও অনুবাদ করেন।

তখন শাহ-শুজা আরাকান দরবারে আশ্রয়প্রার্থী। শুজা ও আলাওলের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। শুজার প্রাণদণ্ড হল। এবার কবি পড়লেন রাজ-রোষে। কেবলমাত্র শুজার বন্ধু বলেই। কবির তখন মহাদুর্দিন। এই দুঃসময়ে কবিকে আশ্রয় দিলেন শ্রীচন্দ্র সুধর্মার প্রধান আমাত্য সৈয়দ মূসা। মূসার অনুরোধেই তিনি সয়ফুল মুলকের অনুবাদ কাজ সমাপ্ত করেন। অতঃপর কবি গেলেন মজলিস নবরাজের সভায়।

নবরাজ কবিকে অনুরোধ করলেন 'সেকেন্দারনামা' অনুবাদ করতে। কবির সমস্ত দায়ভার তিনি গ্রহণ করায় কবি বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন।

আলাওল-গ্রন্থমালা

সোলেমানের অনুরোধে— ১। লোকচন্দ্রাণী, হিন্দি, সন ১২৪১ (?)
" ২। তোহ্ফা, ফার্সী, ১৬৬০, ১৬৬২, ৬৪
মাগন ঠাকুরের অনুরোধে—৩। পদ্মাবতী, হিন্দি, ১৬৪১ খ্রীঃ
" ৪। সয়ফুলমুলুক, ফার্সী, ১৬৫৯-৬৯
সৈয়দ মুসার অনুরোধে— ৫। ওই সমাপ্তকরণ
" ৬। দারা সেকান্দারনামা-ফার্সী ১৬৭০
মহম্মদ মূসার অনুরোধ— ৭। হপ্ত-পয়কর,, ১৬৬০

আলাওলের বিখ্যাত পদাবলীগানের নমুনা

আহা মোর বিদরে পরাণ
জাগিতে স্বপনে দেখি ভূমে নাহি আন।
কি জানি লিখিছে বিধি এ পাপ করমে
পাইয়া পরশমণি হারাইলু ভ্রমে।
সে সব মনের দুঃখ কাহাকে কহিব।
ব্যথিত বান্ধবকুল স্মরিতে মরিব।
যুদের অধিক যায় দুঃখে নিশিদিন
কেমনে সহিব প্রাণে জলহীন মীন
কি লাগি দারুণ জীউ আছে মোর ঘটে
কঠিন পাষাণ হিয়া এ দুঃখে না ফাটে।
মহন্ত সৈয়দ মূসা জ্ঞানেতে কুশল
বিরহ বেদনা গাহে হীন আলাওল।

গল্প সংক্ষেপ :

লোরক-রাজ নামক এক সম্রাট তাঁর রাণী ময়নাবতীকে নিয়ে সুখে রাজত্ব করছিলেন। হঠাৎ তিনি কানন বিহারে বের হলেন। রাজপাট রাণীর হাতে থাকল। গোহারী রাজ্যে পৌছলেন। সেখানে রাজার এক দুহিতার নাম চন্দ্রাণী। সেই রূপসী চন্দ্রাণীকে বহু কষ্টে লাভ করেন। মিলন হয়। বাচ্চা হয়। বাচ্চার নাম প্রচণ্ডতপন। পরিশেষে লোরক চন্দ্রাণীকে নিয়ে আপন রাজ্যে ফেরার সময় পুত্রকে রাজ্যপাট বুঝিয়ে দেন। এবং চন্দ্রাণীকে নিয়ে আপন রাজ্যে ফিরে দুই রানী চন্দ্রাণী ও ময়নাবতীকে নিয়ে সুখে রাজ্য পরিচালনা করেন। রাজা মারা গেলে দুই রাণীও সহমরণে গেলেন।

সাহিত্যকলার নিকষে দুই মহাকবির সাহিত্য নমুনা :
মহাকবি দৌলত কাজী :

রাজার কুমারী এক নামে ময়নাবতী
ভুবন বিজয় যেন জগৎ পার্বতী।...
কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ
অঙ্গের লীলায় যেন বিঁধিছে অনঙ্গ।

কাঞ্চন কমল মুখ পূর্ণশশী নিন্দে
অসম্মানে জলেতে প্রবেশে অরবিন্দে।...
সর্বকলা যুতা সতী নূতন যৌবন
স্বামীর লোরক নাম নৃপতি নন্দন।
দুইজনে তুলে চিত্তে প্রেমের মকুল
তিলেক বিচ্ছেদ হৈলে দোহান আকুল।...
যুবক পুরুষ জাতি নিঠুর দুরান্ত
এক পুষ্পে জান মধুকর নহে শান্ত।
আচম্বিতে মতি হৈল লোরক নৃপতি
ছাড়িয়া রতন হার গুচ্ছাতে আরতি।
রাজ্যপাট সমর্পিল মহাদেবী স্থান
চলি গেল নরপতি মঙ্গল বিধান।

লোরকরাজের চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলন :

করে ধরি কোলে করি বৈসায় কুমার
প্রথম দর্শনে দোহ আনন্দ অপার।...
প্রথম মদন কোল ঘন আলিঙ্গন
কামযুদ্ধে ভয় লজ্জা ধর্ম পলায়ন।
দন্তে দন্তে ঘরশন বদনে-বদন
পুলকে পুরুষ তনু সঘন চুম্বন।
পয়োধর গিব্বা ধরি ঘন বাহু তারি
রতিযুদ্ধে দুই মত্তে যেন গড়াগড়ি।
দোঁহ মত্ত হৈয়ে করে বিবিধ সন্ধান
অধরে অধর দোহে করে মধুপান।
বেগবান নদ যেন বক্ষে বয়ে যায়
বেগবতী নদী যেন সমস্ত বিলায়।
উভযে উভয় জনে কুরিয়া ভজন
নিশিযুদ্ধে নিরস্ত হইল দুইজন।

বিরহ জ্বালায় ময়নাবতীর ক্ষোভ :

যৌবন চলিয়া গেলে বিফল জীবন
সংসার নরক যার নাহিক যৌবন।
ধন নষ্ট হৈলে গুণী উপার্জনে পায়
অগ্নি শেষ হৈলে গুণী পাথরে জন্মায়।
চন্দ্র সূর্য অস্তাঙ্গিতে পুনি উগী যায়
যৌবন চলিয়া গেলে পালটি না পায়।
মহানন্দ আসে যেথা এই খেলা খেলি
ধর্মশাস্ত্র বহির্ভূত নহে কামকেলি।

মহাকবি আলাওল :

মোহরা রাজ্যেতেলোর ...   চন্দ্রাণী পীরিতে ভোর
কেলী কলা আনন্দে রহিলা
আদ্য নারী ময়নাবতী...   ইষ্ট মিত্র বন্ধুজাতি
চিত্ত হস্তে সব পাসরিলা।...
কেলী কলা বিদগদ... দোহরসে বিশারদ
নিশি নিশি আনন্দে সুরতি
যুবক যুবতী মেলা...   খেলিতে মদন খেলা
চন্দ্রাণী হইল গর্ভবতী।
দশ মাস দশ দিন হৈল উপাসন
সুভক্ষণে প্রসবিল কুমার রতন।
দানে মানে সন্তোষ হইল বিপ্রগণ
কুমারের নাম রইলা প্রচণ্ডতপন।

এবার লোরকরাজ আপন দেশে রওনা হলেন। এবং বহুদিন পরে ময়নাবতীর সঙ্গে মিলন ঃ

যথা তথা সখিগণ নিয়মে রহিলা
ময়নারে নৃপতি ধরি শয্যা পরে নিলা।
ময়না বলে কেন আজ এতেক আদর
কোথা ছিল এত দয়া এতেক বৎসর।...
আর যদি কোন স্থানে তোমা এরি যাই
তবে যোগ্য শাস্তি দিও রসবতী রাই।
এ বলিয়া নৃপতি উরুতে দিলা কর
কমলের পাত্র যেন পূজিল শঙ্কর।
দোহ অঙ্গ পুলক হৈল পরশনে
হৃদয় সন্তোষ হৈল গাঢ় আলিঙ্গনে।
ক্ষেণে কভু চুম্বনে, ক্ষেনে কভু চেঁটে
যেন দুই মল্লযুদ্ধ করে উলটে-পালটে।
ক্ষণে ক্ষণে চাপি রয় সঘন কম্পন
বাজপাখি ধরে নখে শিকার মতন।
ধরিয়া হাতেতে গ্রীবা ভেদিল রসপুরে
গ্রহিয়া চিবুক কুচ্ চুম্বয় অধরে।
কুচ কণ্ঠ গ্রীবা ধরি কটি রসস্থলি
ফিরয়ে নিতম্ব উরু নিম্নে কমলি।
করেতে যুগল মাই উচ্চ কুচানন
প্রেমের কঠিন স্পর্শে অস্থির বদন।
কামমদে কামতাপে ভুঞ্জিতে রতিকলা
বহুদিন অনভ্যাসে কাতরিতে বালা।
প্রীতির আস্বাদে যখন প্রেমেতে তন্ময়
না না করে মুখে শুধু নারী অভিনয়।....

উচ্চ কুচে বিরচিত খর নৌখরেখা
পীনোন্নত পয়োধরে শশী দিল দেখা।
কাতর দেখিয়া সতী দিলেক বিশ্রাম
উরুতে উরুতে দোঁহা ক্ষণেক বিরাম।
প্রেমরসে রসক্লান্ত হইয়া দু'জন
করিল সম্ভোগ শেষে নিশি জাগরণ।

লোরকরাজের মৃত্যু এবং সহমরণে দুই রানী :

ব্যাধি হই মৈল যদি লোর নরপতি
সেই চিতা প্রবেশি চলিলা দুই সতী।

সন বারোশো এক চল্লিশ মগীর আশ্বিন মাঘ
লিখা সাঙ্গ পুস্তক চন্দ্রাণী বারো মাস।

রোমান্টিক কাহিনীধারার মধ্যে আরও কিছু পুথির নাম :

১। ভাবলাভ এবং শুরতজানের পুঁথি।
লেখক : বর্ধমান নিবাসী শ্রীসমছুদ্দিন ছিদ্দিকি খোন্দকার।
প্রকাশক : শ্রী বেণীমাধব দে এন্ড কোম্পানি, ৩১৮ চিৎপুর রোড, বটতলা। পৃষ্ঠাঃ ১৫৪। ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সন ১২৮৬ সাল।

ভাবলাভ একটি দুষ্প্রাপ্য পুঁথি। সে যুগের পুথি সাহিত্যের একটি নিখুঁত নমুনা। অন্যান্য পুথির সঙ্গে এর একটা বড় ব্যবধান, মধ্যযুগের পুঁথি, তবুও পড়লে মনে হয় বর্ণনাভঙ্গি আধুনিক কালের। এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটি পড়ার সুযোগ পাই আমার জীবনের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষা গুরু আচার্য সুকুমার সেনের বর্ধমানের বাসভবন 'সুবাস্তু'-তে। (দিনের পর দিন মাস্টার মশাইয়ের বাসভবনে থেকেই বহু মূল্যবান গ্রন্থ আলোচনা করেছি। থাকা-খাওয়ার সম্পূর্ণ ভার তিনিই নিতেন। ছুটিতে মাসীমাও ওখানে থাকতেন। তাঁর অপত্য স্নেহের কথা কোনদিনই ভুলব না। কোন কোন সময় বাড়িতে আলোচনার জন্য কিছু পুঁথি মাস্টার মশাই আমাকে দিতেন। আমি ওই পুঁথি আমার ব্যাগে ভরার কালে তাঁর পালিত কুকুর 'টবি' খুবই আল্গার সাথে আমার হাতটি কামড়িয়ে ধরত। তখন মাস্টার মশাই খুবই হেসে উঠতেন। মাসীমাকে ডাকতেন, আমাদের এই লীলা-খেলা দেখার জন্য। তখন মাসীমা 'টবি'কে ডেকে নিয়ে ওপরে যেতেন। এবং আমি বই নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম।)

ভাবলাভের একটি গান :

কমল কলি কোথায় আছে
দেখনারে মন আপনার কাছে।
কায়ার ভিতর হৃদয় আছে
প্রেমের কমল বলি তারে
সমছদ্দি ছিদ্দিকী ভনে
গুরুর চরণ ধারণ বিনে
একথা কে বুঝিতে পারে
হেন শক্তি কাহারে

ভাবলাভ একটি চমৎকার গ্রন্থ। বর্ণনাভঙ্গি সুন্দর। কাহিনী প্রাচীন। পরীদের সংযোজন আছে। দু-একটি স্থানে বাস্তববিরোধী ভাবের সঞ্চার থাকলেও কাহিনী হিসেবে উৎকৃষ্ট। নরনারীর প্রেমাধ্যায়ে

দাম্পত্য জীবনের গতি নির্ণয়ে ভাবলাভ নতুন ধারা প্রবর্তনের অধিকারী। পুরুষ-রমণী দোহর পৃথক পৃথক বর্ণনাতেও গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। প্রেমিক ও প্রেয়সীর মিলন মোহনায় উভয়েরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নানা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এনে বর্ণনাকে অধিকতর অনুভূতিময় করা হয়েছে।

নূরজাহান প্রেমাধ্যায়ে মন্ত্রী-পুত্রের প্রতি বিষ প্রয়োগে অমানবিক ব্যবহার করলেও সেই মন্ত্রী-পুত্রের প্রাণ উদ্ধারে আপন নবজাতক পুত্রকে বলিদান দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি। এখানে নূরজাহান মহীয়সী নারী। কিন্তু প্রেমে সে পাগলিনী। এটা তো নারী জীবনের স্বাভাবিক ধারা। ভাবলাভ উন্নতমানের পুঁথি সাহিত্যের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

শুরুতজ্ঞানও ভাবলাভের মতোই একটি সুন্দর সৃষ্টি। সমগ্র কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক হয়েছে। রোমান্টিক জগতে এই সমস্ত পুঁথিগুলি একদিন সমাজে সাড়া ফেলেছিল।

ছহি দারা ছেকান্দরনামা : ফার্সী কাব্য
লেখক : মুনশী গোলাম মওলা
সন ১২৯৬ সাল

ছয়ফুল মুলুক বদিওজ্জামাল কাব্য
অনুবাদক : মুনশী খালেক মোহাম্মদ
সন ১৩৬৯, পৃ. ১৫৫

হপ্ত পয়কর : ফার্সী কাব্য
অনুবাদক : মহাকবি আলাওল

ছয়ফুল মুলুক বদিওজ্জামাল কাব্য
অনুবাদক : মহাকবি আলাওল

লক্ষ্মণসেন পদ্মাবতী
কবি দামো। আলাওল ও জায়সী
১৫১৩, ১৫১৬, ১৫৭০ খ্রীঃ

১। সোনাভান	:	গরীবুল্লাহ,	১২২৭ সাল	১৭২০ খ্রীঃ
২। আমীর হামজা	:		১১৪০ „	১৭৩৩ „
৩। ইউসুফ জোলেখা	:			১৭৬৫ „
৪। জঙ্গনামা	:		১২০১ „	১৭৯৪ „
৫। সত্যপীরের পুঁথি	:			

১। জারী জঙ্গনামা	হায়াত মাহমুদ	১১৩০ সাল	১৭২৩ খ্রী.
২। চিত্তউত্থান বা সর্বভেদ		১১৩৯ „	১৭৩২ „
৩। হিতজ্ঞানবাণী		১১৬০ „	১৭৫৩ „
৪। আম্বীয়াবাণী		১১৬৫ „	১৭৫৮ „
৫। ফকির বিলাস		১১৬৮ „	১৭৬৮ „
৬। নসিহত-ই-কামাল			
৭। শ্লোকমালা			
৮। কিয়ামতনামা			

বেনজীর বদরে মনির
লেখক : মুনশী কমরুদ্দীন
সন ১৩১৭ সাল, পৃ. ৬৪

আমির সদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি
লেখক : মুনশী, মোয়াজ্জম আলী।
১৮৪৫ ইং, পৃ. ৪০

লাল পরী কালোদেও ও পরীবানুর প্রেম
লেখক : মহম্মদ ইউসুফ, আসমা লাইব্রেরি।

জন মুরিদ চওদা উজির
লেখক : মুনশী মোঃ ইসমাইল।

গোলেনুর রৌশন জামাল
লেখক : আমিরুদ্দিন
প্রকাশক : মোঃ নূরুল ইসলাম
সন ১৩৬২ সাল।

দেলারাম
লেখক : গরিবুল্লা, প্রকাশক : কমরুদ্দিন আহম্মদ
গমের দরিয়া
লেখক : মোঃ ইউনুস, ১৩৬৮ সাল, পৃ. ২৫০

গোল আন্দাম বা বায়নাচ ছাপার নাচ
লেখক : মুনশী আয়জুদ্দীন আহম্মদ, ১৩৬৪ সাল

ছহি সখিসোনার কেচ্ছা
মোঃ কোরবান আলি, সন ১৩১৮ সাল

হাতেম তাহ :

বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহতাব চন্দ বাহাদুরের অনুমত্যানুসারে ও ব্যয়দ্বারা পারস্যভাষার গ্রন্থ হইতে শ্রীযুক্ত মনশী মহম্মদ ও গোলাম রব্বানী এবং দুর্গানন্দ কবিরত্ন কর্তৃক অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হইল।
শকাব্দ : ১৭৯৪ /২৭ পৌষ ; সন : ১২৭৯/ ইং ১৮৭৩ খ্রী.

গাজি কালু ও চম্পাবতী
লেখক : মুনশী আব্দুর রহিম, ১৩৬৮ সাল

তুতিনামা
গোলাম ইউসূফ, পৃ. ১৩২

নারী তার কাম-ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করতে কতদিকে কিভাবে এগো পারে এবং সেই সময় তার মানসিক অবস্থা কেমন থাকে। তুতি তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। ইসলামি বিধিমতে কেউ যেন তার যুবতী মিলনাকাঙক্ষী স্ত্রীকে বেশিদিন দূরে না রাখে, তুতি সে কথাও বলে দিচ্ছে।

তমিম গোলাল-চতুর্থ ছিল্লাল
লেখক : মুনশী মোঃ রাজা,
সম্পাদক : আব্দুল গফুর সিদ্দিকী,
সন ১২৭৪ সাল, পৃ. ১৩৬

নমুনা :

তকলোচ নৃপতি যদি নেকা পড়াইল
কুমার কুমারিদোহ বিরলেতে গেল।....
কামেশ্বর বানে অঙ্গ দোহ জ্বর জ্বর
বিরহ তরঙ্গে জ্বলি উঠিল অন্তর।
অধরে অধরে দিয়ে বদনে বদন
শুধু রস মধু পান করে দুইজন।
কামেতে এখন কন্যা হইয়া কাতর
জড়াতে নাহিক চায় আর পরস্পর।
প্রেমিকারাজেরে কহে প্রমীলা কাতর
সকাল হইল দেখি ছাড়হে নাগর।

রোমান্টিক অধ্যায়ে বারবার একটি জিনিস একইভাবে লক্ষ্য করছি যে, কোথাও দেখলাম না কামযুদ্ধে প্রেমিক হেরে গেল। সর্বত্র প্রেমিকা হেরে যাচ্ছে। এটা বোধহয় ওই যুগের পুরুষোচিত মনোভাবের নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ। বাস্তবক্ষেত্রে প্রেমিকাগণই তো কাম-যুদ্ধে জয়ের পতাকা উড়িয়ে থাকে। তাই না! প্রেম নারী-জীবনের সহজাত বা জন্মগত প্রকৃতি, এই প্রকৃতির সঙ্গে অন্য প্রকৃতির এঁটে ওঠা কঠিনই।

দেল আরামের পুঁথি (হিন্দি) ; অনুবাদক : গরীবুল্লাহ্, পৃ. ৪৩

মৃগাবতী
কবি কুতবন, পৃ. ৩৫০, ১৫২২ খ্রী.

চন্দ্রাবলী
দ্বিজ গুণপতি, উনবিংশ শতাব্দী

চন্দ্রাবলীর পুঁথি
সায়েরান : কবিগন—
মোঃ ইমাম বকস ও মোঃ হাজী ফয়জুল্লা।

মাধবানল কথা
কবি গণপতি, রচনাকাল, ১৫৮৪ সং বৎ, ১৫২৭ খ্রী.

ছহি বড় রঙ্গবাহার বা
সাহা আলম ও সাহা আলমের কেচ্ছা
লেখক : শ্রীযুক্ত মুন্সী হাজী আব্দুল মজিদ
পৃ. ১৫২, ১২৬৮ সাল।

ছহি বড় চোর পণ্ডিত
সায়ের : মুন্সী নিয়াজুদ্দিন, ১৩৩২ সাল
নইদা চনান্দ কুম্ভিরের পুঁথি
মোচ্ছান্নেফ : শ্রীসাহ জোবেদ আলি খোন্দকার

মদন কুমার
রাজকন্যা মধুবালা
অনুবাদ : ছক্কাপরি গোলকাহাম
সৈয়দ সাহ খোন্দকার জবেদ আলি, পৃ. ১২০
১৩০৭ সাল, আশ্বি।

ছহি লজ্জাবতীর পুঁথি
সায়েব : শ্রীযুক্ত আজেহার আলি, পৃ. ৪০
সন ১৩২৬ সাল

ছহি গোলসানে রুম
সায়ের : মুনসী আব্দুল জব্বার
প্রকাশক : আফাজদ্দিন আহাম্মদ। ১৩২৬ সাল

বড় তুতিনামার কেচ্ছা
সায়ের : শ্রীযুক্ত মুন্সী মোহঃ খাতের, পৃ. ১৩৬
১৩২১ সাল

যামিনী ভান
সায়ের : মুন্সী মোহঃ খাতের, পৃ. ৩২
১৩২৩ সাল

রেজওান সাহা (চট্টগ্রামী ভাষা)
সায়ের : মুন্সী খেদমত আলি ৬৭২ পৃ.
১৩১৯ সাল

পরিবানু সাহাজাদী
মোচ্ছান্নেফ্ : মুন্সী আয়জদ্দীন, পৃ. ১৩৮
সন ১৩২৪ সাল

গোল বাছানুয়ার
সায়ের : মোল্লা মোহঃ দানেশ পৃ. ৬০
সন ১৩২১ সাল

রাতকানা জামাই
সায়ের : মুন্সী দেয়ামতুল্লাহ্ পৃ. ১২
১৩২৭ সাল

হুর-নূর-বিবির কেচ্ছা
মোছান্নেফ : শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুল সাত্তার, পৃ. ৬৮
সন ১৩১৫ সাল

ভানুবতির লড়াই
মুন্সী রমজানউল্লাহ্‌, পৃ. ৩২
১৩২৫ সাল

শাহে এমরান চন্দ্রবাণ বা ফুলমতী পরীর কেচ্ছা
মুন্সী কমরুদ্দীন পৃ. ৭৫
১২৯০ সাল, ১৭ই কার্তিক

ছহি সুর্জ উজাল বিবি
সায়ের : মুন্সী বক্তার খাঁ, পৃ. ২১
১৩৭০ সাল

নিবারণ সুন্দরী পুঁথি, পৃ. ১৩
মুন্সী মোঃ ইউনুস, ১৩৪৬ সাল

হুয়াল গনী কর্তৃক
হাসেম কাজির পুঁথি পৃ. ২০

লালবাণু সাহাজামাল ও জরিনা বিবির কেচ্ছা
মুন্সী সাদেক আলি, পৃ. ৭০
১৩৬৮ সাল

ফাতেমার জহুরানামা ও বিবি কুলছুমের মেহমানি।
খোন্দকার মুন্সী আছমতুল্লাহ্‌, পৃ. ৪০, ১৩৭০ সাল

নমুনা :
হযরত মহম্মদ (সাঃ) ও বনের হরিণী
শুনহে আল্লার বান্দা যতেক মমিন
এক ময়দানেতে নবী গেল একদিন।
দেখিল হরিণ এক শিকারী ধরিয়া
আপনার মোকামেতে রেখেছে বাঁধিয়া।
নবীজীকে দেখে মৃগ শির নোয়াইল
দুই চক্ষে আঁছু দ্বারা কহিতে লাগিল।
নবীজীর নিকটেতে কহিল হরিণে
দুই বাচ্চা আজেজ মোরা হৈল দুধ বিনে।
আপনি মেহের করে দেন ছাড়াইয়া
বাচ্চাকে পিলাইয়া দুই আসিব ফিরিয়া।
শুনিয়া নবীর মনে দয়া উপজিল
শিকারীর তরে নবী কহিতে লাগিল।
এই হরিণীকে দেহ খালাস করিয়া
বাচ্চাকে পিলাইয়া দুই আসিবে ফিরিয়া।
শিকারী কহেন তবে নবীজীর তরে
হামেশা গোজরান মেরা এই পেশা করে।
এই শিকার লিয়া আমি বাজারে বেচিয়া
লাড়কা বালা সহখাব আছুদা হইয়া।
না আইলে এই মৃগ করিব কেমন
আপনার বাত নাহি করি যে লঙঘন।

শুনিয়া কহেন তারে রসুল আমিন
এই হরিণীর আমি রহিনু জামিন।
রসুলের বাত শুনি দিলেক ছাড়িয়া
অতি বেগে চলে মৃগ বাচ্চার লাগিয়া।
মাকে দেখিয়া তারা কাঁদিতে লাগিল
কি খাতিরে তেরা আজি এত দেরি হৈল।
বাচ্চাগণে কহে মৃগ কাঁদিয়া কাঁদিয়া
শিকারী ধরিয়াছিল ফাঁস লাগাইয়া।
তোমাদের সৌভাগ্য নছিব ভাল ছিল
মেহের করিয়া আল্লাহ্ মদদ ভেজিল।
আইলেন সেখানেতে মহম্মদ আরাবি
তাঁহাকে জামিন দিয়া আইনু সেতাবি।
শীঘ্র করি দুধ তোরা খাও বাছাধনে
নবীজী জামিন আছে যাইব সেখানে।
বাচ্চাগণ বলে মা গো কি কথা কহিলে
নবীজীকে জামিন দিয়া কি কারণে এলে।
দুনিয়ার মূল যিনি আখেরের সার
তাঁহাকে জামিন রাখি হলে গোনাগার।
না শুনিব তবকথা না লইব নাম
আজিকার দুগ্ধ তব মোদের হারাম।
জামিন খালাস কর নবীজীর তরে
তবে সে খাইব দুধ কহিনু তোমারে
এতেক শুনিয়া মৃগ চলিল ছুটিয়া
শিকারীর ঘরে ফের পৌছিল যাইয়া।
বিনয় করিয়া কহে নবীর চরণে
আপনি চলিয়া যান যেথা দেল মনে।
এ বাত শুনিয়া নবী তাজ্জব হইল
হরিণের ঈমান বড় ছাবেত জানিল।
ডাকিয়া কহেন নবী শিকারীর তরে
এ হরিণে ছেড়ে দেহ আমার খাতিরে।
শিকারী সে হরিণের বুঝিয়া ঈমান
দস্ত জোড়ে কহিলেন নবী বিদ্যমান।
আপনি খোদার দোস্ত দ্বীনের সম্মান
হরিণ ছাড়িনু আমি হইয়া খোসাল
সমগ্র উন্মত্ত তরে রসুল আমিন
খোদার আরশ্ ধরে আছেন জামিন।
বনের সামান্য পশু রসুল প্রতি
মানিল স্মরিয়া তাঁর জামিন নীতি।

লালমোন বিবির পুঁথি
সায়েব মোহঃ আরিফ পৃ. ১৩, ১৩৬৭ সাল

গোলে আরজান
মৌলভী রায়জানউদ্দিন
১৩৬৮ সাল

দরিয়া শাহাজাদির কেচ্ছা
মোঃ ইউনুস, ১৩৬৮ সাল

যছিমোন বিবির কেচ্ছা
মুন্সী সৈয়দ আলী সর্দার পৃ. ৬০
১৩৬৪ সাল

দিল দিও না কুমার ও দীলসাদ কুমারীর কেসসা
মহঃ ইউনুস, ৫৮ পৃ.
১৩৬০ সাল

শাশুড়ি জামাইয়ের ঝগড়া
মোঃ কোরবান আলি, ১৯ পৃ.
১৩৬৮ সাল

একশত পাগল অথবা মালঞ্চ কন্যার কেচ্ছা
মুন্সী আয়জুদ্দীন, পৃ. ৪০
১৩৬৮ সাল

বন বিবির জহুরনামা
মহম্মদ মুন্সী, পৃ. ৭০
১৩৬২ সাল

মালুখাঁ ও রসনেছা কন্যার পুঁথি
মোকাম্মেল খাঁ, পৃ. ৬৫
১৩৬৭ সাল

ছহি বড় সোনাভান
সৈয়দ হামজা, ১৩৬০ সাল

রূপচাঁদ সদাগর ও কাঞ্চনমালার কেচ্ছা
মোহম্মদ মুন্সী, ১৩৬৮ সাল

ছহিবড় জৈগুনের পুঁথি,
সৈয়দ হাজ্জা, ১৩৬৬ সাল

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে শাস্ত্রকথা

ইসলামি বাংলা সাহিত্যে 'শাস্ত্রকথা' একটি অন্যতম অধ্যায়। তার বর্ণনায় বেশির ভাগই প্রাধান্য পেয়েছে শাস্ত্রের বাহ্যিক আচরণ ও অনুষ্ঠান। যার ফলে ধর্ম হয়েছে কিছুটা প্রাণহীন। এবং যে প্রাণহীন, সে গতিহীন। এই গতিহীনতার ফলে তার অনুগামী ও অনুসারীরা, অধিকাংশই অন্ধকারে স্থবির বা ধর্মান্ধ। যে ইসলাম একদিন সারা বিশ্বকে গতি দান করেছিল, সে এখন গতিহীন। যেহেতু তার অনুসারীরা ইসলামকে করল সঙ্কীর্ণ, ফলে নিজেরা হয়েছে পশ্চাদ্‌পদ। যে-ইসলাম একদিন স্থবির বিশ্বকে পথ দেখিয়েছিল, তার অনুসারীরা নিজেরাই হল পথহারা। জাতির জীবনে কি করুণ পরিহাস।

তবে ধর্মের বাহ্যিক বর্ণনা ক্ষেত্রে 'শাস্ত্রকথা' বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ধর্মের আনুষ্ঠানিক সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পুষ্ট করেছে। এবং আজ পর্যন্ত ধর্মের যে অন্তিম রেখাটুকু ফুটে আছে, সেটা তাঁদেরই অকৃত্রিম অবদান। 'শাস্ত্রকথা' ধর্মকে শুধু ধরেই রাখেনি। মানব চরিত্রের বহু গুণাবলীকেও রক্ষা করেছে। আচার-আচরণে তাকে শোধিত ও শালীন করেছে। এটাও শাস্ত্রকথার কম অবদান নয়।

কিন্তু ইসলামি জীবনদর্শন ওইটুকুতেই সীমিত নয়। সে জীবনকে করে গতিময়, জীবন-জিজ্ঞাসায় প্রখর ও মুখর। সে জীবনকে দেয় সত্য ও সুন্দরের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সে মানুষকে বয়সে বড় করার সঙ্গে বড় করে বিবেকে ও জ্ঞান-গরিমায়। এইজন্যই ইসলাম একটি মানবিক ধর্ম। মানুষের মধ্যে এই মানবতার বিকাশই তার মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে ইসলামের 'শাস্ত্রকথা' ইসলামকে গতিদান করতে পারেনি। যার ফলে ইসলামের মূল আবেদন ও মৌলিক অবদান মানবসমাজে বেশিদিন সাড়া জাগাতে পারল না। মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) ছিলেন আগুন স্বরূপ, তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বিশ্ব-মশাল জ্বলতেই ছিল। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা অন্ধকার নেমে এল। কিন্তু আগুনের উত্তাপ রয়ে গেল। ওই উত্তাপ বেশ কিছুদিন (৬৩২-৬৬১ খ্রীঃ) চলতে থাকল। পরে তাও নিরুত্তাপ হল। তখন ইসলাম যেন তার দুর্বার গতি হারাল। ৬৬১ থেকে ১২৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত যে ইসলাম চলল, তা নকল ইসলাম না হলেও আসল ইসলামও নয়, বরং বিবেকের সঙ্গে বলতে পারি বিকৃত ইসলাম। অবিকৃত ইসলাম আবার আমরা ফিরে পাব, এ আশাও যেমন করি না, বিকৃত ইসলাম আমাদের ধরার মাটি হতে মুছে দেবে, এ ভয়ও রাখি না। আমরা ইসলামের শাস্ত্রকথাকে কেন্দ্র করেই আবার তার প্রাণশক্তিকে জয় করার চেষ্টা করব। শাস্ত্রকথার আগাছা ও আবিলতাকে নির্মূল করে মূল বৃক্ষটিকে সবল করতে পারলে বাগানবাড়ি বৃক্ষ-ফলে আবার ভরে উঠবে।

কিলিদে জান্নাত : মওলানা মোহঃ ইলিয়াস (রহঃ)

ওই যুগে 'শাস্ত্রকথা' অধ্যায়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। নমুনা স্বরূপ আমরা একটি গ্রন্থের কিছু অংশ তুলে ধরছি।

কিলিদে জান্নাত একটি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে কোন রূপক কাহিনী নেই। এর অধিকাংশ বিষয়বস্তু কোরআন ও হাদিস থেকে নেওয়া। তখনকার দিনে গ্রন্থটি জনসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। তার সুখ্যাতি সুদূর বীরভূম থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, ক্লাসের ছাত্র (১৯৬০ খ্রীঃ), তখন সহপাঠীদের সঙ্গে চট্টগ্রাম বেড়াতে গিয়ে ওখানকার গ্রামাঞ্চলে 'কিলিদে জান্নাত'-এর সাক্ষাৎ পাই। 'কিলিদে জান্নাত' ইসলামি জীবন দর্শনের একটি সামগ্রিক রূপ। ইসলামি পুঁথি-সাহিত্যে এরূপ সাহিত্য বিরল। চরিত্র ও সমাজ গঠনে শাস্ত্র-অধ্যায়ে এটি একটি অতুলনীয় গ্রন্থ।

গ্রন্থ আরম্ভ :

জান্নাতের কুঞ্জি এই নাম কেতাবের
ধরিয়া করহ সবে পুঞ্জি আখেরের।...
সেরাতের পুঞ্জি আর কুঞ্জি বেহেশতের
রাখ-রাখ হেফাজতে সিন্দুকে দেলের।

গ্রন্থটিতে কি আছে :

কিলিদে জান্নাত এই কেতাবের নাম
এর মধ্যে আছে যত দ্বীনের কালাম।
দ্বীনার কালাম আর দ্বীনের আহ্কাম
শারা শরিয়ত মতে পাইবে তামাম।

গ্রন্থ সূচনা :

বিসমিল্লা বলিয়া ধরি কলম হস্তেতে।
উঠাইয়া লিনু কালি দিয়া দোয়াতেতে।।
কালি উঠাইয়া লিয়া দোয়াত হইতে।
শুরু করিলাম আমি লিখিয়া যাইতে।।

খোদাতালার তারিফের বয়ান (সংসার সৃষ্টি) :

আপা আল্লা বারি তালা জলিল জব্বার।
কুদরতে করিল পয়দা তামাম সংসার।।
পাণিতে জমিন আর শূন্যেতে আসমান
অপার মহিমা তার না হয় বয়ান।।

জীব সৃষ্টি :

কিছু জলে, কিছু স্থলে সুরত বাহার।
করিতেছে পয়দা দেখ হাজার হাজার।।
বৃক্ষ-লতা পাতা-সহ দুনিয়া জাহান
অপার মহিমা তব কে করে বয়ান।।

এক বিন্দু নুৎফা দেখ করিয়া কারার।
কুদরতের জোরে দেখ রেহেমে মাঝার।।
থোড়া দিন পরে শক্ত লহুব প্রমাণ।
অপার মহিমা তব কে করে বয়ান।।......

একই খোরাক দেখ রেহেমে মাঝার।
গরিব কাঙাল আর রাজা-রাজড়ার।।
আম খাস নাহি করে এমনি সুবহান
অপার মহিমা তার কে করে বয়ান।।......

যে ঘণ্টা চলিয়া যাবে না আসিবে আর।
ফেরায় ঘণ্টার কাঁটা সাধ্য আছে কার।।
ছানি তাঁর নাহি পাবে বিচে দুজাহান।
অপার মহিমা তার কে করে বয়ান।।

সিয়াহি বানায় পানি ছারে দুনিয়ার।
গাছপালা হয় যদি কলম তৈয়ার।।
কেয়ামত তক লেখে জিন ও ইনসান।
অপার মহিমা তার কে করে বয়ান।।

কিঞ্চিৎ বর্ণনা নাহি হইবে তাহার।
ফেরেশতা তামাম যোগ দেয় যদি আর।।
এজন্য ছাড়িয়া দিল কমিনা নাদান।
অপার মহিমা তার না হয় বয়ান।।

নবীজীর তারিফের বয়ান :

তেনার আদত দেখে কত নাফরমান
করজোড়ে খাড়া হয়ে আনিত ঈমান।
নামদার বাদশা কত হইত হয়রান
আর দেখেশুনে দূরে ভাগিত শয়তান।....
হাশমত্ দরদবা এত দিল পরওয়ার
আহারে-গুণের নবী এত গুণ তাঁর।...
যে ক্ষণে নবীর দন্ত শহিদ হইল
আসিয়া ফেরেশতা এক তেনাকে কহিল
হে নবী হুকুম পাই দেখি এ সকল
পর্বত ফেকিয়া মারি কাফেরের দল।
তখন করিল মানা দয়ার ভাণ্ডার
আহারে গুণের নবী এতগুণ তাঁর।

সাহাবাগানের তারিফ ঃ

হযরত আবুবকর (রাঃ) দয়ালু, হযরত ওমর (রাঃ) ন্যায়পরায়ণ, হযরত ওসমান (রাঃ), দাতা, হযরত আলি (কঃ) জ্ঞানী ও বীর।

বিসমিল্লার ফজিলত :

সে কহে ফরমিল নবী এমত প্রকার
বিসমিল্লাহ শরিফ পড়ে যেই নেক্কার
দশ হাজার নেকি লেখে জন্যেতে তাহার
আর গুণা তার কাটা যায় দশ হাজার।

বিসমিল্লার মধ্যে তিন নামের ভেদ বর্ণনা। চার নামের ভেদ বর্ণনা। বিসমিল্লার মধ্যে উনিশ হরফের বর্ণনা।

বিসমিল্লার বরকতে সাহাজাদী জুলুম হতে রক্ষা পায় :

একদা এক বেদীন বাদশার বেটি বিসমিল্লার গুণাগুণ বোঝতে পেরে বিসমিল্লা আমল করে। এবং বিসমিল্লার বলে পিতার দেওয়া আংটিকে মাছের পেট থেকে উদ্ধার করে।

বিসমিল্লাহ হতে চার নহর জারি হয়। এ নহরগুলো বেহেশ্তের। ঈমান কায়েম রাখার বয়ান। মওতের মিছালের বয়ান। যে-সকল মরদ ও জানানাগণ মুখে ঈমানের দাবি করে তার বয়ান। মানুষের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যারা মুখে বলে আমরা আল্লার প্রতি ঈমান এনেছি এবং পরকালের প্রতিও। এবং তারা বেঈমান।

যে-সকল মরদ ও জানানাগণ নামাজ পড়ে না, তাদের উপর নসিহতের বয়ান। "মান তারাকাস্ সালাতা, মুতায়াম্-মেদান, ফাকাদ কাফারা।" যারা ইচ্ছে করে নামাজ ত্যাগ করে। নিশ্চয় তারা কুফরী করল। —হাদিস। ওই সমস্ত নামাযীদের জন্য ধ্বংস, যারা নামাযে অমনোযোগী। কোরআন ১০৭ ঃ ৪-৬। "পৃথিবীতে গর্বভরে চলো না"। ৩১ ঃ ১৮

নামায সম্পর্কে তাগিদ :

কিছু কি শরম নাহি ওহে বেনামাজী
করে যেতে হবে গোরে ওহে বেনামাজী।
ঝুকাও আপন ছের ওহে বেনামাজী
মালেকের সামনেতে ওহে বেনামাজী।....
আমির-ওমরাও হও ওহে বেনামাজী
সৈয়দ পাঠান হও ওহে বেনামাজী।
নামাজ না পড় যদি ওহে বেনামাজী।
আজাব সাদিদে রবে ওহে বেনামাজী।
জোর-সোর তেরা যত ওহে বেনামাজী
একদম মিটে যাবে ওহে বেনামাজী।
কিছু না নিশান রবে ওহে বেনামাজী
রবে বেনামাজী নাম ওহে বেনামাজী।
দাড়ি বাড়াইলে খালি ওহে বেনামাজী
মোছলমান নাহি হবে ওহে বেনামাজী।
কোর্বানী করিলে খালি ওহে বেনামাজী
মোমিন নাহিক হবে ওহে বেনামাজী।
না হও শুনিয়া খাপ্পা ওহে বেনামাজী
চাহে মাফি ইলিয়াস্ ওহে বেনামাজী।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য :

"পিতামাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর, ওদের একজন অথবা উভয়েই তোমার সম্মুখে বার্ধক্যে উপনীত হলে, ওদের উফ্ (বিরক্তিসূচক শব্দ) বলো না। এবং ওদের ভর্ৎসনাও করো না। ওদের সঙ্গে সম্মান সূচক কথা বলো। তাদের উভয়ের জন্য সদয় ও বিনীতভাবে বাহু নত কর ও বলো— হে আমাদের প্রতিপালক, তারা শৈশবে আমাকে যেরূপ প্রতিপালন করেছে, তুমিও তাঁদের প্রতি অনুরূপ করুণা করো।" কোরআন—১৭ ঃ ২৩-২৪।

সদাই ভালই কর মা-বাপের সাথে
যেমন ভালই করা চাহি বিধিমতে।
পিতা ও মাতার মধ্যে দুনিয়া বিচেতে
এক যদি থাকে কিম্বা দুই এক সঙ্গেতে
যদি বুড়ো হয়ে যায় তোমার কাছেতে
তবুও সে তুমি মা-বাপের কোন বাতে
উহ্ কি মু-ভারি না করিবে কোন মতে।
জবাব না দিবে কভু কঠিন শব্দতে
আর যা কহিবে সদা আদবের সাথে।

মিরাছ বা প্রাপ্য অংশ বা হক :

কোন মানুষের হক মারা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজের একটি কাজ। এমন কি আপন ছেলেমেয়েদের হককেনা-হক করা মহাপাপ। ইসলামের বিধান—যার যা প্রাপ্য, তাকে তাই দাও। নচেৎ মহান আল্লার মহাবিচারে শাস্তি পেতে হবে।

কোরআন হাদিসে আছে হিস্যা মকরর
তাহা দিতে তুমি কেন এতই কাতর।
কাতর কি জন্যে হও ওহে দীনদার
দোসরা হাদিস করে নিজেতে তৈয়ার।
নিজের তৈয়ারি দেখি ফারাজ তোমার
কোরআন হাদিস কেন হবে এতবার।
সে যেমন ওয়ারেছের মিরাছ কাটিয়া
অন্যজনে দিয়া গেল মহরুম করিয়া।
জান্নাত মিরাছ যাহা আছিল তাহার
এ জন্যেতে কাটা যাবে হাশর মাঝার।

আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না। যতক্ষণ তারা নিজের অবস্থা নিজে পরিবর্তন না করে। এই পরিবর্তন ভাল ও মন্দ উভয় দিকে হতে পারে।

কোরআন—১৩ ঃ ১১, ৫৩ ঃ ৩, ৮৯ ঃ ৫৩।

নিশ্চয় বারিতালা কোন কওমের
তবদিল নাহিক করে হালত তাদের।
তাহারা নিজেতে যবে হালত আপন
বিগাড়িয়া ডালে, শেষে পাক নিরঞ্জন।

দানের ফজিলত বা উপকার :

যারা আল্লার পথে গরিব দীনদুঃখীর জন্য আপন ধন-সম্পদ দান করে, তাদের দৃষ্টান্ত এই রূপ, যেমন একটি শস্য-বীজে সাতটি শীষ'উৎপন্ন হয়। এবং ওর প্রত্যেক শীষে একশো শস্য দানা আছে এবং আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছে আরও বহু গুণ বাড়িয়ে দেন।" কোরআন—২ : ১৬১।

ফার্মিয়াছে বারিতালা কোরআন মাঝার
রাহে লিল্লা দেয় যেই মাল আপনার।
যেয়ছা বোনা যায় ধান্য জমিন মাঝার
এক গাছ হয় এক দানাতে তাহার।
নিশ্চয় পাইবে সাত কাটি মধ্যে তার।
উহার অধিক পাবে কত শত আর।...
দেখ সে ঝাড়েতে হবে সাতশিষ তার
হরেক গাছেতে এক হুকুমে খোদার।
ফের এক শিষ গুণ ওহে বেরাদার
এক-এক শিষেতে দানা শয়ের উপর।
শত শত দানা দেখ প্রত্যেক শিষের
সাত শত দানা পাও বদলে একের।

দানের ফল :

এক বুড়ি তার দানের জন্য বাঘের মুখ থেকে আপন সন্তানকে ফিরে পেল। এক ধোপা তার তিনটি রুটি দানের জন্য এক বিষধর সাপের ছোবল থেকে মুক্তি পেল। গরিব ও অসহায় ব্যক্তিকে দান করলে মানুষের কত যে মঙ্গল হয়, সে কথা ইসলাম সবিস্তারে বর্ণনা করেছে। বর্তমান পুঁথিটিতে তার কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাই।

সংযমতার ফল :

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) বলেন—যে ব্যক্তি কেবল আমার জন্য তার দেহের দুটো জিনিসের জামিন নেবে, আমি তার জন্য স্বর্গ ও নরকের জামিন নেব। দেহের দুটো জিনিস অর্থাৎ দুই চোয়ালের বা দু' পাটি দাঁতের মধ্যবর্তী জিনিস জিহ্বা এবং দু' পায়ের মধ্যবর্তী জিনিস অর্থাৎ গুপ্তাঙ্গ। এককথায় মহানবীজী (সাঃ) বলতে চেয়েছেন যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও গুপ্তাঙ্গের হিফাজত করবে বা তাদের দায়িত্ব নেবে তিনি তার স্বর্গ-নরকের দায়িত্ব নেবেন। মিথ্যা বর্জন ও ব্যভিচার থেকে রক্ষা পাওয়া ইসলামের মহান শিক্ষা।

এমত ফর্মায় আহা রসুল আমিন
মোর লাগি হয় যেবা দুই চিজে জামিন।
দুই চুয়ালের মাঝে আছে হে জবান
সরমের স্থান, দু'পায়ের দরামিয়ান।
আমার জন্যেতে যেবা জামিন ইহার
হইব হইব আমি জামিন তাহার।

নীরবতার ফল :

মরতবা চুপের ভারি নবি ফর্মাইল
ষাট বছরের এবাদত চেয়ে ভাল।

রাবেয়া বিবি :

মুসলিম জগতে রাবেয়া বিবি খুবই নাম করা মহিলা। তিনি কোরআন ব্যতীত কথা বলতেন না।

রাবেয়া নামেতে এক... আছিল আওরত নেক
তাবাইনের জমানেতে
দীনদার ছিল অতি... আর সে বিদ্যাবতী
আর ছিল হাফেজে কোরআন।
আয়াত ব্যতীত তার... নাহি ছিল কথা আর
যা কিছু মুখেতে কহিত।
তাহাকে ডাকিলে কেহ... সত্বর জত্তাব সেহ
কোরআন শরিফ হৈতে দিত।

পরনিন্দা-পরচর্চা ইসলামে খুবই গর্হিত কাজ, নিন্দনীয়, ঘৃণার্হ।

ফর্মাইছে বারিতালা কোরআন মাঝার
অর্থাৎ গিবত্ কেহ না কর কাহার।
পছন্দ কি করে এয়ছা আছে কোনজন
খায় সে গোস্ত মোর্দা ভায়ের আপন্।
মিথ্যাবাদীর ইসলামে কোন স্থান নেই।

এ জন্যেতে ফর্মিয়াছে নাক ছোবহান
মিথ্যাবাদী যারা তারা না রাখে ঈমান।
কোরআন—৭৭ : ১৫-৫০

ব্যভিচার :

ইসলামের চোখে ব্যভিচার এতই ঘৃণিত কাজ, ব্যভিচার করা তো বহু দূরের কথা, ইসলাম মানুষকে ব্যভিচারের কাছে যেতেও নিষেধ করেছে। এখানে কাছে অর্থাৎ ব্যভিচারের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যেতেও নিষেধ করেছে। পূর্ববর্তী অধ্যায় অর্থাৎ নানা রকমের শৃঙ্গার, সম্ভোগমূলক আচরণ—কখনও হস্ত মৈথন, কখনও চুম্বন, কখনও স্তন মৈথন, কখনও উভয় উভয়ের গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ ও নিবিড় ঘন আলিঙ্গন ইত্যাদি। মানুষ এগুলোতে পদক্ষেপ করলে, তার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে না, তাই কোরআন ব্যভিচারের কাছে যেতেও নিষেধ করেছে। কোরআন- ৪ : ১৫, ১৯, ১৭:৩২, ২৩:৫, ২৪: ২, ২৫:৬৮, ৩৩ : ৩০, ৭০:২৯-৩০।

ফর্মিয়াছে বারিতালা কোরআন মাঝার
কান মন দিয়া শুন যত দীনদার।
না যাও জেনার কাছে ফর্মিয়াছে এই
নিশ্চয়ই ফাহেশা আর বদ্ রাহা সেই।
বহুত খারাব রাহা জানিবে জ্বেনার
না হক কতলে আর শের্‌কে সুমার।
এয়ছা ফর্মাইল নবী আলায়হেচ্ছালাম
যেই কওমের বিচে হয় জ্বেনা কাম।
জ্বেনার জন্যেতে হয় দুর্ভিক্ষ আকাল।
বোঝ বোঝ সকলেতে করিয়া খেয়াল।

দোজখ বা নরক :

ত্রিপদীতে কহে যাই... এয়ছা সে দোজখ ঠাঁই
ফর্মিয়াছে আপে পাক রবে
মানুষ পাথর সবে... ইন্ধন যাহার হবে
সে আগ হৈতে বাঁচ সবে।

স্বর্গ বা জান্নাত :

যে ব্যক্তি ঈমান আনি নেক কাম করে
দাখেল করিবে আল্লাহ্ জান্নাত ভিতরে।
এয়ছা সে জান্নাত হায় কি কহিব কারে
বকসিস করিতে নিজ বান্দাদের তরে।
নীচিতে নহর জারি উপরে বাগান
আহারে বাহার কেবা জান্নাত মোকান।

শায়ের বা কবির পরিচয় :

দীনহীন খাকছার ইলিয়াস নাম
পাপুড়ী মৌজার বিচে কদিমি মোকাম।
মোদের গেরাম হৈতে তিন ক্রোশ দূর
বড়ই উত্তম জায়গা জানিবে বোলপুর।

চারি ভাই ছিনু মোরা দুনিয়া মাঝার
একে একে নাম আমি করিব সবার।
মোর বড় মহাম্মদ ইদ্রিস নাম যার
নরম মেজাজ তার বরফ আকার।
আর ছোট মুন্সী ইউনুস নাম যার
বড়ই চালাক সেহ বড় হুঁশিয়ার।
সকলের বড় যিনি ছাড়ি এ দুনিয়া
গেলেন দুনিয়া হৈতে রওনা হইয়া।
নাম তাঁর শুনেছিনু নিকট মায়ের
আবুল কাসেম নাম ছিল সে ভায়ের।

তাহা বাদে কহি হাল পিতা ও মাতার
মওলানা আব্দুল হামিদ ওয়ালেদ আমার।
দাদাজির নাম মোর মওলানা আসগর
নামেতে আসগর ছিল কামেতে আকবর।
ডাকিত তেনাকে সবে মুসুন্সি বলিয়া
হিন্দু-মুসলমান হৈতে ছেলে বুড়ালিয়া।
বড়ই কামেল সখস্ ছিল দুনিয়ায়
কহিতে তেনার কথা ছাতি ফেটে যায়।
সন তেরো শত তেরো বাঙ্গালা সালেতে
রওনা হইয়া গেছে এ সংসার হৈতে।
নানাজি হেরেসতুল্লা নাম ছিল যার
নামাজী মোত্তাকী সখী অতি খীনদার।
তার যে রাতেতে তিনি এন্তেকাল করে
সুগন্ধ ছুটিয়াছিল খোদার মোহরে
কেহ বলে উস্তাদজীর মৃত্যুর পরেতে
ছ'মাস ধরিয়া খোসবু গেয়েছে নাকেতে।
আর সে সময়ে হয় রুওসন এমন
অমাবস্যা রাত ছিল দিনের মতন।
এয়ছা মওতের হাল আছিল তাহার
কেয়ছা লোক ছিল বার মনেতে বিচার।
আর দেখি অদ্যাবধি দোয়াতে তাঁহার
সর্প ও জেনের নাই কোন অত্যাচার।

সমাপ্তকাল :

তেরশ তিরিশ সাল কার্তিক মাসেতে
তিরিশে তারিখ ছিল জুমার দিনেতে
সেই তারিখেতে এই কেতাব আমার
সম্পূর্ণ হইয়া গেল মেহেরে খোদার।

শায়ের বা কবি :

আবু আকবর মৌলবী মোহাম্মদ ইলিয়াস তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবু সোলায়মান মুন্সী মোহাম্মদ ইউনুস (উস্তাদজী) কর্তৃক প্রকাশিত।

সাং—পাপুড়ি, পোঃ—হাটসেরান্দী, বীরভূম, সন ১৩৩০ সাল।

মাওলানা মোহঃ ইলিয়াস (রহঃ) ১৩০১ সালে জন্মগ্রহণ করে ১৩৮৮ সালে ৮৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। ইং ১৮৯৪ জন্ম এবং মৃত্যু ১৯৮১ খ্রীঃ। তিনি 'ক্লিদে জান্নাত' ছাড়াও আরও কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন ; 'নাসিমেজান্নাত' ও 'তামাচা' প্রভৃতি তাঁর অমর কৃতি।

প্রসঙ্গ :

ইসলামি পুঁথি-সাহিত্যের যুগে যত ধর্মীয় কেতাব বের হয়েছিল, তার অধিকাংশই ধর্মের বাহ্যিক আচরণ ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। কখনো-সখনো যুদ্ধ-বিগ্রহ কেন্দ্র করে। অনেক সময় আচার অনুষ্ঠানজাত পুস্তকগুলো ইসলামের নীতির প্রাণহীন বোঝা মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলাম যে একটি মানবিক ধর্ম তার আগমনের মূল হেতু যে মানুষেরই উত্থান, এ কথাটি ঐ সমস্ত গ্রন্থে গৌণ হয়ে পড়েছে। মওলান ইলিয়াস সাহেবের ক্লিদি জান্নাত তার একটি ব্যতিক্রম।

ইসলাম মানুষকে রক্ষা করতে চেয়েছিল তার চরম শত্রু— মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ব্যভিচার, হিংসা অসংযমতা, অমিতব্যয়িতা প্রভৃতি হতে, যাতে মানুষ তার জীবনে চরম মনুষত্বে পৌঁছিয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষের পরিচয় দিতে পারে। ইসলামের অধিকাংশ শাস্ত্রবিদগণ যেন এই কথাটি বহুল অংশে ভুলে যান। মওলানা ইলিয়াস সাহেব তাঁর গ্রন্থে মানবিক গুণগুলির প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রেখেছেন। তাঁর গ্রন্থটি পড়লে মনে আবেগ ও অনুভূতি জেগে ওঠে। এখানেই তাঁর সার্থকতা।

ছহি কাছাছল আম্বিয়া

মোছান্নেফা বা লেখক :

জনাব মুনশী তাজদ্দীন মহাম্মদ
জনাব মুনশী মহাম্মদ খাতের
জনাব মুনশী আব্দুল ওহাব
প্রকাশক আফাজদ্দীন আহম্মদ
প্রকাশকাল : ১৩৩৭ সাল।
ষষ্ঠ খণ্ডে ৫০ বালামে, ১০৭২ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন

ইসলামি বাংলার পুঁথি-সাহিত্যে কাছাছল আম্বিয়ার স্থান খুব উচ্চে। ইসলামি মতে ১২৪০০০ থেকে ২২৪০০০ হাজার নবী ও রসুল এই ধরাতে এসেছিলেন। পবিত্র কোরআনেও বহু নবীর নাম পাওয়া যায়। লেখকগণ এই নবীসমূহের যতগুলো সম্ভব নাম পেয়েছেন, তাঁদের বর্ণনা করেছেন। জগতের ইতিহাসে মানবসমাজে এ এক বিরাট অধ্যায়। লেখকগণের দেওয়া একটি নাম তালিকা :

১। হযরত আদম (আঃ) ২। হযরত শিশ আঃ ৩। হযরত নূহ আঃ ৪। হযরত ইদ্রিস লাঃ ৫। হযরত হুদ আঃ ৬। হযরত ছালেহ আঃ ৭। হযরত ইব্রাহিম আঃ ৮। হযরত লুত আঃ, ৯। হযরত ইসমাইল আঃ ১০। হযরত ইসহাক আঃ ১১। হযরত ইয়াকুব আঃ ১২। হযরত ইউসুফ, ১৩। হযরত সোয়েব আঃ ১৪। হযরত ইউনুস আঃ ১৫। হযরত আইয়ুব আঃ ১৬। হযরত এছকান্দর জোলকারনায়েন আঃ ১৭। হযরত মূসা আঃ ১৮। ১৯। হযরত খিজর আঃ ২০। হযরত তালুত ২১। হযরত ইলিয়াছ ২২। হযরত শামাইল ২৩। হযরত দাউদ ২৪। হযরত সোলেমান ২৫। হযরত লোকমান আঃ ২৬। হযরত দানিয়াল ২৭। হযরত আরসিয়া ২৮। হযরত আজিব ২৯। হযরত যাকারিয়া ৩০। হযরত

ইয়াহইয়া ৩১। হযরত জরজিহ আঃ ৩২। হযরত সামাউন ৩৩। হযরত ঈশা আঃ ৩৪। মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)।

প্রসঙ্গ আলোচনা :

'কাছাছল আম্বিয়া' শব্দের অর্থ—নবীগণের কাহিনী। পৃথিবী যখন রসাতলে যেতে বসেছিল, তখন মহান আল্লাহ মাঝে মাঝে নবী ও রসুল পাঠাতেন। নবী ও রসুল মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখাতেন আল্লাহকে চেনাতে। মানুষ হিসেবে সকল মানুষের যে দায়দায়িত্ব আছে, সেটা বোঝাতেন। মানুষ যে জীবশ্রেষ্ঠ, সেটা মানুষকে প্রমাণ করতে হবে আপন কাজে। একথা, এসত্য সর্বস্তরে প্রচার করতেন। মানুষকে সংযত, সংহত ও সহিষ্ণু হতে হবে, একথা ছিল তাঁদের নীতিমালা। এককথায় পথহারা মানুষকে পথ দেখানোর জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে প্রত্যেক জাতির মধ্যে এক বা একাধিক দূত পাঠাতেন। একথা মানুষের নয়, খোদ কোরআনেরই। ১০ : ৪৭, ১৩ : ৭, ১৬ : ৩৬, ২৮ : ৪৭, ৩৫ : ২৪-২৫।

মহান আল্লাহকে চেনার প্রকৃষ্ট পন্থা মানুষের আপন আপন অন্তর দর্শন। এই দর্পণটি যার যত স্বচ্ছ, সে তত সহজে আল্লাহকে চিনতে পারে। এই অন্তর-দর্পণকে পবিত্র করা, নির্মল করা, পরিষ্কার করা ইসলামধর্মের সমস্ত কাজের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ কাজ। পবিত্র কোরআন বহু স্থানে বহুবার ঘোষণা করেছে, নির্মল অন্তর ব্যতীত কেউ আল্লার কাছে পরিত্রাণ পাবে না। পবিত্র কোরআন আরও বলে, কৃতকার্য ওই মানুষ, যার অন্তর পবিত্র। সুতরাং আল্লার কাছে কৃতকার্যতা অর্জন এবং অন্তরের স্বচ্ছতা অর্জন একই জিনিস। কোরআন ২ : ২৫, ১৮ : ১০৭, ২৩ : ১, ৮৭ : ১৪।

অন্তর-দর্পণকে স্বচ্ছ করার যে উপায় বা পন্থা, তা মানুষের মানবিক গুণ ব্যতীত আর কিছু নয়। যেমন বিবেকবুদ্ধি জ্ঞান-গরিমা সততা সাধনা সংযমতা সহিষ্ণুতা ধৈর্য, শৌর্য, দয়া-মায়া স্নেহশ্রদ্ধা, ভালবাসা ইত্যাদি আরও বহু। এই সমস্ত মানবিক গুণে যে যত উন্নত হয়, তার অন্তরও তত পরিষ্কার হয়। মানবিক গুণ-বিবর্জিত ধর্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপগুলো আল্লার কাছে শুধু অসার নয়, তাঁর কাছে মহাপ্রতারণা।

নামায রোযা হজ ও যাকাতে পাঞ্জে গানা বন্দেগি
দেখে না খোদা দেখেন না তিনি কোন্ পথে তব জিন্দেগি।
সৃষ্টিলোকে প্রীতিবিহীন প্রতিদিনের উপাসনা
নিখিল পিতার পূজার নামে প্রার্থনা নয় প্রবঞ্চনা।

ওই মানবিক গুণগুলো অর্জনের জন্য সাধারণ মানুষের চলার পথে একটি মেশিনারি প্রয়োজন হয়। ধর্ম সেই মেশিনারি। ধর্মের সাহায্যে মানুষ সহজে ওই গুণগুলো অর্জন করতে পারে। মানুষ যখনই কোন পাপ বা প্রলোভনে পড়তে যায় বা নুয়ে পড়ে, তখন ধর্ম তাকে শাসন করে ভয় দেখায়। এই শাসন ও ভয় সাধারণ মানুষের জন্য মঙ্গলকর হয়। সে তখন নিরাপদ স্থান খুঁজে পায়। এইভাবে অগণিত মানুষ ধর্মের আওতায় অনেকখানি নিরাপদ থাকে। ফলে তার মানবিক গুণরাশি অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং সেও মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। সুতরাং মানুষের জীবনে ধর্মের প্রয়োজন অনিবার্য ও অপরিহার্য। এই বিশ্বে যত শ্রেষ্ঠতম মানুষের শ্রেষ্ঠতম মানুষগুলো এই ধবাধামে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন—নবী কিংবা রসুল বা ধর্ম-অবতার। এই ভারতে আজ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবান বুদ্ধ অপেক্ষা অধিক সম্মান কোন মানুষই পান নি। এবং তাঁরা দুজনেই ধর্মীয় জগতের মানুষ। প্রতিটি দেশেই ঐ একই অবস্থা। কাছাছল আম্বিয়া তো তাঁদেরই জীবনকাহিনী।

'কাছাছল আম্বিয়া'তে দুটি জিনিসের ঘাটতি ও একটি জিনিসের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করলাম। এই গ্রন্থটি ইসলামি বাংলা সাহিত্যের একটি প্রখ্যাত গ্রন্থ। এই অধ্যায়ের কোন গ্রন্থই এত সুপরিচিত নয়।

ইসলামি বাংলা সাহিত্যের এটি একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাহিত্য তো সমাজের বা কালের নিরপেক্ষ দর্পণ। এই দর্পণে মানুষের বা নবীগণের সংসার জীবনের সুখ-দুঃখের সাড়া তেমন পাওয়া যায়নি। অথচ তাঁদের অধিকাংশই সংসারী ছিলেন। দ্বিতীয়, মানুষের মানবিক গুণাবলী সম্পর্কে তার বক্তব্য অসচ্ছল ও অনুজ্জ্বল।

তৃতীয়, যে কথাটিকে 'কাছাছুল আম্বিয়ার' লেখকগণ প্রাণ উজাড় করে বর্ণনা করেছেন, সেটি আল্লার একত্ব ও মহত্ত্ব এবং তিনি কি না পারেন ইত্যাদি। এ কথাগুলো আল্লাহ সম্পর্কে খুবই সত্য। কিন্তু কাছাছুল আম্বিয়ার লেখকগণের বক্তব্য হতে যেন একটি কথা বারবার বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ পাক যেন এই পৃথিবীতে কেবল নিজের একত্ব ও মহত্ত্ব প্রচারের জন্যই এত নবী ও রসুল পাঠিয়েছিলেন। আসলে যেন মানুষের নিজের কোন প্রয়োজন ছিল না। একথা আদৌ সত্য নয়। বরং মহান আল্লাহ মানুষেরই প্রয়োজনে যত নবী ও রসুল পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের সৎপথ দেখাতে। কিন্তু একথা ওই মহাগ্রন্থে পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠার অবকাশ পায়নি।

কাছাছুল আম্বিয়ার ভাব-ভাষা ও চিন্তাধারার উপর লক্ষ্য করলে বোঝা যায় বা বলা যায় যে, 'কাছাছাল' আম্বিয়া' যদিও একটি ছেঁড়া অপরিষ্কার ন্যাকড়া, কিন্তু সে যাকে মুড়িয়ে রেখেছে, তা একটি বিশাল হীরকখণ্ড। কালে কোন ভাল সেক্‌রার হাতে পড়লে বহু অমূল্য অলঙ্কার প্রস্তুত হতে পারে।

খয়রল হাসার

শেখ ওমরুদ্দিন,

পৃঃ ২৭৬, ১৩২৮ সাল

'কখরল হাসার' একটি নাম-করা পুঁথি। মুসলিম জাহানের বিশেষ বিশেষ কাহিনীগুলোকে একত্রিত করে এই পুঁথি বিরচিত। পবিত্র কোরআন ও হাদিস হতেও বহু কাহিনী সংগৃহীত। সব কাহিনীর বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তাই বর্ণনাসূচি দেওয়া হচ্ছে। কোথাও কোথাও কিছু নমুনা।

হযরত আদম সৃষ্টির বয়ান :

আব, আতশ, খাক, বাদ চারি চিজ দিয়া
পিয়ারা আদম ছফি দিলো বানাইয়া।...
সকল ফেরেস্তা যবে রহিল সেজদায়
আজাজিল খাড়া আছে দেখিল খোদায়।...
যে-অক্তে আদম সেই 'গণদম' খাইল
গণদমের একদানা হল্‌কে ঠেকিল।...
আদম-হাওয়া, আজাজিল তিনজনের তরে
জিবরাইল আসিয়া রাখে দুনিয়ার 'পরে।

কাবিল-হাবিলের বয়ান :

কাবিল বলিয়া নাম রাখিল বেটার
আক্‌লিমা বলিয়া নাম রাখিল কন্যার।...
সেই রূপে দিনে দিন গুজরিল যখন
হাবিল আর গাজ বিবি জন্মিল তখন।...
দুধ বদলিয়া তুমি শাদি দেলাইবে
হাবিলের সাথে বিবি আক্‌লিমারে দিবে।...
কাবিল মারিল যদি পাথর খেঁচিয়া
হাবিলের ছের গেল দু-ফাঁক হইয়া।

হযরত নূহ নবীর বয়ান :

হযরত ইব্রাহিম ও নমরুদের বয়ান।

হযরত মহম্মদ (দঃ) ও জাবেরের পুত্রবধের বয়ান :

জাবের বলিয়া এক জওয়ান আছিল
নবীজীকে সেই মর্দ দাওত করিল।...
আজ মেরা নছিবেতে শোন বিবিজান
আল্লার হবিব খাছ রসুল দেওয়ান
পাক মোবারক কদম এখানে আনিবে
সে কদম ধরিয়া যত পাপী তরে যাবে।...
জাবের তখনই এক বকরি লইয়া
জাবেরের ছেলে আর জাবের ধরিয়া
তক্‌বির বলিয়া তাহা জবাই করিল
জাবের চলিয়া ফের বাজেরেতে গেল।
এয়ছা অক্ত জাবেরের ছোট এক ছেলে
বড় ভাইয়ের কাছে এসে তাকে এই বলে—
বাবাজান কেমনেতে জবাই করিল
আমাকে ডাকিয়া কেন নাহি দেখাইল,
কেমনে ধরিয়া ছিলে দেহ ভাই বলে
কেমনে বকরির গলে ছুরি দিল তুলে,
তবে সেই বড় ছেলে তোফলি হালেতে
ছোট ভাইয়ের তরে বলে শোও জমিনেতে।

যখন শুইল সেই জমিনের তলে
বড় ভাই ছুরি দিল ছোট ভাইয়ের গলে।
এয়ছা জোরে ছুরি ধরে চালাইয়া দিল
লহুর ফোয়ারা ছুটে পাপড়ি ভেজিল।
ছটফট্ করে দম কাজা হল তার
কুদরত এলাহি ভাই বুঝে উঠা ভার।
জবাই করিল তারে গেল যেই ঘরে
সেই অক্তে জাবেরের বিবি এল ঘরে।
বাহিরে আসিয়া দেখে নজর করিয়া
ছোট ছেলের গলে ছুরি দিয়েছে চালাইয়া।
গোসাতে জ্বলিয়া বিবি ছুটিয়া আসিল
দেখিয়া সে বড় ছেলে পালাইয়া গেল।

পিছে পিছে তার বিবি তাড়া করে যায়
ভয়েতে যে সেই ছেলে চড়িল কোঠায়।
কোঠার উপরে চড়ে ছুটিল জোরেতে
এলাহির হুকুম ছিল গিরিল নিচেতে।

যেই অক্ত কোঠা হতে জমিনে গিরিল
দম কাজা হয়ে সেই তখনি মরিল।
দেখিয়া যে বিব তবে হইল অবাক
তাড়াতাড়ি কোলে নিল মুখে নাহি বাক্।
বেহুঁস বেতাব হালে ধরে জড়াইয়া
মরা ছেলে বুকে করে রহে দাঁড়াইয়া।
কিছুক্ষণ বাদে যদি হুঁশ বিবির হৈল
আছাড়-কাছাড় খেয়ে কাঁদিতে লাগিল।
আফছোছ করিয়া বলে হয়ে জারেজার—
এই বিধি লিখেছিলে নছিবে আমার।
ছোট ছেলে মারা গেল বড় ছেলের হাতে
বড় ছেলে মারা গেল মোর তাড়নাতে।
এই ছিল লেখা আল্লা নছিবে আমার
দুই বেটা কেড়ে নিলে হইনু লাচার।
বড়ই গমেতে বিবি করিল সবর
বুকেতে তুলিয়া দিল সবর পাথর।

কেননা নবীর কথা দেলেতে জাগিল
খানা খাইবার অক্ত তাঁহার হইল।
তাড়াতাড়ি করে বিবি দুই বেটা লিয়া
এক কেনারেতে রাখে কম্বল ঢাকিয়া।...
কি জানি দয়ার নবী ফিরে যদি যান
সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি খানা যে পাকান।
দাওত খাইতে নবী আসেন পৌছিয়া
জাবের দেখিয়া লিল আগে বাড়াইয়া।

যেই অক্ত খানা খেতে নবীজী বসিলেন
সেই অক্ত জিবরাইল হাজির হইলেন।
জীবরাই কহেন নবী, আল্লার ফরমান
জাবেরের দুই বেটা সঙ্গে করে খান
তিনজন এক সাথে খানাপিনা খান।
আল্লার হুকুম যাহা করিনু বয়ান।
যবে নবী গায়েবের আওয়াজ শুনিলেন
যাবেবের তরে বাত কহিতে লাগিলেন।
তোমার যে দুইবেটা আনগো ডাকিয়া
তিনজনে এক সাথে খাইব বসিয়া।

যেই অক্ত জাবেরেরে কহিলেন নবী
অন্দরে শুনিতে পাই জাবেবের বিধি।

শুনিয়া সে বিবি কহে জাবেরের তরে
খানা খেতে বলো! তুমি তারা নাই ঘরে।
জাবের শুনিয়া কহে নবীজীর তরে
ঘরে নাই তারা কোথা গেছে খেলিবারে।
আপনি যে খানা খান মেহের করিয়া
খেলা ভেঙে গেলে তারা খাইবে আসিয়া।

শুনিয়া যে নবী কহে তাহা না শুনিব
তিনজনে এক সাথে বসে খানা খাবো।
ত্বরায় করিয়া যাও আনগো ডাকিয়া
অন্দরেতে বিবি শুনে উঠিল কাঁদিয়া।
কাঁদন শুনিয়া জাবের পৌছিল তখন
কেন বিবি কাঁদ কহ সেই বিবরণ।
তবে তো কহেন বিবি নবীর সাক্ষাতে
গলাতে কাপড় বেঁধে জোড়ে দোন হাতে।
আসিয়া গিরিল বিবি কদম-রসুলে
আমাদের দুই বেটা কেমনে জানিলে।
যে-হাল হইল তাহা কি বলিব আর
বলিতে জ্বলিয়া উঠে কলিজা আমার।
আপন পতির কাছে নাহি বলি আমি
কি জানি জাহের হইলে না খাও তুমি।
কাঁদিতে কাঁদিতে বিবি কহে সেই বাত
আগে ঝুঁট বলেছিনু আপনার সাথ।...

সব শুনে নবী তবে বিবিকে পুঁছিল
মরা দুই ছেলে তবে কোথা আছে বল।
তবে বিবি নবীজীকে সাথে করে লিয়া
অদূরে কম্বল চাপা দিল দেখাইয়া।
আপে-নবী ছরোয়ার দীন-দুনিয়ার
আছমান তরফে হাত তুলে আপনার।
দোওয়া জারি মাঙ্গিলেন এলাহীর আগে
তবে নেদা আইল যে নবীজীর দিকে।
গায়েব আওয়াজ যদি শুনিতে পাইল
আওয়াজের মানে জীবরীল নবীকে কহিল—
কবুল হইল দোয়া আরশ মাকানে
কম্বল উঠাইয়া দেখ ছেলে দুইজনে।
শুনে নবী আওয়াজেতে খোস হইল জান
কম্বল ধরিয়া তোলে আপে দু'জাহান।
'কুম্ ব ইজনিল্লাহ্' বলে আওয়াজ করিল
'উঠো লড়কা' এলাহির হুকুম হইল।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ জবানে বলিয়া
আল্লাহু আক্‌বর ব'লে উঠিয়া বসিল
দেখিয়া জননী তাদের কোলে করে নিল।
জাবের দেখিয়া তবে তাজ্জব হইল
শাবাশ শাবাশ সকলে কহিল।
দুই বেটা নিয়ে নবী খানা খায় বসে
জাবের হইল খুশী মনের উল্লাসে।

খাইতে খাইতে নবী বুঝাইল বড়
গোস্ত-খাও চুষে চুষে হাড্ডি নাহি তোড়।
হাড্‌ডি সব এক সাথ রাখ মিলাইয়া
দস্তরখানা চাপা দেহ এলাহি ভাবিয়া।
শুনিয়া যে দুই ছেলে করে সেই কাম
দস্তরখানা চাপা দিল ফুরাইলে তাম।
তবে পাক মোবারক আপে ছরওয়ার
বিসমিল্লাহ বলিয়া ফুঁকে হুকুমে আল্লার
যেই অক্তে ফুঁক দিল হাড়্‌ডির ওপরেতে
কাম লট-পট করে ঝেড়ে ভেতরেতে
পর্দা উঠাইতে নবী হুকুম করিল
জিতা বকরি শিংদার উঠে খাড়া হৈল।

খয়রল হাসার প্রসঙ্গ আলোচনা :

'খয়রল হাসার' নামটি আরবী। তবে অশুদ্ধ। শুদ্ধ—'খাইরুল হাশর'। এর অর্থ হাশরের ভাল বা উত্থান দিনের ভাল বা পরকালের ভাল। গ্রন্থটি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে রচিত। এই দুনিয়াতে ভাল কাজ করলে পরকালে ভাল হবে, খারাপ কাজ করলে খারাপ হবে। নানা হিতোপদেশের কাহিনীও বর্ণিত আছে। স্বামীর সেবা করার জন্য স্ত্রীদের নানা উপদেশ-সহ বহু ভীতি প্রদর্শনও করা হয়েছে। এই গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ কাহিনী জাবেরের পুত্রবধ। এই একটি কাহিনীতেই বইটির জনপ্রিয়তা খুবই বেড়েছিল।

বার চাঁদের ফজিলত

মৌলবী আজহার আলি বখ্‌তিয়ার

মুসলমান সমাজে যত কিছু পালাপার্বণ পালিত হয়, সবই চাঁদ হিসেবে হয়ে থাকে। এমনকি অন্যান্য ধর্মগুলোতেও তাই লক্ষ্য করি। চাঁদের কিছু না কিছু মূল্যায়ন আছেই। প্রত্যেক চাঁদেই কিছু না কিছু ভাল জিনিস আছেই। তবে যে যে চাঁদে ইসলাম ধর্মের ভাল ভাল কাজগুলো সমাধা হয়েছে সেই চাঁদগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

লেখক ঘটনগুলোকে হাদিস অনুযায়ী বর্ণনা করতে দ্বিধাবোধ করেননি। ইসলাম ধর্মে যেগুলোর কোন গুরুত্ব নেই, লেখক সেগুলোর কড়া সমালোচনা করতেও দ্বিধা বোধ করেননি। যেমন মহরম মাসে বিবাহে কোন বাধা নেই। তবুও অনেকেই বিরত থাকে। ৬৮০ খ্রীঃ এ ১০ অক্টোবর বা ১০ মহরম ইমাম হোসেন (রাঃ) উমাইয়া গোত্রের চির কলঙ্ক গণতন্ত্রের কসাই বা বধকারী আমির মুয়াবিয়ার

বিশ্বজোড়া কুখ্যাত পুত্র নরাধর্ম ইয়াজিদের হিংস্র সেনাবাহিনী কর্তৃক অতীব নির্মমভাবে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম ঘটনার মধ্য দিয়ে কারবালা মরুপ্রান্ত সপরিবারে নিধন হন। কিন্তু এর সাথে ইসলাম ধর্মের বিধিনিষেধের কোরআন বা হাদিসজাত কোন সম্পর্ক নেই। তবে কারবালার অমানবিক ঘটনা সারা মুসলিম জাহানের বুকে চির-হৃদয়বিদারক সকরুণ স্মৃতি বহন করে।

জওরাকল ঈমান

আছগার। ১৩৩৫ সাল

জওরাকের মানে কিস্তীশুন দীনদার
যে-চড়িবে পারে যাবে ফজলে খোদার।

'জওরাকল ঈমান' শব্দের অর্থ ঈমানের তরী। এই পুঁথিটিতে কল্পনার কোন অবকাশ লক্ষ্য করিনি। সব কথাগুলোই সুন্দর। হাদিসমতে লেখা।

কে আপন : বড়ই আপন জেন পরয়ার দেগার
বড়ই দুশমন জেন নাফস্ আপনার।

উত্তম নেকী : উপকার উত্তম নেকী সব নেকী চেয়ে
ফরমিল হযরত আলি বয়ান করিয়ে।

উপকার : উপকার কর ভাই খোদার বান্দার
তবে তো করিবে খোদা তব উপকার।

শ্রেষ্ঠ মানুষ : যে করেছে তারে তোরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বল
মানুষের সেরা আর মানব-মঙ্গল।

সাত জনের তিন বস্তু পছন্দনীয় :

১। রসুলে খোদা : ফরমিল হযরত আপে এই দুনিয়াতে
তিন চিজ ভালবাসি সব চিজ হইতে—
খোসবু আওরত আর নামায দুনিয়ায়
দেলেতে আরাম পাই নয়ন জুড়ায়।
খোসবুতে মগজ তাজা আওরাতে কারার
নামাজে ঈমান তাজা কহে পয়গম্বর।

২। হযরত আবু বকর (রাঃ) খাসবাত কহিলে তুমি রসুল খোদার
আমাঁর পছন্দ তিন চিজ দুনিয়ার।
রসুলের মুখ দেখা রসুল খোদার
সর্বস্ব খরচ করা মাল আপনার।
আর যে আমার বেটি রসুল খেদমতে
থাকিলে থাকিবে রেস্তা রোজ কিয়ামতে।

৩। হযরত ওমর (রাঃ) বাতান নেকের রাহা মানা বুরাইতে
আর যে পুরানা বস্ত্র, এই তিন বাতে।

৪। হযরত ওসমান (রাঃ) ভুখাকে খেলান আর লাঙ্গাকে বস্তর
আর যে কোরআন পড়া এ তিন বেহতর।

৫। হযরত আলি (কঃ) : গরমিকালে রোযা রাখা খাতের মেহমান
আর যে জেহাদ করা মারা তলোয়ার।

৬। ফেরেশ্‌তা জীবরাইল (আঃ): জীবরিল্ কহেন যেবা রাহা ভুলে যায়—
তাহাকে রাহাতে আনা পছন্দ আমায়।
আর মহব্বত করা গরিব কাঙাল
জেন্দেগি বন্দেগি করে রাখে যে বাহাল।
৭। আল্লাহ্ পাক : আল্লার বান্দার হইতে এ তিন খছলত
পহেলা খরচ করে যে মত তাকত্।
আর কাঁদকাটা করা হয়ে গোনাগার
আর যে ছবর করে, না হয় বেকারার।
ভাল কাজ : সকল বন্দেগি হতে দুনিয়ার মাঝ-
আল্লার ডরেতে কাঁদ ভাল এই কাজ।

ছহি আবুসামা

জয়নাল আবেদিন

১৩৩২ সাল

'আবু সামা' ইসলাম জগতের একটি নামকরা কাহিনী। মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর জীবিতকালের ঘটনা। সেই যুগের মানুষ ও বিচার ব্যবস্থা উভযই কত নিখুঁত ছিল, 'আবু সামা' কাহিনী তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। যুবক-যুবতীর একত্র বাস বা নির্জনবাস কত ভয়াবহ হতে পারে, আবু সামা ঘটনা তার একটি ভয়াবহ দৃষ্টান্ত।

মহানবীজীর (সাঃ) শ্রেষ্ঠতম যুগ চলছে। শ্রেষ্ঠতম যুগের শ্রেষ্ঠতম বিচারক হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)। তাঁর ছেলের নাম আবু সামা। জ্ঞানে ও গুণে তুলনাহীন। মহানবীজীর (সাঃ) অতীব স্নেহধন্য। তখন একটি ঘটনা ঘটল, ঘটনাটি আবু সামা নামেই পরিচিত। আবু সামার জীবনে তিনটি জিনিস প্রমাণের কোন অপেক্ষা রাখল না। (১) ভুল মানুষের চিরসঙ্গী, ভ্রান্তি মানুষের চির সাথী। (২) পবিত্র কোরআনের নির্দেশমতো ব্যভিচার করাটাই কেবলমাত্র দোষণীয় নয়, ব্যভিচারের কাছে যাওয়াটাও নিষেধ। এই নিষেধাজ্ঞা না মানলে কোন রক্ষা নেই। ১৭ ঃ ৩২। (৩) মানুষ প্রাণ দিয়েও তার পৌরুষকে অমর করতে পারে। আবু সামা তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

মহানবীজীর (দঃ) ওফাতের পর যে চারজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা ইসলামজগতে সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত, তাঁদের মধ্যে হযরত ওমর ফারুক অন্যতম। কেবল তাই-ই নয়। তাঁকেই ইসলামি সাম্রাজ্যের সত্যিকারের প্রতিষ্ঠাতা (Real builder of Islamic State) বলা হয়। আবু সামা সেই বিশ্ববিখ্যাত ওমরের পুত্র।

মহানবীজী (সাঃ) নিজে আবু সামাকে দিয়ে মসজিদে নববীতে কোরআন তেলায়াত করাতেন এবং বহু গণ্যমান্য সাহাবীগণও সেখানে থাকতেন। আমরা এখানেই বোঝাতে পারছি আবু সামা কত মহান চরিত্রের যুবক ছিলেন। জীবনে একবার ভুল করেছিলেন। কিন্তু মিথ্যার আশ্রয়ে আপন অমিত পৌরুষকে ম্লান করেননি।

ঘটনা : বেগম নামে একটি বিধবা মেয়ে লোক। যার জন্ম মালিকুলে। তার একটি মাত্র মেয়ে। যার নাম পিঞ্জিরা। একদা বেগম কোন কাজবশত বাইরে যায়। সেদিন সন্ধ্যায় ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বেগম আর বাসাতে ফিরতে পারল না। কন্যা পিঞ্জিরা একাকী থেকে যায়।

অন্যদিকে, আবু সামা কোন কাজে বাইরে যায়। ঝড়ের ভীষণ ক্ষণে সে ওই বেগমের কুঁড়েঘরের সামনে পড়ে। সেখানে আশ্রয় নেয়। রাত্রি বাড়তে থাকে। ঝড়ের গতিও কিন্তু বাড়তে থাকে। অবশেষে

যুবতী কন্যা পিঞ্জিরা তাঁকে ঘরের ভিতর আসতে অনুরোধ করে। আবু সামা তার অনুরোধে ভেতরে গেল। উভয়েই রাত্রি কাটাল। কিন্তু রাত্রিতে দুর্বল ক্ষণে উভয়েরই পদস্খলন ঘটল। দৈহিক মিলনের ফলে কন্যা গর্ভবতী হল। সকালে আবু সামা চলে গেলেন। মা ফিরে এলো। জানতে পারল ঘটনা। কন্যা সত্য গোপন করেনি।

বেগম প্রধান বিচারপতি হযরত ওমর ফারুকের কাছে গেল। সব কথা জানাল। বিচারপতি পুত্র আবু সামাকে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন। সারা সমাজে হই-হইপড়ে গেল। সকলেই হতবাক্, হতবুদ্ধি।

আবু সামার মা স্বামী ও প্রধান বিচারপতি হযরত ওমরের কাছে পুত্রের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। কিন্তু তা অগ্রাহ্য হল। অতঃপর আরম্ভ হল অনুরোধের পালা। চার খলিফাকেই পরপর অনুরোধ করা হল। কোন কাজ হল না। বিবি ফাতেমাকে অনুরোধ করা হল। মহানবীজী (সাঃ) জানিয়ে দিলেন। বিচারপতি ওমর যে বিচারই করুন, তাতে তিনি কোন রূপেই আপত্তি তুলবেন না। কিন্তু বিচারপতি ওমর বিচারে অনড় থেকে নিজ হাতে পুত্রের প্রাণদণ্ড ঘোষণা করলেন। একশো ঘা দোররা মারার হুকুম দিলেন। দোররা বরদার আশি ঘা মারার সঙ্গে সঙ্গে আবু সামার প্রাণ পাখী পিঞ্জর ছেড়ে চলে গেল। এবার দোররু বরদার জিজ্ঞাসা করলেন। বাকি কুড়ি ঘা কি হবে। বিচারপতি নির্দেশ দিলেন— কাফন-দাফনের পর কবরে মারতে হবে। তাই করা হল।

পুত্র আবুসামা প্রাণ দিয়ে পৌরুষকে বাঁচালেন। পিতা আপন হাতে পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে বিচারের আসনকে চির মর্যাদা দিয়ে গেলেন। কিন্তু একটি কথা এখানে রয়ে গেল, ইসলামি বিধানে মৃতের কোন শাস্তি নেই। তাহলে মৃত আবু সামার কবরে কি ভাবে দোবরা মারা হল? মনে হয় এটা অতিরঞ্জন। যে ইসলামি বিধানে তাঁর মৃত্যু হল, সেই মৃত্যুকেই কেন্দ্র করে কিভাবে ইসলামি বিধান লঙঘন করা হবে। তা বোধগম্য নয়। তাই এটা বাড়াবাড়ি, কল্পনামাত্র মনে হয়।

প্রসঙ্গ :

আবু সামার ঘটনা হতে আমরা কয়েকটি শিক্ষণীয় জিনিস পেলাম। মৃত্যুর পর আবু সামা পরপর তিন রোজ পিতার সঙ্গে কবরের নামাজ পড়েন। একদিন আবু সামার মায়ের চোখে এই ঘটনা পড়ে যায়। তখন মা তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর সঙ্গে কে নামাজ পড়ছিল। পিতা বা স্বামী বলেন, ও-কথা বললে ক্ষতি হবে। কিন্তু স্ত্রী নাছোড়বান্দা। তখন স্বামী বললেন, তিনি বলতে পারেন, যদি তিনি (স্ত্রী) উচ্চস্বরে না কাঁদেন। স্ত্রী এই কথাতে সম্মত হলে স্বামী (ওমর রাঃ) তখন বললেন যে তাঁর সঙ্গে তাঁর ছেলে আবু সামা নামাজ পড়ে। তখন মা আর থাকতে না পেরে জোরে কেঁদে ফেলেন। এরপর হতে আবু সামা আর নামাজ পড়তে আসেন না। তখন মা কারণ জিজ্ঞাসা করলে ওমর রাঃ উত্তর দেন যে, পুত্র তাকে জানিয়েছেন, মায়ের চোখের জল সাগরে পরিণত হওয়ায় সে আর সাগর পেরোতে পারছে না। ইসলামি বিধান মতে খুব জোরে কাঁদা ঠিক না।

ব্যাভিচারের নিকটবর্তী হওয়া অর্থাৎ যুবক-যুবতীর একটি নির্জন বাস ঠিক নয়। পিতা ওমর পুত্রের প্রাণদণ্ড দিয়েও বিচারে মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখলেন। পুত্র আপন প্রাণকে বিসর্জন দিয়েও আপন পৌরুষকে বাঁচিয়ে গেলেন।

কিন্তু এই ঘটনাতে কিছু জিজ্ঞাসা উঠেছে।

(১) ঘটনা ঘটল আরবের মদীনাতে। যাদের ভাষা আরবী কিন্তু যুবতীর নাম 'পিঞ্জীরা' হল কি করে। আরবী বর্ণমালাতে 'পে' বলে কোন অক্ষর নাই। (২) এতবড় বিশাল ঘটনায়, মায়ের নাম, পিতার নাম জানা গেল না কেন? (৩) যুবতীর পরিণতি কি হল, জানা গেল না কেন? (৪) ব্যাভিচারের শাস্তি সম্পর্কে পবিত্র কোরআন কি বলে। ২৪ : ২, ৪ : ১৫, ১৬, ২৫

(১) যদি চারজন সাক্ষী দ্বারা ব্যাভিচার প্রমাণিত হয়, অথচ তারা নিজেরাই দোষ স্বীকার করে। তখন শাস্তি প্রাণদণ্ড। ৪ : ১৫।

(২) যদি তারা নিজেদের সংশোধন করে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন তাদের ক্ষমা কর। (এখানে প্রাণদণ্ডের শাস্তি রহিত হয়ে গেল) ৪ : ১৬।

(৩) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, ওদের উভয়কেই একশো বেত্রাঘাত কর। ২৪ : ২

(৪) ব্যভিচারিণী দাসীর শাস্তি ব্যভিচারিণী স্বাধীন নারীর অর্ধেক। ৪ : ১৫।

আমরা ৪ : ১৬ আয়াতে পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করলাম যে ব্যভিচারের শাস্তি প্রাণদণ্ড ক্ষমাযোগে রহিত। পবিত্র কোরআনের নির্দেশমতো কেউ ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করতে হবে। অন্তত একবার। আমাদের দ্বিতীয় কথা, কোরআনের ৪ : ১৫ আয়াত অনুসারে ব্যভিচারিণী দাসীর শাস্তি ব্যভিচারী স্বাধীন নারীর অর্ধেক। যদি স্বাধীন ব্যভিচারিণীর শাস্তি প্রাণদণ্ড হয়, তাহলে দাসীর শাস্তি প্রাণদণ্ডের অর্ধেক হবে কি করে? প্রাণদণ্ড তো দুভাগে ভাগ হতে পারে না। সুতরাং ব্যভিচারের শাস্তি একশ' ঘা বেত্রাঘাত। প্রাণদন্ড নয়। তবে কোরআনের মতে প্রথমবার ক্ষমাই শ্রেয়।

এখানে আমাদের প্রশ্ন, আবু সামা প্রথমবার ক্ষমা পেলেন না কেন? আমাদের মনে হয়, তখনও সূরা নিসা অবতীর্ণ হয়নি। লক্ষ্য করছি সূরা নিসার আদি সংখ্যা ৯২। এর অর্থ সূরা নিসা মহানবীজীর (সাঃ) জীবনের একেবারেই শেষের দিকে সূরা। কোরআনে মোট সূরা ১১৪। এদের মধ্যে সূরা নিসার সংখ্যা ছিল ৯২। অর্থাৎ শেষের দিকের সূরা। যদিও তার বর্তমান সংখ্যা মাত্র ৪।

মহানবীজীর (সাঃ) জীবনের শেষের দিকে লক্ষ্য করি, একবার এক ব্যভিচারী প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। তাকে ধরে এনে প্রাণদণ্ড দেওয়া হলেই নবীজী বলেন—"কেন ধরে আনলেন।" আর একবার একজনের প্রাণদণ্ড দেখে মানুষ নবীজীর (দঃ) কাছে এসে বললে, তিনি বলেন—তোমরা কাপড় দ্বারা পাথর আটকাতে পারতে।"

আমাদের মনে হয়, মানুষ ভুলবশত অন্যায় করে মৃত্যুর মুখোমুখি হলে দয়ার নবীর (দঃ) মন ও হৃদয় কেঁপে উঠত। ব্যভিচারে আর যাই হোক, কোন ব্যক্তি-মানুষের ক্ষতি হয় না। সমাজের ক্ষতি হয়। কিন্তু ধর্ষণে নারীর প্রতি অত্যাচার করা হয়। ব্যভিচার ওইরূপ নয়। তাই দয়ার নবী (দঃ) ক্ষমার চোখেই দেখতেন। বলতে নেই, তখন নবীজীর (দঃ) চোখ ও আল্লার চোখ তো একই ছিল। ৪ : ৮০, ৮ : ১৭, ৪৮ : ১০। এইজন্যই মনে হয়, আল্লাহপাকও ব্যভিচারকে ক্ষমার চোখে দেখলেন। ৪ : ১৬।

হায়রাতুল ফেকা

মৌলবী আতাউল্লাহ

সন ১৩২৬ সাল। পৃঃ ৩৬

হায়রাতুল ফেকা একটি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। এরূপ গ্রন্থ খুবই কম দেখা যায়। এটি ইসলাম জগতের একটি ফতোয়া বিশিষ্ট গ্রন্থ। বহু জটিল প্রশ্নের মীমাংসা এখানে আছে। প্রশ্নগুলো অনেকটা শ্লোকের মতো। কিন্তু উত্তর বের করা হয়েছে কোরআন ও হাদিস মতে। মুসলিম সমাজজীবনে তখনকার দিনে এগুলো খুবই চলত। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলছি যে, এক বিবাহ মজলিসে কনের পিতা কে বা অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, এতদিন তাঁর বা তাঁদের মেয়ে কার সঙ্গে ছিল? উত্তরে তিনি বা তাঁরা বললেন—'ঈমানের সঙ্গে ছিল'। এইভাবে তখনকার দিনে ইসলামি পুঁথি-সাহিত্য ইসলাম ধর্মকে অতিব সাধারণ মানুষের কাছাকাছি করে দেশের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পেরেছিল। ইহা কম কিছু নয়। ঐ সমস্ত প্রশ্ন উত্তরের দু একটি নমুনা স্বরূপ তুলে ধরছি।

ইসলামি বাংলা সাহিত্য বাংলার সাহিত্যকেই পুষ্টিদান করেছিল। এবং ইসলাম পুঁথি-সাহিত্য ইসলাম ধর্মকে মানুষের ঘরে ঘরে এনে হাজির করেছিল।

প্রশ্ন ঃ হামেলা আওরত দুই-এক ঘরে ছিল
আজকার ঘরে দোন খালাছ হইল।
কাজীর নিকটে গিয়ে নালিশ করিল
কোন্ ছেলে কারে দিবে বিচার কর কইল।

উত্তর ঃ ছোট ছোট দুই শিশি লিবে মাঙ্গাইয়া
ওজনেতে বরাবর লিবে তওলাইয়া।
দোন আওরতের দুধ ওজন করিবে
যার দুধ ভারি হবে লড়কা তাকে দিবে।

এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, পুত্রের জননীর বুকের দুধ গাঢ় বা ঘন, তাই কন্যার জননীর বুকের দুধ অপেক্ষা ওজনে ভারী। কন্যা জননীর বুকের দুধ পাতলা, তাই ওজনে কম।

ছওাল ঃ বিবি এক বসেছিল রাহের উপরে
পৌছিল মরদ এক তাহার গোচরে।
পুছিল বিবিকে কেন আছ রাহাপরে
কহিল খছম আমি চাহি করিবারে।
কহিল সে মর্দ কর কবুল আমায়
শুনিয়া সে বিবি করে কবুল তাহার।
সেই মরদ গিয়ে তার বসিল হুজুরে
দোছরা মরদ আসি পুছিল বিবিরে
কি কারণে চিন্তাযুক্ত আছ হেথা তুমি
কহিল খছম এক তলব করি আমি।
সে মরদ কহে তবে নেকা কর মোরে
শুনিয়া কবুল বিবি করিল তাহারে।
তারপর সেও গিয়া বসিল নজদিগে
তেছরা মরদ আসি কহে বিবির আগে
কি জন্য বসেছ হেথা হয়ে পেরেসান
বিবি বলে খছম আমি চাহি মেহেরবান।
কহিল সে মরদ নিকা কর না আমায়
বিবি বলে কবুল তবে করিনু তোমায়।
পরে তারা তিন মরদ করিল লড়াই
তিনি কহে মেরাজরু আমি একে পাই।

জওাব ঃ তাহার জওাব এই সোন সবে ভাই
পহেলা দু'জনের কোন গাওয়া দুই নাই।
তেছরার নেকা ছহি এই জন্য হইল
আগেকার দোন মর্দ গাওা তার রইল।

ইসলামি বিধানে বিবাহে দু'জন সাক্ষী থাকতে হবে। এখানে প্রথম জনের কোন সাক্ষীই ছিল না। দ্বিতীয় জনের একজন সাক্ষী ছিল। অর্থাৎ প্রথম জন। এবং তৃতীয় জনের দু'জন সাক্ষী ছিল, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় জন। তারা বিবাহের কথা শুনেছিল। তাই তৃতীয় জনের বিবাহ সিদ্ধ হল।

প্রশ্ন ঃ সকল মসজিদে আছে কোন্ জায়গা হয়
নামায পড়িলে মকরুহ সে জায়গাতে কয়।

উত্তর ঃ সেই জায়গা মকরুহ্ হয় মসজিদের বীচে
আপন কারণে কেহ্ করে লয় খাছে।

ইসলামি বিধানে আল্লার মসজিদে বাদশাহ্ ও ফকিরের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। সবার অধিকার সমান।

মোহ্ছেনল এছলাম

মৌলবী মোহম্মদ ছাজ্জাদ আলি

সন ১৩২৬ সাল, পৃঃ ৮২

'মোহছেনল এছলাম' একটি উপদেশমূলক শাস্ত্রীয় পুঁথি। এতে ৭৮টি উপদেশ আছে। নমুনা স্বরূপ দু'একটির উল্লেখ করলাম।

১। সহস্র প্রেমিক যার পিছে বিরাজিত
প্রণয় তাহার সাথে নাহিক উচিত।
হেন প্রেমিকার সাথে প্রণয় করিলে
বিরহ অনলে দগ্ধ হবে চিরকালে।

২। যে জন ভাবিয়া করে কার্য আপনার
ভুল নাহি হয় কভু কাজেতে তাহার।

৩। পেসাব-পায়খানার যবে হাজত হইবে
তখনই উঠিয়া যাও, দেরি না করিবে।

৪। উত্তম স্বভাব যার এ ভাব মাঝার
তিনিই প্রকৃত নর শোন বাক্য সার।

৫। যে করে বেহুদা খরচ কারণে তাহার
শয়তানের ভাই কহে পাক পরওয়ার।

৬। চার চিজ এমন ভাই আছে দুনিয়াতে
বড়ই মজবুত করে বদন তাহাতে।
প্রথমেতে গোস্ত খাওয়া ওহে বেরাদর
খোসবু সোঙ্গা হামেসায় দ্বিতীয় তাহার।
তৃতীয় গোছল ভাই কর হরদিন
চতুর্থ লেবাছ সাফ্ রাখিবে মোমিন।
মেহনতের কাজ করি পছিনা সহিত
গোছল করা কখনও নাহিক উচিত।

লিখেছেন সেখ ছাদি গোলেস্তা কেতাবে
সত্য-মিথ্যা পরীক্ষায় জানিতে পারিবে।
ধার্মিক হইতে যদি করেছ মনন
শেখ সাদির উপদেশ করহ্ গ্রহণ।

সারা পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক জগতে মহাকবির সাদীর মতো কবি খুবই কম। বলতে গেলে দুর্লভই। মহাকবি সাদী একদিকে ছিলেন মহাকবি, অন্যদিকে ছিলেন কামেল পুরুষ, অলি-আওলিয়া-মানুষ। মহাকবির সাদীর উপদেশ বাণী সারা বিশ্বের মহামূল্যবান সম্পদ। তিনি আধ্যাত্মিকতায় আল্লার আরশ স্পর্শ করে কামালিয়াতের স্তরে হাজির হয়েছিলেন।

আহকামল জবে

মোছন্নেফ্

মুন্সী আমানুল্লাহ ও মুন্সী আয়জদ্দিন আহম্মদ

সন ১৩২৬ সাল, পৃঃ ১৬

'আহকামল জবে' একটি শাস্ত্রীয় পুঁথি। ইসলামি বাংলা সাহিত্যে এরূপ পুঁথি বিরল। ইসলামধর্মে নয়। বরং মুসলিম সমাজে চারটি 'মজহাব' বা দল আছে। এই চারটি দল ইসলামধর্মকে ভিত্তি করেই। ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থ কোরআন ও হাদিসে এমন অনেক জিনিস আছে, যার ব্যাখ্যা এক থেকে একাধিক হতে পারে। এইভাবে নানা মতামতকে কেন্দ্র করে চারটি দলের উৎপত্তি হয়েছে। কোন্ দলের কাছে কোন্ প্রাণী হালাল বা হারাম, এই পুঁথিটিতে তারই একটি ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে। দলগুলোর নাম—১। ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতামতকে কেন্দ্র করে হানাফী মাজহাব, ২। বিশ্ববিখ্যাত কামেল ও সুপণ্ডিত ইমাম শাফীকে কেন্দ্র করে শাফী মাজহাব, ৩। ইমাম মালেককে কেন্দ্র করে মালেকী মাজহাব, ৪। ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বলকে কেন্দ্রকে হাম্বলী মাজহাব।

কোন্ কোন্ প্রাণী কত বছরে কোরবানীর জন্য দোরস্ত :

১। উট— পাঁচ বছর
২। গরু-মহিষ— দু'বছর
৩। ছাগল-ভেড়া— ছয় মাস
৪। দোম্বা— ছয় মাস।

ছহি মেছবাহল ইসলাম

মুন্সী ফছিহ্উদ্দীন

১২৭৯ সাল ১লা কার্তিক

১৮৭২ খ্রীঃ ১২ অক্টোবর

১২৯৮ হিজরী, পৃঃ ১৩২

'মেছবাহল এছলাম' ইসলাম ধর্মের একটি নীতিশাস্ত্রমূলক পুঁথি। এই পুঁথিটি জাওরাকল ঈমান জাতীয় গ্রন্থ। এইরূপ আরো অনেক গ্রন্থ আছে। যাদের দীনিয়াত বলা হয়ে থাকে। বর্তমান কালে এই অমূল্য গ্রন্থগুলোর মূল্য সমাজে অনেকটা কমে গেছে। তার একমাত্র কারণ যুগের পরিবর্তন। তবে মনে রাখতে হবে, এই যুগ পরিবর্তনে সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্য সম্পদগুলোও এ যুগে অনেকটাই স্মৃতির আড়ালে চলে গেছে। তাই বলে তাঁদের মূল্য হ্রাস হতে পারে না। বিশ্ববিজয়ী মহাবীর বয়সের ভারে একদিন তো নুয়ে পড়বেই।

আম্‌সে পারা

অনুবাদক : মৌলবী মোহাম্মদ ইউসুফ। ১৩৩০ সাল

'আম্‌সে পারা' কোন পুঁথি নয়। পবিত্র কোরআনকে মোট ত্রিশটি ভাগে বা অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এক-একটি ভাগের নামকরণ—'পারা'। সর্বশেষ পারাটিকে আম্‌সে পারা বা আমপারা' বলা হয়। এই পারার প্রথমেই 'আম্মা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাই একে 'আম-পারা' বলা হয়ে থাকে।

এই গ্রন্থটি কিন্তু 'আমপারার' অনুবাদ নয়। এটা বাংলা উচ্চারণে বা বাংলা অক্ষরে লেখা মাত্র। পূর্বে মুসলমানগণ কোরআনকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে ভয় পেতেন। যদিও কোরআন মানুষের আপন আপন ভাষায় বোঝার জন্য অনুবাদ করতে খুবই উৎসাহ দান করেছে। ১৪ : ৪, ১৯ : ৯৭,

২০ : ১১৩, ৪৪ : ৫৮। কিন্তু কোরআনের এই উৎসাহদানকে আমাদের মৌলবী মাওলানাগণ প্রথম দিকে ধরতে পারেননি। বরং বিপরীতই বুঝেছিলেন। মৌলবী-মাওলানাগণের ওই রকম একপেশে সিদ্ধান্তের ফলে আজ পৃথিবীজুড়ে অন্য জগতের জ্ঞানী-গুণীগণ ধর্মের অঙ্গনে নেমে পড়লেন। এটাকে ইসলামের ইতিহাসের উন্নতির Milestone ও Turning point বলা যেতে পারে।

হাজার মছলা

মুন্সী মোহাম্মদ জান, ১৩০৯ সাল

হাজার মছলা পুঁথিটি ইসলাম ধর্মের বিবিধ শাখা-প্রশাখাকে কেন্দ্র কবে বিরচিত। কোন কাহিনী বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা প্রশ্নের উৎপত্তি হয়েছে। এবং ওই প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করে উত্তর রচিত হয়েছে। গ্রন্থ রচনা করার এটা একটা ধারা। এই রূপ গ্রন্থ থেকে ইসলামের বহু জিনিস জানা যায়, অথচ পাঠক-মন ক্লান্তি বোধ করে না। সে যুগে এরূপ পুঁথিগুলো সমাজে সমাদর লাভ করেছিল। এ পুঁথিতে মহানবীজীকে (সাঃ) প্রশ্ন করছেন মুসার (আ) উন্নত ইহুদি গোত্রের সন্তান আব্দুল্লাহ ফাজেল।

আব্দুল্লাহ্ ফাজেল আছে খয়বর শহবে।
মুসার উম্মতে পয়দা ইহুদির ঘরে।...
তিন কেতাবের আলেম নহে সে জাহেল
সাতশো সাগবেদ তার তামাম ফাজেল।

ছহি বড়

দোওয়া গঞ্জল আরশ

মোহাম্মদ কোরবান আলি। ১৩০৭ সাল

'দোযা গঞ্জল আরশ' ইসলাম জগতেব একটি নামকরা দোযা। মুসলিম জনসাধাবণের মধ্যে এই দোয়ার প্রভাব অতীব উর্ধ্বে এমন অনেক ধর্মভীরু মুসলমান আছেন, যাঁরা সরল মনে এই দোয়াকে পবিত্র কোরআনের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে থাকেন।

দোয়ার মোর্তবা :

জিব্রীল কহিল শোন দীন পয়গম্বর
কালি যদি হয় ভবেব তামাম সাগর।
যত বৃক্ষলতা সবে কলম হইলে
আছমান জমিন সব কাগজ করিলে
ফেরেশ্‌তা আদম আর জীবজন্তু যত
কিয়ামত তক যদি লিখে অবিরত
দোওয়ার মর্তব্যা তবু না হবে শোমার
সত্য কথা কহি শোন নবী ছরওয়ার
এই দোয়া যারা সবে পড়ে দুনিয়ায়
তিন কেরামত খোদা দিবে তা সবায়।
পহেলা ঈমান তার রবে ছালামত
ঈমানের সাথে তার হইবে মউত।

দুয়ে, বেশী হবে তার রুজি ও রোজগার
কদাচিত কোন মতে না হবে লাচার।
তিনেতে দুশমন তার কেহ না হইবে
বিষম বিপদে সেই খালাস পাইবে।

তোহ্‌ফা-১৭৫ হিঃ ১৩৯০ খ্রীঃ

ইউসুফ্‌গদা

অনুবাদ ঃ মহাকবি আলাওল, ১৬৬৪ খ্রীঃ

মূল গ্রন্থ তুহ্‌ফা-ই-নাসাইহ্‌। ইউসুফ গদা তাঁর ছেলেকে কেন্দ্র করে এই উপদেশ গ্রন্থটি লেখেন। পরবর্তীকালে মহাকবি আলাওল এর একটি পদ্যানুবাদ করেন। গ্রন্থটি একটি মূল্যবান শাস্ত্রীয় পুস্তক। নানা বিধিনিষেধে ভর্তি। সংসারজীবনে মানুষ কীভাবে চলবে পুস্তকটিতে তার একটি বিশাল বর্ণনা আছে। মানুষের চরিত্র ও সমাজ গঠনে এর মূল্য অপরিসীম। লেখক ইউসুফগদা ছিলেন বিখ্যাত সূফী শায়খ মহম্মদ নাসিরুদ্দিন চেরাগে দিল্লির প্রিয়তম শিষ্য।

হাবিল-কাবিলের কেচ্ছা

মৌলবী আব্দুস সোবহান

সাকিন : রামনগর, ১৩২৩ সাল, পৃ. ৭১

হাবিল কাবিলের কেচ্ছা একটি প্রাচীন কাহিনী বর্ণনা। আদি পিতা আদমের দুই সন্তান। কাবিল ও হাবিল। আদি পিতা ও আদি মাতাব যখনই সন্তান হত, তখনই একটি ছেলে ও একটি মেয়ে এক সঙ্গে হত। কাবিল ও আফ্‌লিমা বেহেশতে জন্ম নেয়। এবং হাবিল ও তার বোন মর্ত্যে জন্ম নেয়। ওদের বিবাহের জন্য আল্লাহ্‌ আদমকে নির্দেশ দিলেন—জমজ ভাই বোনদের পাল্টাপাল্টি করে বিয়ে দিতে হবে। সেই মতে পরমা সুন্দরী আকলিমা হাবিলের ভাগে পড়ে। এবং হাবিলের বোন কাবিলের ভাগে পড়ে। এতে কাবিল বাদ সাধল। এবং হাবিলকে হত্যা করল। এইটাই মূল কাহিনী।

মোর ভগিনী আকলিমা রূপসী সন্দরি
জার তুল্য নাহি দেখি নূর হুর পরি।...
পাথর পড়িল জবে ছীঁরে হাবিলের
মস্তক ভাঙ্গিয়া শেষ হইল আখেরে।

আমরা এই পুঁথিটিতে লক্ষ্য করলাম, এই পৃথিবীতে প্রথম হত্যাকাণ্ড নারীকে নিয়ে। নারীদেহের সৌন্দর্য ও জগতের সম্পদ, এই দুটোই পুরুষকুলকে পাগল করে ছেড়েছে। কেবলমাত্র মানবকুলেই নয়, পশু বা জীবকুলেও একই সত্য নিহিত। একটি পশু আর একটি পশুকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না কেবল নারী-পশুর জন্য।

এরসাদুন্নবী

অর্থাৎ, গোলজারে হাদিস/মৌলবী মোহঃ সাজ্জাদ আলি

'এবসাদুন্নবী' একটি শাস্ত্রীয় বাণীসম্ভার। এতে অন্য কিছুই নেই। কেবল হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বাণীসম্ভার। যাকে ইসলামি পরিভাষায় হাদিস বলা হয়। এরসাদ শব্দের অর্থ আদেশ বা উপদেশ।

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বাণীগুলো কেবলমাত্র পারলৌকিক পথনির্দেশ নয় যা ইহকাল ও পরকাল দুই কালকেই পরিব্যাপ্ত করে আছে। এই গ্রন্থে মোট ১১৩টি হাদিস আছে।

কয়েকটি হাদিস :

১। যদি পিতা-মাতা উভয়েই এক সঙ্গে ডাকে, তাহলে মায়ের ডাকে প্রথম সাড়া দেবে।
২। সর্বদাই পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।
৩। বড় ভাইকে পিতার মতো জ্ঞান করো।
৪। ব্যভিচার হতে দূরে থেকো।
৫। আল্লার কাছে তত্তবা কর আমি আল্লার নবী হয়েও দৈনিক এক শবার তত্তবা করি।
৬। দীনদরিদ্রের প্রতি দয়া করো।
৭। মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর।
৮। যে ব্যক্তি তোমার অসুখে আসে না, তুমি যেয়ো।
৯। তোমাদের সামান্য ইচ্ছাও আল্লার কাছে জানিয়ো যদিও তা নুন হয়।
১০। শিক্ষাগুরুকে প্রাণপণে ভক্তি করো।
১১। পত্রের উত্তর দিও।
১২। ধৈর্য এমনই সম্পদ, যার বর্ণনা নেই।
১৩। হামেশা কবর-জিয়ারত কর।
১৪। মেহমানের সঙ্গে খানা খেয়ো।
১৫। মৃতজনকে গালি দিও না।
১৬। নামাজে বড় বড় গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়।
১৭। বিপদে ধৈর্য ধর।
১৮। যা আসবেই, তাকে (মৃত্যু) কাছে জানিও।
১৯। বন্ধুকে উপহার দিও, এতে বন্ধুত্ব বাড়বে।
২০। জ্ঞানার্জন না করে জ্ঞান বিতরণ করো না।

ছেকান্দারনামা ১ম খণ্ড

শ্রীযুক্ত মুন্সী আয়জদ্দীন আহমেদ

সন ১৩২০ সাল, পৃঃ ১৫২

রচনাকাল ১২৯২, ২৭ চৈত্র বৃহস্পতিবার

ছেকান্দারনামা ইসলামি বাংলা সাহিত্যের একটি নামকরা পুঁথি। তিনি এত বড় বাদশা ছিলেন যে, তাঁর বাদশাহীর কথা জুম্মার খোতবাতেও দেখা যায়। সেখানে প্রসঙ্গ থাকে—যত বড়ই হও, মৃত্যু অবধারিত। তবু আখের মউত্ হ্যায়।

ছেকান্দার নামা, ২য় খণ্ড

শ্রীযুক্ত মুন্সী মোজাম্মেল হক

সন ১৩২০, পৃঃ ১৫৪-২৪৪

রচনাকাল—১২৯৪ সাল ২৮ আশ্বিন, শুক্রবার

এছরারোল খাবনামা

মোহঃ খাতের

সন ১৩৬৮ সাল, পৃ. ৫২

এই গ্রন্থে স্বপ্নজগতের বহু স্বপ্নের রহস্যভেদ বা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্ন ব্যাখ্যা জগৎবিখ্যাত। মহানবীজী বলেন—কেউ সত্য স্বপ্ন দেখলে তার মূল্য ওহীর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। এই কথার দ্বারা প্রমাণ হয় স্বপ্ন জগৎ সত্য। তবে ওই জগতেও সত্য ও মিথ্যা দুই আছে। স্বপ্নজগৎ এক বিরাট রহস্য।

ছহি বড় খাব নামা

মোহাম্মদ ইউসুফ

সন ১৩২৪ সাল, পৃঃ ৩১

গ্রন্থ নমুনা

১। আগুন দেখা	—	মালদার আওরত পাওয়া
২। অচেনা আওরতকে কোলে নেওয়া ও বুছা দেওয়া	—	মকছেদ হাসেল
৩। আছমান দেখা	—	দুনিয়ার খুবি
৪। কোরআন পড়া	—	আল্লার রহমত লাভ
৫। খত্‌পড়া	—	সুসংবাদ পাওয়া
৬। ঘোড়ায় চড়া	—	চাকরী পাওয়া
৭। সহবাস করা	–	মকছেদ হাসিল
৮। জেন্দাকে মরা দেখা	—	হায়াত বাড়বে
৯। নবীজীকে দেখা	—	দ্বীনদুনিয়ার ভাল
১০। নারিকেল দেখা	—	পুত্রসন্তান লাভ

কলির নছিহত

অর্থাৎ, নছিহতল গাফেলিন

সেখ রমজান উল্লাহ

সন ১৩২০, পৃঃ ২০

লেখক সমাজের নৈতিক অধঃপতন দেখে দেখে মর্মে মর্মে আঘাত পান। সেই আঘাতের ফলশ্রুতি এই পুঁথিটি। ধর্ম মানব-সন্তানকে আর কিছু দিতে পারুক না পারুক, নৈতিকতা দান করেছে। এবং এই নৈতিকতাহীন মানুষ জীব সমতুল্য। নৈতিকতার অভাবই আনে মানবিক বিপর্যয়।

আদম অজুদ তত্ত্ব

শ্রীযুক্ত সাহা আব্দুর রহিম

সন ১৩১৭ সাল, পৃঃ ৮৮

আমরা দুটো তত্ত্ব লক্ষ্য করি। একটি সূফী তত্ত্ব ও অন্যটি বাউল তত্ত্ব। সূফীতত্ত্ব প্রধানত আত্মা নিয়ে ব্যস্ত। যেখানে বাউল তত্ত্ব দেহ নিয়ে ব্যস্ত। বর্তমান পুঁথিটি দেহতত্ত্ব নিয়েই ব্যস্ত। সাত স্তবক আছমানকে লেখক মানব দেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

পহেলা আছমান যাহা নজরে দেখায়
তালু হতে গিড়াতক পায়ের জোড়ায়।
গিড়া হতে হাঁটুতক দোছরা আসমান
মিলে কিনা বুঝে দেখ যত মেহেরবান।

হাঁটু হতে কোমর তক আছমান তেছরা
চাহারামে মাজাহতে সারা ধড় তেরা।
মাথা খুলি নিচু হতে সীনার উপরে
পঞ্চম আছমান এহি বোঝহে অন্তরে।
মাথার মগজ হয় শশম আসমান
দেখহে বিচার করে যত মেহেরবান।
হপ্তম আছমান হয় খাপাড় মাথার
না আছে তবক তার উপরেতে আর।

ফজিলতে দরুদ ও জিয়ারতে কবর

শ্রীযুক্ত মুন্সী জোনাব আলি

সন ১৩২০ সাল, পৃঃ ৫৯

অহরহ দরুদ শরীফ পড়া ও কবর যিয়ারত করা কত যে উত্তম কাজ, তা লেখক সবিস্তারে এই গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইসলাম ধর্মে ও মুসলিম সমাজে এ দুটো জিনিসই মর্যাদার আসন লাভ করেছে।

'ছহি দেল দেত্তানা'

আব্দুর রহিম

সন ১৩১৭ সাল, পৃঃ ৩৬

পুঁথিটি প্রধানত সূফী তত্ত্বের উপর লেখা।

আহকামাল জোমা

মুনশী তাজাদ্দিন মহাম্মদ

সন ১৩২০ সাল, পৃঃ ৬৩

এই পুঁথিটিকে জুম্মার নামাজের বিশদ বর্ণনা স্থান পেয়েছে। যেখানে আছে ওয়াজ-নাসহিত বা উপদেশমালা ইত্যাদি।

ছহি বড়

হেদায়েতল এছলাম

অর্থাৎ, নিয়েৎনামা

মুন্সী মানরুদ্দিন আহমদ

সন ১৩২৬ সাল, পৃঃ ১৬

হেদায়েতল ইসলাম একটি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। এতে ইসলাম ধর্মের শরিয়তগত আনুষ্ঠানিক দিকগুলো সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এককথায় এটাকে একটি ভাল দীনিয়াত বই বলা যেতে পারে।

নছিহতেচ্ছালাত

মুনশী মোঃ এছহাক

১৩২০ সাল, পৃঃ ১১১

এই পুঁথিটি উপদেশবাণীতে ভর্তি। যে উপদেশবাণীগুলো মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে খুবই দরকার।

তওবা বা ক্ষমা :

আল্লাহ্‌তালা ফরমিয়াছে কোরআন বিচিতে
তৌবা করহ্ সবে দেলজান হতে।

নামাজ :

নামাজ কায়েম কর যত মুসলমান
সত্যই জানিবে ইহা আল্লার ফরমান।
হাদিছের বিচে জান আইল এমতে
ফরমিলেন হাবিবুল্লাহ্ আগে এ ছুরাতে
এছলামি ও কাফেরের বিচিতে তাহার
কিছুই ফারাক নাহি আছে দোহাকার।

জেনা বা ব্যভিচার :

আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছে কোরআন মাঝার
শুনে সাবধান হও যত জেনাকার
জেনার নজদিকে কেহ নাহিক যাইবে
আর তার আগে পাশে নাহিক ফিরিবে।

গিবত বা পরনিন্দা :

হক তালা ফরমিয়াছে কোরআন মাঝার
হরগেজ গিবত কেহ না করিও কার।

মেয়ারাজনামা

মুন্সী মোহাম্মদ খাতের

সন ১৩২৩, পৃঃ ৩০

মেয়ারাজনামা একটি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। মেয়ারাজ শব্দের অর্থ স্বর্গে আরোহণ। মহানবীজী (সাঃ) স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন। সমস্ত মুসলমান এটা স্বীকার করেন। তবে কোন দল বলেন সশরীরে, কোন দল বলেন অশরীরে আধ্যাত্মিকভাবে। এইটুকুই তফাত। কিন্তু কোরআনের ব্যাখ্যানুযায়ী এটা আধ্যাত্মিক। দ্রঃ লেখকের মহানবী গ্রন্থঃ মেরাজ অধ্যায়।

বেনামাজির নছিহত

মুন্সী মফিজুদ্দিন আহম্মদ

সন ১৩২৬, পৃ: ১৬

যে সমস্ত মুসলমান নামাজ পড়ে না, তাদের সম্পর্কে। নামায ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠতম বিধান। এটি ব্যতিরেকে কেউই মুসলমান হতে পারে না।

মমিন কাফের বিচে বাত নামাযের
জে ছাড়ে নামাজ সেই বেসক কাফের।...
না পড় জানাজা তুমি উপরে তাহার
জে লোকে তরক্ করে নামাজ আল্লার।

ছাখাওত্‌নামা

মাজেজায়ে আলে নবী

মুন্সী আব্দুল ওহার

সন ১৩২৩, পৃঃ ১২

এই গ্রন্থটিতে ইসলাম ধর্মের মহান কাণ্ডারী এই পৃথিবীর কত বড় অতুলনীয় দানবীর ছিলেন, সেই নিপাট সত্যটা লেখক তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। সেই সঙ্গে দৃষ্টান্ত এনেছেন হযরত আলির (কঃ) ও বিবি ফাতেমার (রাঃ)। একবার হযরত আলী (কঃ) তাঁর এক পুত্রকে দান করেন, একই সময়ে মা ফাতেমাও অন্য পুত্রকেও দান করেন। পরে আবার দু'পুত্রই ফিরে পান। এটা ছিল পরীক্ষা মাত্র।

কলমা মোনাজাত

জনাব মুন্সী সুফীজুদ্দিন আহম্মদ

এই বইটি একটি উর্দু ভাষার মৌলুদ। বাংলা উচ্চারণে লেখা।

হকিকাতুস্ সালাত্

জোনাব আলি

সন ১৩২৪ সাল, পৃঃ ৬৫

এটা একটি ধর্মীয় গ্রন্থ। এতে নামায-রোযা, হজ-যাকাত প্রভৃতি বিষয়ে বর্ণনা আছে।

ছহি ঝগড়ানামা

মুন্সী আছিরুদ্দিন

সন ১৩২৬ সাল, পৃঃ ১৫

এই পৃথিবীতে আল্লাহ বহু জিনিস তৈরি করেছেন। সৃষ্টিজগতে কোন্‌টি কার চেয়ে বড় এই নিয়ে ঝগড়ানামার সৃষ্টি।

হুজ্জতাল এছলাম

অর্থাৎ সওয়াল জোওয়াব।

মুন্সী মোহঃ খাতের

সন ১৩২০ সাল, পৃঃ ১৫

এই পুঁথিতে ইসলাম ধর্মকে নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন স্থান পেয়েছে। যেমন :

কোরআনের তাজ ও দেল কোন সূরা ?

কোরআনের তাজ আর সুরে রহমান
ইয়াছিন দেল বটে জানাই ফরমান।

কার সাথে খাও এবং কার সাথে শও?

বিসমিল্লার সাথে খানা হামেহাল খাই
লা-এলাহা ইল্লালার সাথে শুতে যাই।

একশত তিরিশ ফরজ

মৌলবী মোঃ খাতের

১৩৬৪ সাল, পৃঃ ১২

লেখক সমগ্র ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে ১৩০ ফরজের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওইগুলো কোরআন ও হাদিসে নেই। ইসলামে ফরজ তাকেই বলা হয়, যা কোরআনের নির্দেশ। তাই এই গ্রন্থটি কিছুটা অনুমানভিত্তিক ও দলগত মতবাদ মাত্র। নামাহ রোজা ফরজ, কিন্তু তাদের নিয়েত ফরজ নয়। প্রাণ ধারণের জন্য খাদ্যগ্রহণ আবশ্যক, কিন্তু তার নিয়েত আবশ্যক নয়।

মৌলুদ দিল পিজির

মোহাম্মদ ওহিদ

১৩৬৮ সাল, পৃঃ ৪০

ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলিম সমাজের হানাফী মজহাবে মৌলুদ খুবই জনপ্রিয়। মৌলুদের একটি মজার দিক, এটি সুখে ও দুখে দুদিকেই ব্যবহৃত হয়। যেমন মানুষের জন্মে ও মৃত্যুতে। মূলত এটা মহানবীজীর (দঃ) জন্ম ও জীবনচর্চা।

ছহি বড় নিয়েতনামা

মৌলবী মোহঃ জালালুদ্দিন

১৩৬৯ সাল, পৃঃ ২৮

ইসলাম ধর্মের বহু বিষয়ের উপর একটি সার্বিক আলোচনা। কোন গবেষণামূলক কিছু নেই।

হেদায়তল ইসলাম

কমরুদ্দিন আহম্মদ

এটি একটি গতানুগতিক পুঁথি। ধর্মের সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা মাত্র। নিয়েতনামা এই রূপ একটি বই।

কুলছুম বিবির মেজমানি

মুন্সী ছমিরুদ্দীন আহম্মদ

অতি সাধারণ ও গতানুগতিক পুঁথি।

ফকির বিলাস ও মারেফতে সওয়াল জওয়াব

এনায়েতুল্লাহ সরকার

সন ১২৯৯ সন, ১০ই মাঘ

এই পুঁথিটিতে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর আছে। প্রশ্নগুলো কোরআন-হাদিস এবং মানুষের শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে। এবং আরও অনেক।

মানুষের শরীর সম্পর্কে ঃ মানুষের শরীরে ১৮টি বস্তু আছে। তন্মধ্যে ৪টি মাতার, ৪টি পিতার, এবং ১০টি আল্লার।

হাড় রগ মণি মগজ এ চারি পিতার
গোস্ত-পোস্ত পশম লহু এ চারি মাতার।

দুই কান, দুই চক্ষু, আর দুই নাসা
মুখ বুক তালু মগজ এই দশ দিশা
জলদ্বার মলদ্বার নীচে আছে তায়
আল্লার এ দশ চিজ কহিনু তোমায়।

বেনামাজির নছিহত

মুন্সী মাফিজুদ্দিন আহম্মদ

বেনামাজির নছিহত একটি ছোট পুঁথি। যে সমস্ত মানুষ নামাজ পড়ে না, এটা তাদের সম্পর্কে লিখিত।

নামায ইসলাম ধর্মে মাটি স্বরূপ। মাটি হতে মানুষ যেমন যে কোন প্রকারের ভাল শস্য, ভাল বৃক্ষ জন্মাতে পারে, নামাজ ঠিক অনুরূপ জিনিস। নামাজের মাধ্যমে মানুষ যে কোন প্রকারের আত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে। এই জন্যই তো নামাজকে সাধারণ মানুষের জন্য 'মেরাজ' (স্বর্গে আরোহণ) বলা হয়েছে। নামাজ ব্যতীত কোন মানুষই মুসলমান হতে পারে না। যারা নামাজ পড়ে না, তারা ইসলামের মুসলমান নয়, তারা সংস্কারগত বা বংশগত মুসলমান মাত্র। এই জন্যই বলা হয় যে, আজ সারা বিশ্বে যে পরিমাণে মুসলমান বিস্তারলাভ করেছে, সেই পরিমাণে ইসলাম তার এক দশমাংশ প্রসার লাভ করলে বিশ্ব শান্তি-সাগরে পরিণত হত। ইসলামের প্রধান অনুষ্ঠান নামাজ।

আজ সারা বিশ্বে আল্লাহ মুসলমানদের অপরিমিত দওলত দিয়েছেন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত বা উন্নতগামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো না। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সুপরিকল্পিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ভাল হাসপাতাল নেই। বেকারদের চাকরি বা কর্মসংস্থানের জন্য উন্নত শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। এ সব কথা আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন চাচাজান মওলামা মোঃ ইলিয়াস সাহেব বলেছিলেন :

কি বলবো খোদাকে
দৌলত দিলেন গাধাকে।

বড় মওত নামা

মুন্সী তাজাদ্দিন

সন ১৩১০ সাল, পৃঃ ১০০

'বড় মওত নামা' পুঁথিটিতে ইসলামের বহু কিছুর সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে বেশি বর্ণনা আছে। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'বড় মওত নামা'। ইসলাম ধর্মের বিধিমতে মৃত্যুর পূর্বে ও পরে মানুষের অবস্থা কেমন হয়, এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ধর্মের নামে মানুষ শান্তি ও সান্ত্বনা দুইই পায়। অন্যদিকে মনের মাঝে ভয় ও ভীতির সঞ্চারও হয়। এ ভয় ভীতি মানুষের মনের মাঝে শুদ্ধতাও আনে। মানবজীবনে সাহসের যেমন প্রয়োজন আছে, ভয়-ভীতিরও প্রয়োজন আছে। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ, বিরহ-মিলন সবারই দরকার আছে এই জীবনে। মানুষের জীবনে এসবই আল্লার দান। জীবন একটি বাগান, নানা বৃক্ষে, নানা উদ্ভিদে তা হয় বৈচিত্র্যময়। মানুষের জীবনের পথে এক-একবার একটি অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-যন্ত্রণা, বিপদ-আপদ দেখা দেয়। এগুলো যেন জীবনের পথে সতর্কতার ঘণ্টা বাজিয়ে যায়। সময় চলে যাচ্ছে, মৃত্যু এগিয়ে আসছে।

আদ্য পরিচয়

সেখ জাহিদ

সন ১২৯৮ সাল, পৃঃ ৬৫

সেখ জাহিদের আদ্য পরিচয় একটি প্রাচীন পুঁথি। এর আলোচ্য বিষয় মানুষের দেহতত্ত্ব। কিছু বাউল-ফকিরদের সঙ্গে মিল আছে। কী করে আল্লাহ আদি মানব আদমকে সৃষ্টি করলেন। পরবর্তীকালে কী করে মানব-সন্তানের ধারা বইতে থাকল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত আল্লাহ কোথায় কী রাখলেন। তারও বর্ণনা আছে। সন্তান মায়ের কাছ থেকে কি কি পায়, পিতার কাছ থেকে কি কি পায়, এ সবের বিস্তারিত বর্ণনা।

নাসিমে জান্নাত

মওলানা মোহঃ ইলিয়াস

সন ১৩৬২ সাল, পৃঃ ৯৬

'নাসিমে জান্নাত' ইসলামি বাংলা সাহিত্যের শেষের দিকের শেষ যোজনা। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এই সমস্ত মওলানাগণ কীভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করতেন এবং এখন কীভাবে করছেন এই বইটি তার একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। এটাকে আর পুঁথি বলা যায় না। এটা এখন একটি কাব্যগ্রন্থ। এই একই লেখকের প্রথম জীবনের মহামূল্য পুঁথি ক্লিদে-জান্নাত তখনকার দিনের নামকরা ইসলামি পুঁথি। একই লেখকের কলমে জীবন-সায়াহ্নে বেরিয়ে এল যুগের পরিবর্তিত ধারা।

'নাসিমে-জান্নাত' শব্দের অর্থ স্বর্গের সুগন্ধ। এই গ্রন্থে কবি মুসলমান সমাজের দুরারোগ্য গুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। যেমন সেদিনের সুদপ্রথা মানব সমাজের কত মানুষকে যে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে। তার কোন সংখ্যা নেই। এই সুদ প্রথা সম্পর্কে কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন। নমুনা :

দালানের সিঁড়ি হতে এক সুদখোর
পড়িল, মরিল, গেল কবর ভিতর।
পুত্র এক ছিল তার কাঁদিল বিস্তর
কিছুদিন পরে তার হইল সবর।
একদা স্বপনে দেখি জিজ্ঞাসে বাপেরে
আছেন কি হালে বাবা বলুন আমারে।
পিতা কহে না জিজ্ঞাসো অবস্থা বাছারে
সিড়ি হতে পড়িয়াছি দোজখ-মাঝারে।

বিধবা বিবাহ :

দুনিয়াতে স্বার্থপর ও অর্থপরের বশে
অনেকেতে আপন মেয়ে বিধবাকে পোষে।...
ষাট বছরে খোকার দেখি বিয়ের আড়ম্বর
বিশ বয়সের বেওয়া খুকির গয়না খুঁজে বর।
পাক কোরানে খোদা পাকের আদেশ আছে এই
বিধবাদের করবে গতি, ভুলে থাকবে নেই।

মওলানা মোহঃ ইলিয়াস সাহেবের 'নাসিমে জান্নাত' ইসলামি বাংলা সাহিত্যের নব যুগের সৃষ্টি করল। এর বিষয়বস্তু অন্যান্য ইসলামি পুঁথিগুলোর মতোই। কিন্তু এর ভাষা, ভঙ্গি, ছন্দ ইত্যাদি সব মিলে যে পরিবেশনের ধারা দান করেছে, তা যেন ইসলামি বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত করল।

সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী নদীর গতি যেমন কেউ নির্দেশ করতে পারে না, সাহিত্যেও ওই একই সত্য চিরদিন রয়ে গেছে। বঙ্কিম জলধারার ন্যায় সে তার আপন পথ আপনি করে নেয়। পৃথিবীর যে কোন সাহিত্য হোক, সবক্ষেত্রেই এ সত্য বিরাজিত। ইসলামি বাংলা সাহিত্যের লেখকগণও এই চিরন্তন সত্য থেকে নিষ্কৃতি পাননি।

ইসলামি বাংলা সাহিত্যের শাস্ত্র অধ্যায়ের লেখক মওলানা ইলিয়াস সাহেব ইসলামি জীবন-দর্শন সম্পর্কে যে লেখনী ধারণ করেছিলেন, তা বড়ই স্বচ্ছ। তাঁর ক্লিদে জান্নাত তখনকার দিনে সারা বঙ্গে এক অভাবনীয় আলোড়ন জাগিয়েছিল। প্রখ্যাত লেখক জীবনের প্রথম যৌবনে যে আবেগময় কলম ধরেছিলেন বা সেদিনের অসংখ্য মানুষকে তন্ময় করে তুলেছিল সেই একই লেখক জীবন-সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে যে কলম ধরলেন, তা প্রমাণ করল দুটি জিনিস—(১) ইসলামি সাহিত্যের গতি পরিবর্তন, (২) বিবর্তনশীল জগতে সাহিত্যও পরিবর্তনশীল।

লেখক যেন জীবনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ভাষার গতি নির্ণয়ে নবীনের জন্য নতুন পথে জ্ঞানের অঙ্গুলি নির্দেশ করে গেলেন।

ইসলামি বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের যে ভাষা, তা বোঝা যতটা কঠিন, পড়া তা অপেক্ষাও কঠিন। শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভাষার গতি ধারাটা বেশ একটা সাবলীল রূপ নেয়। শতাব্দীর শেষের দিকে যে ভাষা পাওয়া যায়, সেটা সকলের জন্যই বোধগম্য ও সুখপাঠ্য। যথার্থ কথা বলতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই ইসলামি বাংলা সাহিত্য আসল রূপ লাভ করে।

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামি দোয়া-তাবিজ ও হেকিমিশাস্ত্র

প্রাচীনকালে মানুষ কীভাবে তাদের রোগমুক্তির চেষ্টা করত, সেকথা আজ ভাবলেও বিস্ময়বোধ হয়। তবুও মানুষ তখনও রোগ থেকে মুক্তিলাভ করেছে। তখনকার দিনে কোন পাস করা ডাক্তার ছিল না। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে এক একজন বিশেষ ব্যক্তি থাকতেন, যাঁদের কাউকে বলা হত কবিরাজ, কেউ বা ছিলেন হেকিম, কেউ বা ছিলেন রোজা বা বৈদ্য। অনেকে ছিলেন ধর্মীয় পণ্ডিত ব্যক্তি। দেখা যেত এক-একটি ধর্মকে কেন্দ্র করে এই সমস্ত লোকেদের আবির্ভাব হত।

ইসলাম ধর্মেও ওই রূপ বহু হেকিম বা রোজার সন্ধান মেলে। এই সমস্ত লোকগুলোর মধ্যে কেউ বা গাছ-গাছড়া নিয়ে চিকিৎসা করতেন, কেউ বা ধাতু দ্রব্য নিয়ে করতেন, কেউ বা বহু মিলিত বস্তুর মাধ্যমে করতেন। ঝাড়-ফুঁকেরও অন্ত ছিল না।

এই অধ্যায়ে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক যেটি, সেটি হচ্ছে ইসলামি দোয়া-তাবিজ। দেখা গেছে, বহু কঠিন ব্যাধি, বহু দুরারোগ একটি মাত্র পাঁচ পয়সার তাবিজে সেরে গেল। একটি মাত্র ফুঁকে নির্মূল হয়ে গেল জীবনের কঠিন ব্যাধি। জীবনের এমন কোন কঠিন ব্যাধি ছিল না, যার চিকিৎসা হত না এই পথে। কোন কোন ক্ষেত্রে এইসব তাবিজ আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারকেও যেন হার মানিয়ে দিয়েছে। আজও মানুষ স্বীকার করেন, সে যুগে রোগ পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেসব মহান চিকিৎসকের সন্ধান পাওয়া গেছে, আজ তার চিহ্ন নেই। অধুনা বিস্মৃত দোয়া-তাবিজ ও হেকিমিশাস্ত্র যেন সেই মহান চিকিৎসকদের দূর অতীতের স্মৃতি মাত্র।

ছোলেমানি তালেনামা

গোলাম ফরিদ, ১৩৬৭

'ছোলেমানি তালেনামা' একটি হেকিমি জাতীয় গ্রন্থ। তবে দাওয়াইগুলো যত হেকিমি জাতীয়, তা অপেক্ষা তাবিজ জাতীয়। এর অনেক কিছু রাশির উপর নির্ভর করেছে। অনেকের মতে এগুলো খাঁটি ইসলামি নয়। কিছু তাবিজের নমুনা।

বদ স্বপন দেখা ভাল হবার তাবিজ :

٨	٣	٣	٢
٢	٤	٦	٨
٦	٨	٢	٤
٤	٢	٨	٤

জেনের নজর লাগা ভাল হবে

٣٩١١	٣٩٠٤	٣٩٠٩
3٩٠٤	٣٩١0	٣٩١٠
٣٩٠٧	٣٩١٢	٣٩٠٥

বদ্ নজর ভাল হবে :

٦	٧	٢
١	٥	٩
٨	٣	٤

বদ খাব দেখে লড়্কা কাঁদলে

٤٧٢٣	٤٧١١	٤٧٢٠
٤٧٢٤	٤٧٢٢	٢٧٢١ ـ
٤٧١٩	٤٧٢٦	٤٧٢٣

কম্প জ্বর হলে গলায় কিংবা হাতে :

٦	١	٨
٧	٨	٣
٢	٩	٤

বসন্তে তাবিজ ধুয়ে খাওয়াবে

٢٢	٢٥	٢٨	١٥٥
٣٧	١٦	٢١	٣٦
٣٨	٣	١٣	٢٠
٢١	١٩	١٨	٢١

গর্ভপাত হলে :

٧٨٦

٣	٩	٤
٧	٥	٣
٦	١	٨

খালাস বা প্রসব হওয়ার তাজিজ :

٢	٩	٦
٨	٥	١
٤	٢	٨

জ্বেনের উপদ্রপে

١١	٨	٦	١
٦	٢	٦	٦
٦	٣	٧	٦
١	١٥	١١	٩

ছহি বড় আসল
আজায়েব ছোলেমানি
মোঃ মোয়াজ্জেম আলি

'আজায়েব ছোলেমানি' একটি হেকিমি গ্রন্থ। আধুনিককালে চিকিৎসাশাস্ত্রের যে উন্নতি হয়েছে, সেদিন তা কেউ চিন্তাও করতে পারেনি। এই পুঁথিটি একটি বড় ধরনের পুঁথি। একটি মানুষের শরীরে বা একটি সংসারে এমন কোন রোগ নেই যার দোয়া এই পুঁথিটিতে নেই।

রেজেক জেয়াদা হওয়ার দোয়া, চোখে কম দেখলে দোয়া, আপনার হাল স্বপ্নে জানার দোয়া, জানোয়ার হারিয়ে গেলে দোয়া, খেতে ফসল কম হলে দোয়া, জেনের দোয়া, আওরত ও মরদের মধ্যে ফসাদ হলে দোয়া, আওরত পালিয়ে গেলে দোয়া, কুকুরে কামড়ালে দোয়া, গোলাম-বাঁদী পালিয়ে গেলে দোয়া, মেয়ের সতীত্ব জানার দোয়া, খালাসের দোয়া, আওরত বাঁজা হলে দোয়া, বালা-বিপদ দূর হওয়ার দোয়া, ঋতু বন্ধ হলে দোয়া, পুরাতন জ্বরে দোয়া, স্তনে দুধ না এলে দোয়া, দাঁতের দোয়া, গেঁটে বাত ও রস বাতের দোয়া। হজমের দোয়া, পেট ব্যথার দোয়া, হৃৎপিণ্ডের দোয়া, আরো বহু ব্যাধির দোয়া। আরো বেশ কিছুদিন পরে মানুষ বুঝতে পারবে, তাদের পূর্বপুরুষের সমাজ জীবন কেমন ছিল। হয়তো বা বিশ্বাস করতেও দ্বিধা আসবে। আমরা শিশুজীবনে আমাদের সমাজচিত্র যা দেখেছি, পরিণত বয়সে আজ তা চিন্তা করতেও শরীরে শিহরণ জাগছে।

ছাই বড় ছায়েত নামা
মুন্সী আব্দুল ওহাব ও মোহঃ কামালউদ্দিন।

'ছায়েত' শব্দের অর্থ বিশেষ ক্ষণ। ইসলামে সবসময়ই সমান। তবুও কোরআনে বিশেষ ক্ষণের মর্যাদাও দেওয়া হয়েছে। সব বারই সমান, তবু শুক্রবারের একটি পৃথক মর্যাদা আছে। সব রাতই সমান, তবুও শুক্রবার রাতের বিশেষ মরতবা আছে। রমজান মাসের ২১ হতে ২৯ রাতগুলোর বিশেষ মূল্য আছে। পবিত্র রমজান মাসের শেষ দশদিন এতেকাফের জন্য নির্ধারিত। সুতরাং বিশেষ ক্ষণ সব সমাজে সব ধর্মেই আছে।

বর্তমান পুঁথিটি কোন্ ক্ষণে কোন কাজ ভাল, কোন্ কাজ মন্দ, সেগুলো বিস্তারিতভাবে বলেছে। যেমন জন্মক্ষণ সম্পর্কে :

রাতের ১ম প্রহরে জন্ম নিলে → চণ্ডাল
" ২য় " " " → মোনকের
" ৩য় " " " → নেক্কার
" ৪র্থ " " " → নেক রক্ত

হায়াত কমবেশির কারণ :

রাতের ১ম প্রহরে জন্ম নিলে → আয়ু কম
" ২য় " " " → " ৪০ বছর
" ৩য় " " " → " ৮০ বছর
" ৪র্থ " " " → " ১০০ বছর

আমরা এই পুঁথি থেকে বুঝতে পারছি স্ত্রী সহবাস রাতের শেষ প্রহরেই ভাল।

কোন দিনে জন্ম নিলে কি ফল :

রবিবার	রাতে	→	নেকবক্ত
"	দিনে	→	"
সোমবার	রাতে	→	আলেম
"	দিনে	→	অমঙ্গল
মঙ্গলবার	রাতে	→	নেক্কার
"	"	→	বদকার
বুধবার	রাতে	→	বেশি আয়ু
"	দিনে	→	"
বৃহস্পতি	রাতে	→	নেক্কার
"	দিনে	→	"
শুক্রবার	রাতে	→	নেক্কার
"	দিনে	→	"
শনিবার	রাতে	→	বদকার
"	দিনে	→	হায়াত বড়

পুঁথির এই বক্তব্য যুক্তি ও তর্কের কোন ধার ধারে না। এগুলো কল্পনা মাত্র। আমাদের বাস্তব জীবনে এগুলো অলীক ও একেবারেই অসার।

টিকটিকি সম্পর্কে আমাদের দেশে বহু কথা প্রচলিত আছে। সেই প্রচলিত মতকেই মেনে নিয়েই লেখক তাঁর মতামত দিয়েছেন। এসবও আজ অপ্রচলিত হয়ে যাচ্ছে।

টিকটিকি পূর্বদিকে যাহার ডাকিবে
খুশির খবর কিছু তাহার মিলিবে।...
টিকটিকি যাহার ভাই মাথায় গিরিবে
বাদশাই দরজা তাকে এলাহি পৌছবে।

টিকটিকি সম্পর্কে আরও বহু কথা আছে। টিকটিকি মানুষের কোন ক্ষতি করে না। বরং পোকা-মাকড় খেয়ে মানুষের উপকারই করে। তাই প্রাচীনকালের মানুষ টিকটিকি সম্পর্কে এমন ধারণা মানুষের মনে জন্মিয়ে দিয়েছে। যাতে মানুষ তাকে খুব ভালবাসে। এছাড়া আর কিছুই নয়। টিকটিকি আমার মাথাতে কয়েকবারই পড়েছে, আমি কিন্তু বাদশা হইনি। অধ্যাপকই রয়ে গেলাম।

রাশিগুণে মিলন :

পুঁথিকার দেখিয়েছেন যে, ছেলে-মেয়েদের বিয়ে রাশি গুন অনুযায়ী হলে ফল ভাল হবে। কিন্তু এরও কোন স্থিরতা পাওয়া যায় না। অনেকে বহু কিছু দেখে, কুষ্ঠি বিচার করেই বিয়ে দেন, কিন্তু ফল আশানুরূপ দেখা যায় নি।

পুঁথিকার নর-নারীর হস্তমৈথুন ও সমকামের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। স্ত্রী-পুরুষের গুপ্তাঙ্গ সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা করেছেন। শেষের দিকে কোন তসবি পড়লে কি ফল হবে, সে সম্পর্কেও বেশ কিছু আলোচনা করেছেন।

এই পুঁথিতে আমরা একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম যে, সায়েত বা বিশেষ ক্ষণের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সায়েত বা ক্ষণকে যদি খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে মানুষের কর্মফল ও দায়-দায়িত্ব বলে কিছুই থাকে না। সুক্ষণে জন্মালে ছেলেমেয়ে ভাল হবে, কুক্ষণে জন্মালে খারাপ হবে। কিন্তু ক্ষণের সৃষ্টিকারী একমাত্র আল্লাহ্, সেখানে মানুষের কোন হাত নেই। তাই মানুষ যদি ছায়েত বা ক্ষণ-সর্বস্ব হয়ে ওঠে, তাহলে তার নিজ দায়-দায়িত্ব বলে কিছু থাকে না। এটা কিন্তু কোরআন বা ইসলামের বিধান নয়। তবে ক্ষণেরও একটি মর্যাদা আছে।

ছহি এলাজে লোকমানি

ছৈয়দ শাহ ছাদত আলি

'এলাজে লোকসানি' নর-নারীর দৈহিক মিলন সম্পর্কে লেখা। দৈহিক মিলনে বহু কিছু জানার আছে। যা না জানলে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হয়। এমনকি সন্তানেরও। ওই বিধিগুলো না জানলে মিলনে কোন পক্ষই তৃপ্তি পাবে না। উভয়েরই গুপ্তাঙ্গ সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা। ছোটখাটো বহু অসুখের ঔষধ। স্ত্রীলোকের স্তন ছোট ও বড় করা। স্বপ্নদোষ রোধ করা ইত্যাদি। সে যুগে এগুলো ভালভাবেই প্রচলিত ছিল।

নক্সে ছোলেমানি

মুন্সী জোনাব আলি

পৃথিবীতে এমন একটি সময় ছিল, যখন মানুষ প্রকৃতির কোলে একেবারেই অসহায় ছিল। তখন তারা নানা দেব-দেবীর, নানা পীর-পিরাণীর কাছে আশ্রয় নিত। নদী-নালা, বৃক্ষ-পাহাড়-পর্বতকে খুশি করতে চাইত। সে নজির আজও বর্তমান। মানুষ এখনও নদীতে পয়সা ফেলে, গাছে সিঁদুর চড়ায়, আর কত কি। নকসে ছোলেমানি বা এই ধরনের গ্রন্থগুলো এর পরবর্তী যুগের। যখন মানুষ প্রকৃতির কোল থেকে রেহাই পেয়ে আপন পথে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। প্রকৃতিকেই আপন কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। এযুগের মানুষ এবার কিছুটা সাবালকত্ব অর্জন করে নিজ পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। বর্তমান যুগের মানুষ ওই স্তরকেই অতিক্রম করেছে। প্রথম স্তরে মানুষ প্রকৃতি ও পশু-পক্ষীর সঙ্গেই সহবাস করেছে। দ্বিতীয় স্তরে ওদেরকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। আজ তৃতীয় স্তরে মানুষ তাদের প্রতিভূ।

তাবিজাত ছোলেমানি

অর্থাৎ

নকসে ছোলেমানি

তৃতীয় ভাগ

মুন্সী আব্দুল ওহাব

সন ১৩২৬ সাল, পৃঃ ৬৮

নকসে ছোলেমানি কয়েক খণ্ডে আছে। তৃতীয় খণ্ড কোরআনের উপর লেখা। কোরআনের কোন সূরা পড়লে কি ফল পাওয়া যায়, তৃতীয় খণ্ডে তারই বর্ণনা। পবিত্র কোরআনের সকল সূরাতেই কিছু না কিছু ভাল ফল আছে। তবে কয়েকটি বিশেষ সূরাও আছে। আমরা কিছু নমুনা স্বরূপ এখানে রাখছি।

সূরা ইয়াসিন : কোরআনের কালেব জান এয়াছিন সূরায়
তামাম আলেম জন লিখেছে এহায়।
যে হাজতের জন্য ভাই এসূরা পড়িবে
খোদার ফজলে তাহে ফায়েদা পাইবে।
যে কিছু নিয়েত দেলে করিবে যেজন
হাছেল হইবে তাহা শোন দিয়া মন।

সূরা রহমান : এই সূরা লিখে এক কাগজ 'পরে
পানিতে ধুইয়া লিবে হেফাজত করে
ওই পানি ঘরে দুয়ারে ছেটাইবে
সাপ বিচ্ছু সেই ঘরে কভু না আসিবে।

সূরা ওয়াকেয়া : হামেসায় এই সূরা যে জন পড়িবে
রুজির তক্‌লিফ্ তার কভু না হবে।

সূরা মোজাম্মেল : সূরা মোজাম্মেল যেই হামেসা পড়িবে
হযরত রসুলে সে খাবেতে দেখিবে।
মুশকিলে পড়িয়া যেবা হয় পেরেসান
এ সূরা পড়িলে তার হইবে আসান।

তবিজগুলো নকশা আকারে লিখিত। নকশার মধ্যে সংখ্যা আছে। প্রতিটি আরবী অক্ষরের জন্য একটি সংখ্যা নির্ধারিত আছে। সেই সংখ্যানুপাতে নকশা তৈরি হয়। যেমন ৭৮৬ বা ৯২।

ছহি বড় আজায়েব-ছোলেমানি

অর্থাৎ চিকিৎসা রত্নাকর

মুন্সী আব্দুল ওহাব

১৩৬৮ সাল, পৃঃ ৬৪

'আজায়েব ছোলেমানি' একটি নামকরা ইসলামি পুঁথি। এই পুঁথিটি হেকিমি চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর লিখিত। এখানে যা কিছু আছে, সবই ইসলাম ধর্মানুমোদিত। মধ্যযুগে কবিরাজি ও হেকিমি চিকিৎসাই এদেশে প্রচলিত ছিল। যাদের ক্ষীণধারা এখনও বেঁচে আছে। আবার হয়তো কোন দিন বেগবানও হতে পারে।

ছহি বড় তাজ ছোলেমানি

মৌলবী মোহঃ মূসা

১৩৬৮ সাল, পৃঃ ৯৪

এটি একটি হেকিমি পুঁথি। এতে হেকিমি ওষুধ ছাড়াও আছে মন্ত্র-তন্ত্র, দোয়া-তাবিজ নানাবিধ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি।

হেরজে ছোলেমানি

অর্থাৎ

নকসে ছোলেমানি

চতুর্থ ভাগ

মুন্সী জোনাব অলি

১৩২৫ সাল, পৃঃ১২৮

পুঁথিটি দোয়া-তাবিজমূলক। অন্যান্য পুঁথির মতো এখানেও বহু ওষুধপত্রের উল্লেখ আছে।

এছলামীয় মন্ত্র

১ম হতে ৩য় খণ্ড

ওয়াজদ্দিন আহম্মদ

১৩১২ সাল, পৃঃ ১০০

যদিও পুঁথিটির নাম—এছলামীয় মন্ত্র। কিন্তু এতে আছে ইসলামি দোয়া-তাবিজ। কেননা ইসলামে মন্ত্র-তন্ত্র সিদ্ধ নয়। এই শ্রেণীর পুঁথিগুলোতে বিষয়বস্তু প্রায় একই ধরনের। তখনকার দিনে মানুষের যাবতীয় অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা হত হেকিমি-কবিরাজি, দোয়া-তাবিজ, তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদি দ্বারা। এগুলো আজ ইতিহাস মাত্র। বর্তমান যুগও যে ভবিষ্যতে একদিন ইতিহাস হবে না, একথা কে বলতে পারে!

সাপের মন্তর

অর্থাৎ সর্প চিকিৎসা

মীর খোররম আলি

১৩২০ সাল, ৬০ পৃঃ

সাপের মন্ত্রের পুঁথিটি নানারকম মন্ত্রে ভরা। এখানে কেবল সাপের মন্ত্র নেই। কোরয়ান হাদিসের বহু কিছু আছে। অনেকেই কোরআন-হাদিস পড়েন, কিন্তু দৈনান্দিন জীবনে তাদের কি উপকারিতা তা জানেন না। এই সমস্ত বিষয়গুলো এই পুঁথিটিতে আলোচিত হয়েছে।

এলাজে বাঙ্গলা

অর্থাৎ

কবিরাজি, হাকিমি, ডাক্তারি মতের চিকিৎসার সহজ উপায়

প্রথম ভাগ

ডাক্তার মোজাম্মেল হক

সন ১৩২৬ সাল, পৃঃ ৭০

এটি একটি হেকিমি গ্রন্থ। এই পুঁথিতে বাঙলা দেশের নানাবিধ ওষুধের উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময়ে আমাদের দেশে আধুনিক ডাক্তার বলে কেউই ছিলেন না। দেশের যাবতীয় অসুখকে এই পুঁথিগুলো মানুষকে সাহায্য করত। এই পুঁথিগুলো একদিন যুগের দাবি ও দেশের দাবি পূরণ করেছিল।

সে যুগের জন্ম-নিয়ন্ত্রণবিধি :

১। ঋতু গোসলের পর ভেবেন্ডার বিচি খেয়ে ধুতরা গাছের শিকড় কোমরে বাঁধলে গর্ভ হয় না।

২। সাদা সরিসার শিকড় মাথায় বেঁধে সঙ্গম করিলে গর্ভ হয় না।

৩। পূর্ণিমার পর আঁধারির চতুর্দশী তিথিতে ধুতুরা গাছের শিকড় তুলে কোমরে বেধে সঙ্গম করলে গর্ভ হয় না।

৪। রসুন-হরীতকী ও আমলকী সমানভাবে গুঁড়ো করে ঠাণ্ডা পানি-সহ খেলে গর্ভ হয় না।

৫। বাজ-পড়া তালগাছের শিকড় বেঁটে খেলে গর্ভ হয় না।

৬। ঋতুবতী হওয়ার ঠিক পরদিনে চুনের হাড়িতে ভাত রেঁধে খেলে গর্ভ হয় না।

আমরা বুঝতে পারছি তখনকার দিনেও মানুষ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করত।

এলাজে বাঙ্গলা
২য় খণ্ড
সন ১৩২৭, পৃঃ ১২৪

নমুনা :

মহিলাগণের ছোট মাইকে (স্তন) বড় করার এবং বড় মাইকে ছোট করার দাওয়া।

(১) সাদা জবা ফুল এনে কালো গরুর দুধের সঙ্গে মিশিয়ে চন্দনের মতো করে বেঁটে দুনো মাইতে লাগিয়ে দিলে দুনো মাই মোটা হবে।

(২) মোষের তেল কিংবা আঁজির গাছের পাতা, পলাশের ফুল ও অর্জুনের ফুল একত্র করে বেঁটে মাইতে দিলে ঢিলা মাই শক্ত ও আকারে ছোট হবে।

(৩) থোড়া সিদ্ধি ভিজিয়ে রাতে ছেঁকে ওই পানি ১৫ দিন খেলে ঢিলা মাই এঁটে যাবে।

এলাজে গাও
অর্থাৎ গরুর চিকিৎসা
মুন্সী মোজাম্মেল হক
সন ১৩২০, পৃঃ ৩২

ইসলামি-বাংলা সাহিত্য কেবল মাত্র মানুষের চিকিৎসাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু সকল রকমের চিকিৎসাতে হস্তক্ষেপ করেছে। এই পুঁথিটি শুধুমাত্র গরুর চিকিৎসাতেই সীমাবদ্ধ।

নমুনা :

চিতল মাছের আঁশ আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে লাগাতে হবে। পরে দু' ঘণ্টা মুখ বেঁধে রাখতে হবে। দুই থেকে তিনদিন করতে হবে।

বিষের দাওয়া :

মসনের তেল আধ পোয়া, গন্ধকের গুঁড়ো এক ছটাক, গরম মাড় আধসের।

সাপে কাটা :

(১) আমড়া গাছের ছাল পাঁচ তোলা খাওয়াতে হবে।

(২) গলখোস পাতার রস কানে দিতে হবে।

(৩) চার হাত একটি কলমী শাক খাওয়াতে হবে।

দাঁত নড়া :

হলুদের গুঁড়ো লাগাবে। সামান্য তুলা সরিষার তেলে ভিজিয়ে লাগাতে হবে। এবং দু'ঘণ্টা মুখ বাঁধা থাকবে।

পেট কামড়ালে :

কদমপাতার রস আধ পোয়া ও গুড় এক ছটাক একসঙ্গে সেব্য। ২য় বুঁইটি গাছের শিকড়ের ছাল চার তোলা ও সোমরাজ তিন তোলা একত্রে সেব্য।

চোট ও আঘাত লাগা :

নিস দোল ও সোরা একত্রে লাগাতে হবে।

পেট ফাঁপা :

কাঁচা হলুদ এক ছটাক ও গুড় আধ পোয়া সেব্য।

ঘায়ে পোঁকা হলে :

পাটের বিচি বা বাঁশের কোড়া পিষে লাগাতে হবে।

শরীর ফুলে গেলে :

লোহা পুড়িয়ে দাগা দেবে।

পোড়া ঘা বা খুরে ঘা :

নারিকেলের তেল ও চুনের পানি সমান সমান লাগাবে। গোল আলু বেঁটে লাগাল ভাল।

বাঁটে ঘা :

মোম আধ ছটাক, ঘি এক ছটাক, সফেদা এক আনা, ফিটকিরি দু'আনা একত্রে লাগাবে। কর্পূর এক ভাগ, তারপিন তেল সিকি ভাগ, মসনের তেল চার ভাগ একত্রে।

দুধ বেশি করা

১। বাঁশের পাতা সিদ্ধ, ওই পানিতে আধ ছটাক জোয়ান ও কিছু আখের রস-সহ সেব্য। চালের সঙ্গে লাউ সিদ্ধ ও খেসারির ডাল ভিজিয়ে সেব্য।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে নবীবংশ কারবালা

প্রসঙ্গ আলোচনা :

কারবালার সকরুণ ইতিহাস সমগ্র ইসলামের ইতিহাসের এক বিশাল অংশকে অধিকার করে আছে। বিশেষ করে মুসলিম মানসে বা মুসলিম সাধারণ সমাজে কারবালার স্থান আজও বহু উচ্চে। কেননা এই কারবালাকে কেন্দ্র করে নবীবংশের নিধনযজ্ঞ সূচিত হয়েছিল। যা মুসলিম সমাজ কোন দিনই ভুলতে পারে না। বিশাল মুসলিম পুঁথি-সাহিত্যের ভেতর দিয়ে কারবালার নানা কাহিনী নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে। যাতে অনেক সত্য-মিথ্যা ও অতিরঞ্জনও স্থান পেয়েছে। যাই হোক কারবালার ইতিহাস ইসলামের ইতিহাসে অনিবার্য ও অপরিহার্য স্থান লাভ করেছে।

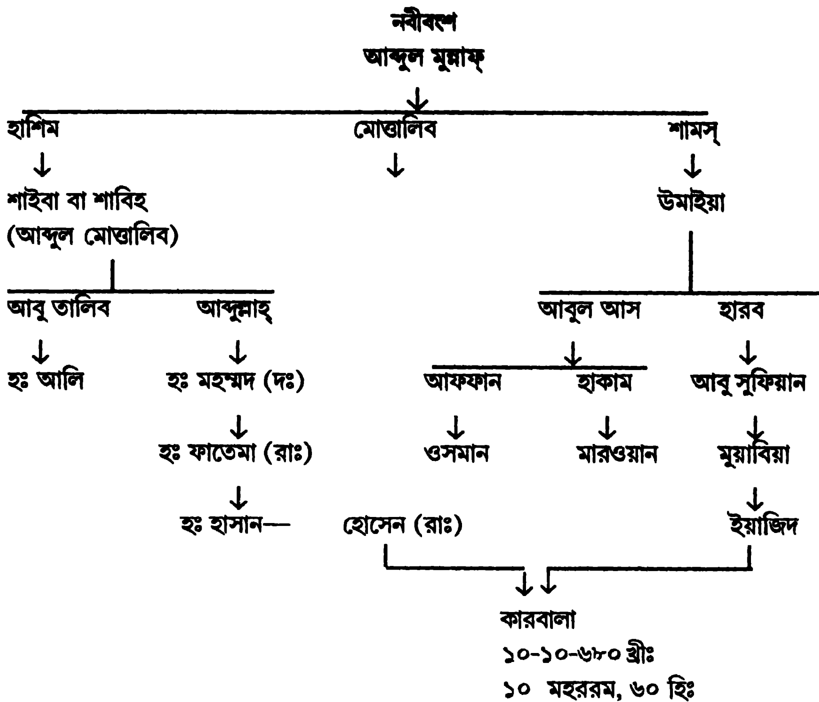
(১) মুসলিম পুঁথি-সাহিত্যে কারবালার মূল যেন নিয়তির হাতে নির্ধারিত ছিল। কথিত আছে, এক ঈদের দিনে বিবি ফাতেমার পুত্রদ্বয় ইমাম হাসান ও হোসেন নতুন জামার জন্য তাদের মাকে পীড়াপীড়ি করে। তখন তাদের দুটো সাদা কাপড়ের জামা দেওয়া হলে তারা রঙিন জামার জন্য জেদ করে। তখন আল্লার ফেরেশ্‌তা তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন—জামা দুটো পানিতে ডুবিয়ে দিতে। পরে দেখা গেল, তারা সবুজ ও লাল বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠল। তখন নবীজীকে এর তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানালেন—এই দুটো পুত্রের বড়টি ইমাম হাসান বিষ প্রয়োগে ও ছোটটি ইমাম হোসেন শহিদ হয়ে মারা যাবে। বিষ প্রয়োগে সবুজ বমি করে মারা যাবে। এবং শাহাদতে অর্থাৎ রক্তে রঞ্জিত হয়ে মারা যাবে। পুঁথি মতে এ ছিল বিধির লিখন।

(২) কারবালা ঘটনার এক প্রান্তে ছিল হাশেমী বংশ ও অন্য প্রান্তে ছিল উমাইয়া বংশ। হাশেমী বংশের ছিলেন ইমাম হোসেন (রাঃ) এবং উমাইয়া বংশের ছিলেন ইয়াজিদ। এই উভয় বংশের পূর্বপুরুষ ছিলেন আব্দুল মুন্নাফ। আব্দুল মুন্নাফের চার পুত্রের মধ্যে দুই পুত্র ছিল—আবুল হাশেম ও আব্দুল শামস্। এই দুই যমজ পুত্রের জন্মকালে ললাটদেশ সংযুক্ত ছিল। করবালে যোগে সেই সংযুক্তি পৃথক করা হয়। এবং তদানীন্তন ভবিষ্যদ্বক্তা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এই করবালের প্রথম সূচনা হবে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচণ্ড কলহে। শেষ পরিণতি হবে কারবালা (এখানে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন মনে সাড়া তোলে যে, তখনকার দিনে অস্ত্রোপচার যোগে সন্তান ভূমিষ্ঠ হত না। স্বাভাবিকভাবেই হতে হত। কীভাবে একসঙ্গে দুটো বাচ্চা প্রসবিত হল, এটা স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা)।

(৩) ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ)-কে যখন হত্যা করা হল, তখন তিনি বলেছিলেন, তোমরা যে তরবারি আজ কোষমুক্ত করছ, তা আর কোন দিন কোষবদ্ধ হবে না। কারবালার করুণ কাহিনী হযরত ওসমান (রাঃ) এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হযরত ওসমান (রাঃ) ছিলেন উমাইয়া বংশের মানুষ এবং মহানবীজীর (দঃ) জামাতা।

(৪) কারবালার পশ্চাতে লক্ষ্য করি আমির মুয়াবিয়া ও তাঁর পুত্র ইয়াজিদের চরম হীনমন্যতা ও মানবিক বিপর্যয়।

(৫) কারবালার পশ্চাতে লক্ষ্য করি, নবীবংশের বা ইমাম হাসান হোসেনের চরম আদর্শ ও মহানুভবতা।



দাস্তান
সহিদে কারবালা
মুন্সী এছহাক্উদ্দিন
১৩৬৪ সাল, ৬২৪ পৃঃ

দাস্তান শহিদে কারবালা একটি মূল্যবান পুঁথি। কারবালা সম্পর্কে বহু পুঁথি আছে। কিন্তু এই পুঁথিটি সকল পুঁথির ব্যতিক্রম। পুঁথি সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থ বিরল। লেখকের আপন কথায় এতে একটি ঘটনাও ছাড় নেই। এ বহু প্রাচীন আরবী ও পারসি সাহিত্যের মূল ঘটনার সারাংশ নিয়ে রচিত। লেখক যে-সমস্ত গ্রন্থ ব্যবহার করেছেন, সেগুলোর স্থানও অতি উচ্চে। পুঁথিটিকে নবীবংশের একটি নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত পূর্ণ ইতিহাসও বলা যেতে পারে।

পুঁথি মধ্যে যে বয়ানগুলোর পরিচয় পেয়েছি, তাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা :

(১) হযরত আব্দুল মুন্নাফের ছোলতানাতের বয়ান, (২) হাশেম ও উমাইয়া, (৩) আব্দুল মুত্তালিব ও হরব, (৩) আবু তালিব-আবু সুফিয়ান, (৪) হযরতের নবুয়ত ও প্রথম অধ্যায়, (৫) হযরত রসুল করিমের দোয়া, (৬) হযরত ফাতেমার ওফাত, (৭) হযরত আলি ও মুয়াবিয়া ও হযরত হাসান। (১০) হযরত হাসান ও এজিদ। (১১) মধু ও খেজুর দ্বারা হযরত হাসানকে বিষপানের প্রচেষ্টা, (১২) হযরত ইমাম হাসান মৌসল শহরে, (১৩) হযরত আব্দুল্লাহ দামেস্ক থেকে মদিনায়, (১৪) হযরত ইমাম হাসানের শাহাদত বরণ, (১৫) জায়েদার মউত, (১৬) হযরত হোসেনের কাছে মুয়াবিয়ার পত্র, (১৭) আমির মুয়াবিয়ার ওফাত, (১৮) মুয়াবিয়া ও হোসেনের মত, (১৯) এমাম হোসেনের নিকট

ইয়াজিদের বয়ত তলব, (২০) হযরত ইমাম হোসেন মক্কা রওনা, (২১) এমাম হোসেনকে কুফাতে দাওয়াত, (২২) কারবালা প্রান্তরে শহিদগণ, (২৩) আশুরার মরতবা (২৪), ফোরাত নদীর পানি উদ্ধার, (২৫) ইমামের জন্য ফেরেস্তাগণের খোদার দ্বারে মোনাজাত, (২৬) ইমাম হোসেনের শাহাদত, (২৭) আহলিয়াতগণের কামজান-নগরে যাওয়া, (২৮) সকলে দামেস্কে পৌছয়, (২৯) দাফন হওয়ার বয়ান (৩০), আব্দুল্লাহ জায়েদের সাজা, (৩১) ওমর মালাউনের সাজা, (৩২) এহিয়া হেরানির লড়াই, (৩৩) শোকে এক বৃদ্ধ মারা যায়, (৩৪) হযরত ইমামের ছের এজিদ সমীপে, (৩৫) এজিদের আনন্দ, (৩৬) হযরত জয়নাল আবেদিন ও এজিদ (৩৭) এমামের শিশুকন্যার শোকে ওফাত (৩৮) হযরত জয়নুল আবেদিন ছের সহ মদিনায়, (৩৯) সীমারের প্রাপ্য দাবি, (৪০) সীমারের শেষ অবস্থা।

প্রসঙ্গ আলোচনা :

মুন্সী এছহাকউদ্দিন রচিত দাস্তান শহিদে কারবালা বাংলার পুঁথি জগতের একটি অমর পুঁথি। একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। অত্যন্ত সততা ও সাধনার সঙ্গে তিনি কারবালার আদি-অন্ত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তিনি যে সমস্ত গ্রন্থগুলো ব্যবহার করেছেন, সেগুলোও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

কারবালার ইতিহাস বড়ই সকরুণ ও বড়ই মর্মান্তিক। এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা বিশ্ব-ইতিহাসেও খুবই কম। মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর দৌহিত্রদ্বয় ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন ছিলেন নবীর মতো নরম ও সাদা চরিত্রের মানুষ। তাই সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের দুস্তর ব্যবধান রয়ে গেছে। এই দুনিয়াতে মানুষ যে মহান আল্লার প্রতিনিধি, ইমামগণ সেই পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁরা কোন রাজা-বাদশার প্রতিনিধি ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন স্বয়ং স্রষ্টারই প্রতিনিধি। তাই তাঁদের হৃদয়ে আসন পেয়েছেন ঋষি হতে নরাধম সকলেই। এমনি ছিল তাঁদের বিশাল হৃদয়।

স্ত্রী জায়েদার ষড়যন্ত্র বারবার ইমামের চোখে ধরা পড়েছিল, কিন্তু ইমাম তাকে বারবারই ক্ষমার চোখে দেখলেন। পরিণতি হল বড়ই ভয়াবহ। ইমাম একদা বিষপানে নিহত হলেন। তবে স্বামী হন্তানী স্ত্রী জায়েদার পরিণতিও কম সকরুণ হয়নি। এটা তারও প্রাপ্য ছিল। আবু সুফিয়ান মহানবীজীকে (দঃ) হত্যা করতে পারেনি ঠিকই। তবে তাঁর পুত্র মুয়াবিয়া এবং মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ কর্তৃক মহানবীজীর (দঃ) দুই প্রিয়তম নাতি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন।

ইমাম হোসেন যখন কারবালা মরু প্রান্তরে এজিদ সৈন্য কর্তৃক বন্দী, তখন তিনি জানতেন ক্ষণিকের জন্যও ইয়াজিদের খেলাফত মেনে নিলে তিনি সপরিবারে রক্ষা পাবেন। এবং এজিদের চক্রান্তের খিলাফত অচিরাৎ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম হোসেনও ছিলেন মানব চরিত্রের চীর ভূষণ। তিনি ছিলেন দুধের মতো সাদা এবং তার চরিত্র ছিল নবীর মতোই শুভ্র। তিনি যেন এক মুহূর্তের জন্যও ওই ননীতে কোন দাগ ফেলতে পারেন না। তিনি যেন এক মুহূর্তের জন্যও কোন অমানুষের নিকট আত্মসমর্পণ বা বয়াত করতে পারেন না। তার আকাশচুম্বী মনুষ্যত্ব ও মানবতা ছিল সূর্যস্বরূপ এবং এই জগতের সাম্রাজ্য ও সমূহ সম্পদ ছিল তার কাছে একটি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতম মাটির প্রদীপস্বরূপ। মহাপুরুষ চিরদিনই মনে-প্রাণে ছিলেন মহাপুরুষ। তিনি সমস্ত কিছুকেই অবলীলায় বিসর্জন দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু ত্যাগ করতে পারেননি তাঁর অভ্রভেদী মনের গরিমা ও মহিমাকে এক মুহূর্তের জন্যও। এই জন্যই তো জগতের কত মহাপুরুষই না প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু রেখে গেছেন সেই প্রাণের চির পরিচয়।

আজ ইমামদ্বয় নেই। মুয়াবিয়া নেই, ইয়াজিদ নেই। আরব খেলাফত নেই। কিন্তু মহাকালের ঘোড়া আজও দুরন্ত, তার পাখি আজও উড়ন্ত। তারা জগৎ-কালিমা মুয়াবিয়া ও ইয়াজিদকে চরম ধিক্কার জানাতে জানাতে ইমামদ্বয়ের সুমধুর স্মৃতিকে বুকে নিয়ে মহাকালের কূলে আজও বেগবান, আজও প্রবহমান।

শাহাদতনামা
বা
আহ্লিয়াগণের জারি
মুন্সী মাজহার আলি

গওসিয়া লাইব্রেরি থেকে নূরউদ্দিন আহম্মদ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৬ সাল, পৃঃ ৩১।

'শাহাদতনামা' দাস্তান শহিদে কারবালার সংক্ষিপ্ত রূপ। সকল গ্রন্থকারই একটি মন্তব্য একইভাবে প্রকাশ করছেন। কারবালার করুণ-কাহিনী নিয়তির হাতে পূর্ব হতেই নির্ধারিত ছিল। কারবালাকে কেন্দ্র করে মহররম মাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা যেন অনেক গুণে বেড়ে গেল। কারবালাকে কেন্দ্র করে এমন অনেক আজগুবি কাহিনী শুনতে পাই, যেগুলো কোরআন বা হাদিসে পাইনি।

অধিকাংশ মুসলিম পুঁথিকার নিয়তির ওর বেশি নির্ভর করেছেন। তারা একটি কথা যেন ভুলে গেলেন, নিয়তির উপর বেশি নির্ভর করলে মানুষের দায়-দায়িত্ব বলতে আর কিছু থাকে না। কিন্তু মানুষ সম্পর্কে ইসলামের যে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত, তা তার দায়-দায়িত্ব।

জীবমাত্র সকলেরেই আছে দেহ প্রাণ
দায় ও দায়িত্ব সহ মানুষ মহান।

এমাম হসন ও হোসয়ন
সন ১৩২৬ সাল, পৃঃ ১৭০

বর্তমান পুঁথিটিতে লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। পুঁথিটি পারস্য গ্রন্থ 'রওজতোশ শোহাজা' নামক গ্রন্থ থেকে অনুদিত।

এখানেও কারবালার করুণ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ। এখানে একটি নতুন কাহিনী জড়িত হয়েছে। হযরত যুবাইয়ের একজন খ্যাতনামা সাহাবী। তাঁর পুত্রের নাম আব্দুল্লাহ্। আব্দুল্লার একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রী ছিল। এজিদ তাকে পাওয়ার জন্য নানা জাল বিস্তার করল। ফলে আব্দুল্লাহ্ তাকে সন্দেহ বশত ত্যাগ করলেন। অতঃপর এমাম হোসেন তার পানি প্রার্থী হলেন। সুন্দরী রাজি হলেন। বিবাহ সম্পন্ন হল। তখন এজিদ হোসেনের প্রতি রাগে অগ্নিশর্মা হলেন। হোসেনকে বধ্ করার প্রতিজ্ঞা নিলেন। ফলে কারবালার কাহিনী রূপ পেল। আরব ইতিহাসে এই ঘটনার কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। সুতরাং এটি কাল্পনিক কাহিনী বলে মনে হয়। আর যদি আব্দুল্লার স্ত্রী তাঁর স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে ইমামকে বিবাহই করেন, তাহলে এখানে ইমামের দোষ কোথায়।

ছহি বড় জঙ্গনামা
মোক্তাল হুসেন
শেখ ইয়াকুব
১৩৬৮ সাল চৈত্র, পৃঃ ১৬০

এই পুস্তকে একটি জিনিস খুব সুন্দরভাবেই দেখানো হয়েছে। সেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ভাল মানুষের কোন জাত নেই, অমানুষেরও কোন জাত নেই। ইমাম হোসেন মুসলমানকুলের তাজ, অথচ একজন মুসলমানই তাকে বধ করল। ইমামের মাথাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করল। সেই প্রাণহীন বিচ্ছিন্ন মাথাটিকে সম্মান জানানোর জন্য একজন বিধর্মী ব্রাহ্মণ তার প্রাণের সাত পুত্রকেউৎসর্গ করে নিজেকেও উৎসর্গ করল। মহান ইমামের প্রাণহীন মাথাকে সম্মান জানানোর জন্য যাঁরা এতখানি করতে পারে, তাঁরা ওই ইমামের প্রাণরক্ষার জন্য কতখানি করতে পারতেন, তা চিন্তা করলেও শরীরে

শিহরণ জাগে। তাহলে ওই ব্রাহ্মণ পরিবার ও ওই এজিদকে আল্লাহ বিচার দিনে কোন চোখে দেখবেন। কে জান্নাতী, কে জাহান্নামী। এই জন্যই বলা হয় ভাল মানুষের কোন জাত নেই, অমানুষেরও কোন জাত নেই।

আসল সহিদে কারবালা

শেখ মহম্মদ মুন্সী

সন ১৩১৯ সাল, পৃঃ ৪৫০

এই পুঁথিটি দাস্তান শহিদে কারবালার মতোই বিশাল গ্রন্থ। একই জিনিসের বর্ণনা নানাভাবে। তখনকার দিনে এটি একটি রেওয়াজ ছিল, একই বিষয়ের উপর বহু পুঁথি রচিত হত।

বিষাদ সিন্ধু

মীর মশাররফ হোসেন

সন ১২৯ সাল

ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান গদ্য লেখকদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমন বিংশ শতাব্দীতে মহম্মদ বরকতুল্লাহ। বিষাদ সিন্ধু মীর সাহেবের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বলতে গেলে তিনিই প্রথম মুসলমান গদ্য লেখক। আমাদের দেশে ঘরে ঘরে কারবালা পরিচিতি লাভ করেছে। এবং এই পরিচয়ের মূলে আছে মীর সাহেবের অমর কীর্তি বিষাদ-সিন্ধু। বিষাদ সিন্ধুর দুটো দিক। একদিকে সে কারবালার আলেখ্য। অন্যদিকে সে বাংলায় মুসলমান গদ্য সাহিত্যের আলেখ্য। প্রথম দিকে মীর সাহেব ততটা সাফল্য অর্জন করতে পারেননি, যতটা পেরেছেন দ্বিতীয় দিকে। তাঁর প্রথম দিকের অকৃতকার্যতা ও অক্ষমতার কারণ, গ্রন্থ মাঝে প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্যের অভাব শুধু নয় বরং বিকৃতিকরণ। তাঁর দ্বিতীয় দিকের সফলতা সাবলীল সাহিত্য সৃষ্টি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দান বাংলা ভাষা কোনদিনই ভুলতে পারবে না। মীর সাহেবের অবদানও মুসলিম গদ্য সাহিত্য কোনদিনই ভুলতে পারবে না।

এছাড়াও মীর সাহেবের আরও ছোট-বড় ২৬টি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

১। রত্নবতী—উপন্যাস, ২। গোরাই ব্রিজ—কবিতা ৩। বসন্তকুমারী—নাটক, ৪। জমিদার দর্পণ—নাটক, ৫। এর উপায় কি, ৬। বিষাদ-সিন্ধু, ৭। সঙ্গীতলহরী ৮। গো-জীবন, ৯। বেহুলা, ১০। উদাসীন পথিকের মনের কথা, ১১। গাজী মিয়ার বস্তানী, ১২। মৌলুদ শরীফ, ১৩। মুসলমানের বাংলা শিক্ষা, ১৪। বিবি খাদিজার বিবাহ, ১৫। হযরত ওমরের ধর্ম জীবন লাভ ১৬। হযরত বেলালের জীবনী, ১৭। হযরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ, ১৮। মদিনার গৌরব। ১৯। মোসলেম বীরত্ব, ২০। ইসলামের জয়, ২। আমার জীবনী, ২২। বাজিমাৎ, ২৩। হযরত ইউসুফ, ২৪। খোতবা, ২৫। বিবি কুলসুম, ২৬। আজিজুননেহার ২৭। সঙ্গীত লহরী, ২৮। সোহরাব রুস্তম।

মীর সাহেবের জীবনকাল ১৮৪৭-১৯১২ খ্রীঃ। আমরা তাঁকেই ক্ষণজন্মা মানুষ বলে থাকি, যিনি একটি বিশেষ ক্ষণে জন্মগ্রহণ করে একটি যুগের অজস্র-অগণিত ক্ষণকে আলোড়িত আন্দোলিত ও প্রভাবান্বিত করে যান। তিনিই ক্ষণজন্মা মানুষ, এই দিক দিয়ে মীর সাহেব ছিলেন একজন ক্ষণজন্মা মানুষ। জাতির জীবনে যিনি তরঙ্গাভিঘাত এনেছিলেন। জাতীয় জীবনের অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটাতে এই ভাবেই এক-একজন এক-একদিন ক্ষণজন্মা মানুষ দেখা দেন। এসবই তাঁর দান। কে কখন আসবেন, তা তিনিই একমাত্র জানেন। জানার ও পাঠানোর অধিকার একমাত্র তাঁরই। তাই সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।

ওফাতে রসুল

সৈয়দ সুলতান

সন ১২০৯ সাল, পৃঃ ২১

'ওফাতে রসুল' পুঁথিটিতে একটি বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করলাম। মহানবীজী (দঃ) তাঁর মহান জীবনের অন্তিম ক্ষণে বারবার একটি জিনিস স্মরণ করেছিলেন। যদি তিনি কোনদিন কার মনে বা দেহে কোন আঘাত দিয়ে থাকেন, তাহলে সে যেন আজ তার পরিশোধ নিয়ে নেয়। কেননা মহান আল্লাহ্ তাঁর নিজস্ব কোন ব্যাপার হলে ক্ষমা করেন দিতে পারেন, যদি সেটা 'হককুল্লাহ' হয়, কিন্তু কোন মানুষের কোন ব্যাপার হলে তিনি ক্ষমা করবেন না। যতক্ষণ সেই মানুষটি তাকে ক্ষমা করবে। মহানবীজীর (দঃ) এই কাজে বা এই দৃষ্টান্তে সমগ্র মানবসমাজের জন্য আছে এক দুর্লভ মহান শিক্ষা। অর্থাৎ কোন মানুষ যেন কারো প্রতি জুলুম না করে। জুলুম বহু প্রকারের হয়ে থাকে। সরব জুলুম, আবার নীরব জুলুম। অনেক স্বামী স্ত্রীর প্রতি নীরব জুলুম করে থাকে। অর্থাৎ আপন স্ত্রীকে ব্যবহার না করে অন্য নারীকে ব্যবহার করে। আবার স্ত্রী ও অনেক সময় স্বামীর প্রতি ওই একই কাজ করে। স্বামীর শক্তির বাইরে যে দাবি দাওয়া, তাও নীরব জুলুম। পশু-পক্ষী, জীব-জন্তুর প্রতিও জুলুম হয়ে থাকে, এবং সর্বাপেক্ষা বড় জুলুম নিজ আত্মার প্রতি। মানুষ যখন কোন অন্যায় কাজ করে তখন আপন আত্মার প্রতিও জুলুম করা হয়। মানুষ যখন অতিরিক্ত পরিশ্রম করে, তখন শরীরের প্রতি জুলুম করা হয়ে থাকে। ইসলাম ধর্মে প্রতিটি অঙ্গের হক আছে, তাদের হক পালন না করলে জুলুম করা হয়। তাই ইসলামে বৈরাগ্য নেই। সকল অঙ্গের হক সকলকে মিটিয়ে দিতে হবে। এটাই ইসলামি বিধান।

ওফাত নামা

মৌলবী আব্দুল কাদের

১৩২৬ সাল, পৃঃ ৬৩

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পরলোকগমনকে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থটি বিরচিত। এইরূপ পুঁথি আরও বহু আছে। মহানবীজীর (দঃ) পরলোকগমন একটি অচিন্ত্যনীয় ঘটনা ছিল। কেননা তিনিই ছিলেন নবীকুলের শেষ ও শ্রেষ্ঠতম নবী। সেই নবীর পরলোকগমন। পৃথিবীতে আর কোনদিনই এরূপ পরলোকগমন ঘটবে না। সুতরাং এই পরলোকগমনটি ছিল এক ও অদ্বিতীয় ঘটনা। যা আর কোনদিনই ঘটবে না। যেহেতু তিনিই ছিলেন শেষ নবী।

নূরনামা-হুলিয়ানামা

মহম্মদ খাতের

১৩৬৩ সাল, পৃঃ ১২

মহানবীজীকে (দঃ) নূরের অর্থাৎ আলোর নবী বলা হয়। এর কারণ আছে। যার শরীর বা দেহ আছে, তার ছায়াও আছে। নবীজীর (দঃ) দেহ ছিল, কিন্তু ছায়া ছিল না। একমাত্র আলোর ছায়া নেই, বাকি সবার ছায়া আছে। এই ছায়াহীনতার জন্য নবীজীকে (দঃ) নূরের নবী বা আলোর নবী বলা হয়। এমনকি নিবিড় অন্ধকারে নবীজী কোথাও গেলে স্থানটি বেশ আলোময় হয়ে উঠত।

ছহি বড় এমাম চুরি

মুন্সী ফকির মহম্মদ

১৩৬০ সাল পৃঃ ১৫

'এমাম চুরি' একটি ছোট পুঁথি। একবার এমামদ্বয় হারিয়ে গেলে পরিবারে অশান্তি দেখা দেয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই পুঁথিটি রচিত। পুঁথিটিতে কিছু কল্পনার আশ্রয় আছে বলে মনে হয়।

আফৎনামা

রাধাচরণ গোপ

সন ১২৩৪ সাল

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, একজন অমুসলমান লেখক কারবালার উপর একটি পুঁথি রচনা করেছেন। এই একই লেখক মহানবীজী (দঃ)-র একটি ছোট জীবনীও রচনা করেছেন। রচনাটি ছোট হলেও গুণের দিক হতে উত্তম।

ইমামের কেচ্ছা

রাধাচরণ গোপ

সন ১২৩৪ সাল

একই শ্রেণীর পুঁথি। রাধাচরণ গোপ রচিত ইমামের কেচ্ছা সর্বমোট চারটি পাওয়া গেছে। কবি রাধাচরণ গোপের সাহিত্যভাণ্ডার ইসলামি সাহিত্য ভাণ্ডারে কম অবদান জোগায়নি। কবি তন্ময়চিত্তে ইসলামি বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। নাম দিয়েছেন 'আফৎনামা'। আফৎ অর্থ বিপদ। কবির দেওয়া নামটিও বড় সুন্দর হয়েছে। শব্দচয়নের দিক থেকেও কবি সার্থকভাবে ইসলামি সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এখানে তার স্বকীয় প্রতিভার পরিচয়ও ফুটে উঠেছে। কবি যে কেচ্ছা রচনা করেছেন, তা নয়। গবেষকের চোখে তিনি বহু কিছুর মূল ও সন্ধান করেছেন। কবি রাধাচরণ গোপের সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি, তিনি হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের একজন সার্থক কবি।

নবম অধ্যায়
বাংলা সাহিত্যে নবীবংশ জঙ্গনামা বা ইসলামি জঙ্গনামা

নবীবংশ জঙ্গনামা বা ইসলামি জঙ্গনামা :

ইসলামি বাংলা সাহিত্যে 'নবীবংশ কারবালা' ও 'নবীবংশ-জঙ্গনামা' বিশেষ দুটি অধ্যায়। বলতে গেলে এই দুটো অধ্যায়কে কেন্দ্র করেই ইসলামি বাংলা সাহিত্য সর্বাপেক্ষা বেশি আলোড়িত হয়েছিল। নবীবংশ জঙ্গ নামাতে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আলোচিত হয়েছে। কোথাও যুদ্ধের কারণ, কোথাও যুদ্ধের পরিণতি, কোথাও যুদ্ধের ভয়াবহতা ইত্যাদি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

ইসলামি বাংলা সাহিত্যের জঙ্গনামা অনেক ভাল জিনিসের অবতারণা করেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে ওই ভাল অবিমিশ্রিত হয়নি। ওখানে যথেষ্ট মন্দও এসে গেছে। মহানবীজীর (দঃ) উত্তম বাণীর ওখানে সর্বত্র সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। তিনি বলেন—

দেখিয়াছি ঘৃণাভরে রাজ্য ভাঙাগড়া
দেখিনি মানুষ তার মনুষ্যত্ব ছাড়া।

মহানবীজী এই পৃথিবীতে এসেছিলেন রাজ্য গড়তেও নয়, রাজ্য ভাঙতেও নয়। তিনি এসেছিলেন অমানুষকে মানুষ করতে। তিনি এসেছিলেন মনুষত্বহীন জগৎকে মনুষ্যত্ব দান করতে, মানবতায় জাগরিত করতে। যারা মানুষ হল, যারা জাগরিত হল, তাদেরই নাম হল মুসলমান।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ জঙ্গনামা পড়ে মনে হয়, ইসলাম এসেছিল দুটি কারণে, (১) প্রথমটি, তরবারির যোগে মানুষকে মুসলমান করতে ও (২) তরবারির যোগে রাজ্য গড়তে। এতে অমুসলমানগণের ইসলাম সম্পর্কে ধারণাটি গেল পালটে। কিন্তু এ দুটোর একটিও সত্য নয়। এই কারণে ইসলাম আজও বিশ্বে Misunderstood religion. এর জন্য দায়ী মুসলমানগণই। ইসলাম ধর্মের জন্য কোথাও তরবারি বের করেনি, রাজ্যগড়ার জন্যও নয়। সে তার তরবারি বের করেছিল সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। ধর্মে সকলকেই পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল। সে বলেছিল ধর্মে যার যা খুশি, সে সেই ধর্ম পালন করুক, সেখানে ইসলামের কিছু বলার নেই। কিন্তু সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা সে মেনে নেবে না।

ইসলামের এক হাতে কোরআন, অন্য হাতে কৃপাণ, একথা মূলত ঠিকই। কোরআন নির্দেশ দিচ্ছে ভাল কাজ কর এবং মন্দ হতে দূরে থাক। যখনই মানুষ ভাল মেনে নিল, কোরআন সেখানে নীরব। যেখানে মানল না। কোরআন সেখানে সরব. তখনই সে অন্যায়-অত্যাচারীর ঘাড়ে তুলে ধরল কৃপাণ। এবং ধর্মের জন্য বলল— যার যা খুশি সে সেই ধর্ম পালন কর। এখানে ইসলামের দোষ কোথায়। আজকের ভারত তো ওই পথেই চলছে। ধর্মে কোন বাধাবন্ধন নেই। জোর-দবরদস্তি নেই, কিন্তু সামাজিক বিধিবিধান না মানলে রাষ্ট্রের তরবারি, প্রশাসনের কৃপাণ তার ঘাড়ে চাপবেই। এই দিক থেকে ইসলাম তো চিরন্তন নীতি দান করেছে। এই নীতিতেই তো আজকের বিশ্বকে চলতে হবে, নচেৎ খুনোখুনি করে মরতে হবে। তাই কোরআন আল্লার শেষ নির্দেশবাণী।

মহানবীজী (দঃ) কেন যুদ্ধ করেছিলেন—

সুখময় শান্তিময় করিতে সংসার
বিশ্বেরে বিধান দিলে বিশ্ববিধাতার।.....

তুলিতে মানব-জাতি মনুষ্য সম্মানে
এক সুরে ডাক দিলে মানব সন্তানে।
দুই হাতে তুলে ধরে দিলে আমন্ত্রণ
শাশ্বত জীবনের স্বাদ বিতরণ।....

জেহাদ যাহার লাগি যুদ্ধ আমরণ
সাম্য-ভ্রাতৃত্ব 'পরে সমাজ গঠন।
ডাকিলে নিবিড়ভাবে নিখিল নিদান—
দাও আল্লাহ্ অবুঝেরে বোধশক্তি দান।......

সমগ্র জীবনে যার নাহি কোন ছল
সত্যের জীবন দীপ সহজ-সরল।
জেহাদ যাহার লাগি করিলে বরণ
অন্যায় অবিচার-করিতে দমন।.....
জীবন জুড়িয়া তব অবিরাম ধ্যান
দাও প্রভু অবোধেরে বোধশক্তি জ্ঞান।
করিলে প্রার্থনা তুমি ওগো নিরঞ্জন
দাও প্রভু সকলেরে সত্যান্বেষী মন....

অবোধ মানবকুলে যত দোষ পাও
তুমি তাদের ক্ষমা করে বোধোদয় দাও।
আকুতি-কাকুতি মোর ভুলেভরা ভূমি
ভূ-জনে বুঝিতে দাও—মহাসত্য তুমি।
করিলে প্রার্থনা তুমি নিত্য নিবেদন—
দাও তুমি সকলেরে তোমামুখী মন।
বিশ্বের করুণা তুমি করুণার ভরে
এসেছিলে এই বিশ্বে সকলের তরে।
(দ্রঃ লেখকের মহানবী গ্রন্থ, চরিত্রে মহানবী, অনুচ্ছেদ ৯৯, পৃ ৪৮৪, ৪র্থ সংস্করণ)

মহানবীজীর যুদ্ধ নীতি :

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে যে যুদ্ধনীতি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখিয়ে গেছেন, আজও সুসভ্য বিশ্ব, সুশিক্ষিত জগৎ তার প্রয়োগ করতে পারল না। তাহলে মহানবীজী (দঃ) মানবতার কত বড় হিমালয় ছিলেন। তা একবার সকলেরই চিন্তা করা দরকার। তাঁর দেওয়া যুদ্ধনীতি সারা বিশ্বের জন্য, মানবসমাজের জন্য কত স্বাস্থ্যকর ছিল। কত মানবিক ছিল, তা একটিবার চিন্তা করা প্রয়োজন। তা হলেই বোঝা যাবে, মহানবীজীর (দঃ) জেহাদ কি জন্য ছিল। তা হলেই বোঝা যাবে, মহানবীজী (দঃ) কেন বলেছিলেন—

দেখিতে উৎসুক আমি জয়ের কারণ
তোমার বীরত্ব নয় তব আচরণ।
তোমাতে পশুতে করে সহস্র তফাত
ইনসান তোমার নাম তব ইন্সানীয়াত্।

(১) যুদ্ধক্ষেত্রকে তিনি আল্লার এবাদতখানা ও ন্যায়-বিচারালয়ে পরিণত করেছিলেন। এই জন্যই সেখানে আল্লার উপাসনা ও ন্যায়েব পতাকা উত্তলিত হয়েছিল। বিশ্বের একটি বড় প্রবাদ কে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছিলেন। প্রবাদটি— 'রণে ও রসে (প্রেমে) অন্যায় বলে কিছু নেই। তিনি প্রমাণ করে গেছেন। অন্যায় অন্যায়ই, ন্যায় ন্যায়ই, সেখানে রণ ও রস বলে কিছু নেই। তিনি ঘোষণা করেছিলেন—যুদ্ধের উদ্দেশ্য অত্যাচার, অন্যায়, ধ্বংস, হিংসা, অশান্তি ও লুণ্ঠন নয়। বরং এদের বিপরীতগুলোকে প্রতিষ্ঠা করাই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হবে।

(২) দেশজয় ও সম্পদ লাভের জন্য যুদ্ধ নয়, এরূপ যুদ্ধকে তিনি একেবারেই হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য থাকবে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা। মানবতার পতাকা উত্তোলন ও মনুষ্যত্বের আহ্বান। মানুষ ছাতা মাথায় দেয় বৃষ্টি ও রোদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। মহানবীজীর (দঃ) মতে সাম্রাজ্য হোক দেশ ও দশকে অত্যাচার ও অনাচার থেকে বাঁচানোর জন্য। রাজা-বাদশাহ ও দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদ বানানোর জন্য নয়ই। সমাজের কলঙ্ককে দূর করার জন্য। কলঙ্ক বাড়ানোর জন্য নয়।

(৩) সৈনিকদের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিকতা রক্ষার কঠোর নির্দেশ ছিল। মদ্যপান, ব্যভিচার ও লুঠতরাজ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল।

(৪) যুদ্ধলব্ধ ধনের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের জন্য নির্ধারিত ছিল, এটা ছিল সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পদ। এটা খরচ হত সমাজের অভাবী, দীন-দুঃখী মানুষের কল্যাণে। বাকি সৌনিকদের মধ্যে বণ্টিত হত।

(৫) যুদ্ধক্ষেত্রে তক্‌বির ব্যতীত যে কোন রণ-হুঙ্কার নিষেধ ছিল। কেননা ইসলামের যুদ্ধ ছিল কেবলমাত্র যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই সংগ্রামকেই জিহাদ বলা হত। জিহাদ কোন রাজ্যজয় বা সম্পদলাভের জন্য হয় না।

(৬) যুদ্ধে মুসলমানদের জন্য প্রথম আক্রমণ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। আত্মরক্ষা করা ও অন্যায়কে প্রশমিত করা এবং অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রদমিত করা ব্যতীত ইসলামে কোন জিহাদ ছিল না।

(৭) যুদ্ধে স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, বালক-বালিকা, রোগী ও অন্যান্য সকল অসহায় ও অসামরিক ব্যক্তিকে আঘাত করাকে একেবারেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

(৮) মনুষ্যজগৎ ছাড়াও প্রাণীজগৎ, প্রকৃতি জগৎ, জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ, শস্যখেত, স্থাপত্য, ঘরবাড়ি ইত্যাদির ওপর হস্তক্ষেপকে একেবারেই পাপ বলে ঘোষণা করেছিলেন।

(৯) নদীর জল, পুকুরের জল, কিংবা যে কোন জলাশয়কে বন্ধ করা ও বিষাক্ত করাকে হারাম বলে ঘোষণা করেছিলেন।

(১০) রাজদূতকে হত্যা মহা অন্যায় ও বিশ্ব-শান্তির পারপন্থী বলে ঘোষণা করলেন।

(১১) নিহত শত্রু বা সৈনিকের নাক-কান কাটা বা যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিকৃত করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। অথচ ওই যুগে নিহত বা পরাজিত শত্রুর নাক ও কান কেটে আনতে পারলে তাঁকে পুরস্কৃত করা হত। আজ থেকে চারশো বছর পূর্বেও এ জঘন্য কাজের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অথচ আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বেই মহানবীজী (দঃ) ওটাকে নির্মম হস্তে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ২৭-১১-১৯৯৩ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার চার পৃষ্ঠা হতে একটি মর্মান্তিক ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। এ ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে ইসলামের যুদ্ধনীতি কত সামাজিক ও মানবিক।

"২০ হাজার ছিন্ন রক্তাক্ত নাক। ৪০০ বছর আগে কোরিয়ায় জাপানের বর্বরতার চিহ্ন। আগ্রাসী জাপানি ফৌজ মৃত ও জীবিত কোরীয়দের নাক কেটে নিত আদিম যুদ্ধ বিজয়ীর উন্মাদনায়। সংগৃহীত নাকের বদলে কর্তাদের থেকে মিলত নগদ পুরস্কার ও পদোন্নতি। ঐতিহাসিকদের হিসাবে ১৫৯৭ সালের ওই জাপানি হানায় কমপক্ষে ১ লক্ষ কোরীয় নিহত হন। প্রথম যুদ্ধটি হয়েছিল আজকের সিওল থেকে ২২০ কিমি দূরে পুয়ানে।

সেই ছিন্ন নাকের স্তূপের দগ্ধাবশেষের সঙ্গে আবিষ্কৃত কিছু নাকও স্বদেশে নিয়ে যায় বিজয়গর্বী জাপ ফৌজ। ১৯৮৩ সালে তার সন্ধান পান এক দক্ষিণ কোরীয় ঐতিহাসিক। জাপানের ওকাহামায় এক প্রাচীন সৌধ। রাসায়নিক ও লবণে জড়ানো ছিল সেগুলি। গতবছর সবটাই ফিরিয়ে আনা হয় দক্ষিণ কোরিয়ায়। আজ সেই ভগ্নাবশেষ পুয়ানের রণক্ষেত্রের মাটির গভীরে ছড়িয়ে দেওয়া হল। এই অশ্রুসজল শেষকৃত্যে যোগ দিতে হাজির ছিলেন ১৫০০০ মানুষ।"

(১২) মহানবীজী (দঃ) শত্রু হোক, সৈনিক হোক কেউ আত্মসমর্পণ করে আশ্রয় চাইলে, সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় দেওয়ার বিধান দান করেন।

(১৩) নিহত সৈনিকের পশুকেও যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাত করা নিষেধ ছিল।

(১৪) যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় হোক, পরে হোক, পূর্বে হোক, শত্রু হোক, প্রস্তাব দিলে তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণের নির্দেশ দেন। খাইবার বিজয়, হুনাইন যুদ্ধ, তায়েফ বিজয়, তাবুক অভিযান, হুদাইবিয়ার সন্ধি, সবার ওপর মক্কা বিজয় তার চির জ্বলন্ত প্রমাণ। পরবর্তীকালে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (কঃ) ও সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের জয় হাতের মুঠোতে এনেও কুচক্রী মুয়াবিয়ার ছলনাভরা শান্তি প্রস্তাব মেনে নেন। এটা ছিল মহানবীজীর (দঃ) শিক্ষার চরম দৃষ্টান্ত।

(১৫) যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য কেবলমাত্র ঘোষণা নয়, যে-নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত মহানবীজীর (দঃ) রেখে গেছেন। বদর যুদ্ধের বন্দীগণ তার চির জ্বলন্ত প্রমাণ।

এই যুদ্ধনীতিগুলো মহানবীজীর (দঃ) শুধু মুখের কথা নয়। তাঁর জীবনে ছোট-বড় ৪৫টা জিহাদ অতিক্রম করেছে। বিশেষ করে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর থেকে ওহোদের যুদ্ধ, খাইবারের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ, হোনাইনের যুদ্ধ, তাবুকের যুদ্ধ, বিশেষ করে মক্কা বিজয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি যে আদর্শ প্রয়োগ করে গেছেন তার কোন দৃষ্টান্ত আজও বিশ্ব স্থাপন করতে সক্ষম হল না। তিনি যখন মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের ন্যায় পাপের পাহাড়ের সম্মুখে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর সম্মুখে অসত্যের এভারেস্ট তুষারের ন্যায় ঝড়ে পড়ত। এই কারণেই তিনি একদিন শূন্য হাতেই হতে পেরেছিলেন বিশ্বের ত্রিকালব্যাপী সর্বশ্রেষ্ঠতম আদর্শ সেনা-নায়ক। আল্লার অসীম শক্তি ধারণ করেছিলেন অন্তরে ও হৃদয়ে। যে শক্তির সামান্য বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই মক্কা বিজয়ে :

আচরণে ছিল তব এমনি বিনয়
তোমার বিনয়ে হল মক্কা বিজয়।
পেয়েছিলে মহামন মহান হৃদয়।
তোমার স্নেহের জয় মক্কা বিজয়।
আরব আজন্ম জুড়ে শত্রুকুলও কয়
তোমার প্রেমের জয় মক্কা বিজয়।
মহাকাল তব স্মৃতি বহিবে নিশ্চয়—
তোমার প্রীতির জয় মক্কা বিজয়।
আকাশে বাতাসে সবে কহিছে নিশ্চয়—
তোমার ধৈর্যের জয় মক্কা বিজয়।

অন্তরে বাহিরে ছিলে কত মায়াময়
তোমার মায়ায় জয় মক্কা বিজয়।
পাপী তাপী সকলেতে চিরদিন কয়—
তোমার ক্ষমার জয় মক্কা বিজয়।

এই ছিল মহানবীজীর (দঃ) জঙ্গ ইতিহাস। কিন্তু ইসলামি বাংলা সাহিত্যে যা লক্ষ্য করলাম, তা বড়ই করুণ। পুঁথিকারগণ ইসলামের গৌরব-সৌরভ-মাহাত্ম্য-বীরত্ব ইত্যাদিকে ফলাও করে দেখাতে গিয়ে যে পথ ধরেছেন, সেখানে তাঁদের অজ্ঞাতে ইসলাম বেশ একটু ঘা খেয়ে গেছে। আমার মনে হয়, এটা তাঁদের অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার। গভীরভাবে চিন্তা করলে হয়তো বা তাঁরা ওই পথ ধরতেন না। অধিকাংশ পুঁথিকার এই ত্রুটি হতে নিষ্কৃতি পাননি। মহানবীজী (সাঃ) এই পৃথিবীতে গর্ব বা গৌরব নয় বরং সর্বজনগ্রাহ্য কল্যাণমুখী ও আদর্শস্থানীয় একটি নীতিমালা দান করতে এসেছিলেন। নীতির সহস্র ফুলে সজ্জিত মালাটির নাম ইসলাম। এটিই ছিল মহানবীজীর (দঃ) জঙ্গনামার মূল উদ্দেশ্য।

মহানবীজী (দঃ) এই পৃথিবীতে কোন গর্ব বা গৌরব গাঁথা রচনা করতে আসেননি। তিনি এসেছিলেন পৃথিবীটিকে গৌরবময় করে তুলতে। তিনি কোন একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সৃষ্টি করতেও আসেননি। তাঁর গোষ্ঠী ছিল সমগ্র মানব গোষ্ঠী। ৩৪ : ২৮। যে সমস্ত নর-নারী তাঁর হাতে হাত দিয়ে বা তাঁর নীতি গ্রহণ করে নিল তারাই হলো ভাল মানুষ, সৎ মানুষ এবং এই ভাল মানুষগুলোর নাম হল মুসলমান। তখন মুসলমান মানেই ছিল ভাল মানুষ।

দেখিয়া কোন মুসলিম হাতে জুয়ার আসরে তাস
ভাবিও না কোরআন-হাদিস ইসলামের ইতিহাস।

তবে ইসলামি বাংলা সাহিত্যে নবীবংশ জঙ্গনামাকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট অধ্যায় গড়ে উঠেছে এবং অগণিত মুসলিম ওখান থেকে পেয়েছে অফুরন্ত আনন্দ। এই দিক থেকে সাহিত্য জগতে তাঁদের দান অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কেননা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ধর্ম মানুষের মনে আনন্দের সঞ্চার করা। মানব-মনকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি দেওয়া। এটা মনুষ্য সমাজের জন্য কম কথা নয়। তাই নবীবংশ জঙ্গনামাও একটি সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যাচার্য গবেষণাচার্য আমার স্বর্গত মাস্টার মশাই ডঃ সুকুমার সেন বলেন :—

"বাঙ্গালী হিন্দুর পুরাণ-পাঁচালীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ইসলামি পদ্ধতির লেখকেরা বেশীদিন এড়িয়ে চলতে পারলেন না। তাঁরা ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের জীবনচরিত ও কাফের দলন কাহিনী ঢালাই করলেন হরিবংশ পাণ্ডববিজয়ের ছাঁচে। এই রচনাগুলি দু-শ্রেণীর। এক শ্রেণীতে পড়ে পয়গম্বরদের কাহিনী। এগুলির নাম সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'নবীবংশ', 'রসুল বিজয়'। 'রসুলনামা বা মোহাম্মদ বিজয়'। উনবিংশ শতাব্দীতে কাছাছোল আম্বিয়া অর্থাৎ নবীদের কেচ্ছা। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হচ্ছে হযরত নবীর পরবর্তী খলিফাদের বিজয়-অভিযান ও গৃহবিবাদের বর্ণাঢ্য কাহিনী। এগুলির সাধারণ নাম জঙ্গনামা। অর্থাৎ যুদ্ধকথা।

জঙ্গে খয়বর
ছহি বড় জঙ্গে রসুল
জঙ্গে হজরত আলি
মৌলবী আজহার আলি
১৩৬২ সাল,১৩১৯ রচনাকাল

ইসলামের ইতিহাসে খাইবার বিজয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধেই হযরত আলি তাঁর অভাবনীয় বীরত্বের জন্য মহানবীজীর (দঃ) কাছ থেকে "আসাদুল্লাহ্" অর্থাৎ 'আল্লার সিংহ' উপাধি

লাভ করেন। ইসলামের ইতিহাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের মধ্যে 'খাইবার' যুদ্ধ অন্যতম। এই যুদ্ধের বিজয়ের কথা আল্লার নবী স্বপ্নযোগে আগেই জানতে পেরেছিলেন। এই পুঁথিটিতে মহাবীর হযরত আলির নানা যুদ্ধের বিচিত্র ঘটনারাশি বর্ণিত হয়েছে।

এই যুদ্ধে মহানবীজী (দঃ) কয়েকজন বীরকে পর পর যুদ্ধে নামার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ণীত হয়নি। তখন তিনি মহাবীর হযরত আলিকে ডাক দিলেন। ওই সময় হযরত আলির চোখ উঠেছিল। মহানবীজী (দঃ) তাঁর চোখে আপন মুখের একটু লালা লাগিয়ে দেওয়ায় তাঁর চোখ ভাল হয়ে যায়। এবং তিনি সেনাপতি রূপে যুদ্ধের পতাকা গ্রহণ করেন। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় হযরত আলির ঢাল ভেঙে গেলে তিনি একটি দুর্গের একটি লৌহ কপাটকে তুলে নিয়ে ঢাল রূপে ব্যবহার করেন। যুদ্ধশেষে তিনি ওটি নামিয়ে দেন। যে লৌহ-কপাট ঢালটি হাতে নিয়ে হযরত, আলি সারাদিন বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করলেন, সেই ঢালটিকে পুনরায় ওই দরজাতে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য সাতজন বীরের প্রয়োজন হয়েছিল। তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে হযরত আলি যে শক্তি ধারণ করেছিলেন তা অচিন্ত্যনীয়। এই কারণে হয়তো বা পবিত্র কোরআন বলে—"তোমরা তাদের বধ করোনি। আল্লাহ্ই তাদের বধ করেছেন।" ৮ : ১৭। এই যুদ্ধেই হযরত আলিকে মহানবীজী (দঃ) আসাদুল্লাহ আল্লার সিংহ উপাধি দান করেন। এই যুদ্ধের পর ইহুদীগণের মেরুদণ্ড একেবারেই ভেঙে যায়। যেমন আহ্যাব বা খন্দকের যুদ্ধের পর মরু-বেদুঈনদের মনের অমিতবাণী একেবারেই নিস্তেজ হয়ে যায়। মহানবীজীর (দঃ) মক্কা বিজয়ের পেছনে আরব কোরাইশের আত্মসমর্পণের যে গোপন রহস্য, তা ছিল ওই দুটিই—মেরুদণ্ডহীন ইহুদি এবং ফণাহীন আরব কোরাইশ। এই কারণেই মক্কা বিজয়ে আর কেউ মাথা তুলতে পারেনি। তারা হত্যোদ্যম হয়েছিল। সাহস হারিয়ে ফেলেছিল।

সচিত্র
ছাহ্ আসল ও বড়
জঙ্গে খয়বর
মুন্সী জোনাব আলি
১৩৬০ সাল

খাইবার বিজয়ের একই ঘটনা বিভিন্ন লেখকের কলমে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। মদিনাতে আহ্যাব-যুদ্ধে ইহুদিগণ মহানবীজীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। যার ফলে তাদের মদিনা থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছিল। তারা খাইবারে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু মহানবীজী যখন হোদাইবিয়া সন্ধি নিয়ে মক্কার কোরেশদের সঙ্গে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তখন খাইবারের বিশ্বাসঘাতক ইহুদিগণ মদিনা আক্রমণের ও লুণ্ঠনের চেষ্টা করে। কিন্তু সফল হয়নি। মহানবীজী (দঃ) মদিনা ফেরার পর এই সংবাদ তাঁর কর্ণগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খাইবার বিজয়ের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে খাইবার বিজয় হয় ৬২৮ খ্রীস্টাব্দে।

ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়ার কথা

এই সমস্ত স্থানের পুঁথি আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে বঙ্গের পুঁথিকারগণ প্রথমেই আরবীয় বীরগণের জীবনচর্চা আরম্ভ করেননি। তাঁরা প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিলেন—দেশীয় বীর-সূফী-দরবেশ ও গাজীগণের জীবনচরিত ও জঙ্গনামা নিয়ে। পরে আরবী ফার্সী গ্রন্থের অনুসরণে ও অবলম্বনে আরবীয় বীরগণের জঙ্গনামা রচনা করেন।

পশ্চিম বাংলায় তখন ইসলামি পীঠস্থান বলতে ছিল দুটি পাণ্ডুয়া। একটি ছিল ত্রিবেণী-পেঁড়ো। অন্যটি ছিল হাওড়া-হুগলি সীমান্তে ভূরশুটে। এখানে সূফী খাঁ বা ইসমাইল গাজীকে উপলক্ষ করে একটি পীরস্থান গড়ে উঠেছিল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে। এই ইসলামি গাজী বা সূফী খাঁ বা বড় খাঁ-কে কেন্দ্র করেই ভূরশুট মান্দারনের অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইসলামি সাহিত্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়া :

ত্রিবেণীর কাছাকাছি যে পাণ্ডুয়া, যাকে ছোট পেঁড়ো বলা হত যেখানে আছে শাহ্-সূফী সুলতানের (রঃ) মাজার শরিফ। এখানে একটি উঁচু মিনার আছে, যাকে ট্রেন থেকে দেখা যায়। ওখানে একটি পীরপুকুরও আছে। একটি মসজিদ আছে। এখানে একটি বিশাল মসজিদের ভগ্নাবশেষও আছে। কিন্তু ওখানে গিয়ে একটি জিনিস বুঝতে পারলাম না। শাহ সূফী সুলতানের (রহঃ) মাজারের সম্মুখের মসজিদটি এখনও অক্ষত আছে। আমি পাণ্ডুয়া সুলতানিয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্রাবস্থায় ওই মসজিদে বহুবার নামাজ পড়েছি। এই ছোট মসজিদটি এখনও অক্ষত আছে। কিন্তু ওই বিশাল মসজিদটি কেন ভেঙ্গে পড়ল, বুঝতে পারলাম না। এই বিশাল মসজিদের ভগ্নরূপ এবং মালদহের বিশাল আদিনা মসজিদের ভাঙা রূপ একই ধরনের লক্ষ্য করলাম। আমার মনে হল বয়সেব ভারে এগুলো ভাঙ্গে নি। কোন ঘাতকের হাত পড়েছিল। ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম গঙ্গাতীরে অবস্থিত জাফর খাগাজী মসজিদেরও একই অবস্থা। এখানে ভাল ভাল কয়েকটি মাজার শরিফ দেখে এসেছি। এবং মসজিদ গায়ে কোরআনের বহু আয়াত শরিফ লক্ষ্য করেছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ওখানে গিয়েছিলাম।

পাণ্ডুয়া নগরে তখন পাণ্ডুরাজা সমাসীন ছিলেন। নগরে সকলেই হিন্দু ছিল। এই সময়ে তিন জনপীর তিন স্থানে পৌছন।

বড় পেঁড়ো ছোট পেঁড়ো তিরবেণী আর
পীরের খাতেরা আলাহ্ করেছেন তৈয়ার।
তিন পীরে তিন স্থানে বক্‌শিশ করিল
তিন পীর তিন স্থানে জাহের হইল।
কুতুব জেন্দা রহিল বড় পেঁড়ো ধামে
গৌড়-বাদশাহী যার জাহের আলমে।
জাফর খাঁ গাজী রহিল ত্রিবেণী স্থানে
গঙ্গা যাবে দেখা দিল ডাক শুনি কানে।
আল্লার পেয়ারা পীর শাসূফী সোলতান
পাঁড়োয়া মাকান মাঝে করেন মাকান।

এই তিন সূফী তিন স্থানে ইসলাম প্রচারে অবতীর্ণ হলেন। বাধা পেলেন সেখানকার স্থানীয় শাসকের পক্ষ হতে। বাধল যুদ্ধ। যুদ্ধে শাসকগণ পরাজিত হলেন। ইসলামের ঝাণ্ডা আকাশে উড়ল। তৈরি হল মসজিদ ও মাদ্রাসা। এগুলো করতে মাটির প্রয়োজন হল। তৈরি হল পীরপুকুর। আমি লক্ষ্য করেছি সমাধিগুলোর গাত্রে কোথাও কোথাও হিন্দুদের দেবীগণের মূর্তি আঁকা আছে। ত্রিবেণী জাফর খাঁ গাজার সমাধিস্থলটি দেখলেই বোঝা যাবে। এমনকি পাণ্ডুয়া মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখলেও বোঝা যাবে।

যাই হোক সে যুগের সূফী দরবেশগণকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে বা সারা বাংলাতে এরূপ ঘটনা ও কাহিনীর অভাব নেই। এগুলোও জঙ্গনামার অন্তর্গত।

ছহি বড়
আমির হামজা
১ম খণ্ড : গরীবুল্লাহ
২য় খণ্ড : সৈয়দ হামজা
১২০১ সাল, পৃ. ৩২৩

গরীবুল্লাহ :

পাঠান রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গৌড় দরবারের নির্বাপিত দীপশিখা বাংলার সীমান্তের সামন্ত রাজসভাগুলোতে বহু গুণে জ্বলে ওঠে কামতা-কামরূপে, ত্রিপুরায়, দরঙ্গ কাছাড়ে, চাটিগাঁ-রোসাঙ্গে এবং মল্লভূম-ধলভূমে। সামন্ত সভাগুলোতে এই প্রচেষ্টা কোনদিনই সম্ভব হত না পরাগল-নুসরতের পূর্বতন প্রচেষ্টা বীজরূপে না রয়ে গেল। বাংলা সাহিত্যকে যে কয়েকজন বিশেষ কবি-সাহিত্যিক পরিপুষ্টতা দান করেছেন, প্রভাবান্বিত করেছেন যাঁদের অবদানকে ইসলামি বাংলা সাহিত্যও বলা হয়। বহু পূর্বের ইতিহাস আলোচনা না করলেও সপ্তদশ শতকে দু'জনকে পাই। এই বিশেষ দু'জন কবির একজন দৌলত কাজী, অন্যজন আলাওল। তাঁর একমাত্র কবিকৃতি 'লোরচন্দ্রাণী'। রোসাঙ্গের রাজা শ্রীসুধর্মার লস্কর-উজির আশরাফ খানের অনুরোধে কবি দৌলত কাজী হিন্দি বা ভোজপুরী মূল অনুসরণ করে কাব্যকরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। শ্রীসুধর্মার রাজত্বকাল ১৬২২-১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দ।

কবি দৌলত কাজী কাব্য অসমাপ্ত রেখেই মারা যান। সুদীর্ঘকাল পরে কবি আলাওল তা সম্পূর্ণ করেন। দৌলত কাজী ছিলেন বিশেষত গীতিকবি এবং সৈয়দ আলাওল ছিলেন প্রধানত কাব্যকথক। রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মার মহাপাত্র সোলেমানের অনুরোধে আলাওল ফার্সী নিবন্ধ 'তোহ্ফার' বঙ্গানুবাদ করেন ১০৭৩ হিজরীতে বা ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে।

এবার আমরা লক্ষ্য করব, যে ইসলামি সাহিত্যধারাটি ষোড়শ শতাব্দীতে দানা বাঁধছে, তা অষ্টাদশ শতকের পরও চলতে থাকল। ভুরশুট-মান্দারানে সুফী খাঁ বা শাহ ইসমাইল গাজীকে কেন্দ্র করে একটি পীরস্থান গড়ে উঠেছিল। ভুরশুট-মান্দারান বর্তমান ভূগোলে হুগলি ও হাওড়া জেলায় ভাগাভাগি হয়ে পড়েছে। ইসলামি বাংলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র রূপে পরবর্তী যুগে আমরা তিনটি স্থান লক্ষ্য করছি। প্রথমটি ভুরশুট-মান্দারান। দ্বিতীয়টি হুগলির পাণ্ডুয়া, তৃতীয়টি ত্রিবেণী। প্রথমটি গড়ে উঠেছিল শাহ ইসমাইল গাজীকে কেন্দ্র করে। তখনকার দিনে ভুরশুট-মান্দারানকে বড় পেঁড়ো এবং পাণ্ডুয়াকে ছোট পেঁড়ো বলা হত। ছোট পেঁড়োর প্রাচীন দরগার উঁচু মিনারটি আজও ট্রেন থেকে দেখা যায়। এই তিনটি স্থান সম্পর্কে কবি বলেন—

বড় পেঁড়ো ছোট পেঁড়ো তিরেবণী আর
পীরের খাতেরে আল্লাহ্ করেছেন তৈয়ার
তিন পীরে তিন স্থান বকশেশ করিল
তিন পীর তিন স্থানে জাহের হইল।
১। কুতুব জেন্দা রহিল বড় পেঁড়ো ধামে
গৌড় বাদশাহী যার জাহের আলমে।
২। জাফর খাঁ গাজী রহিল ত্রিবেণী স্থানে
গঙ্গা যাঁরে দেখা দিল ডাক শুনি কানে।
৩। আল্লার পেয়ারাপীর শাসূফী সোলতান
পাঁড়োয়া মাকান মাঝে করেন মকান।

কবি গরীবুল্লাহ পাণ্ডুয়াতে এসে সব কিছু সন্ধান করেন। পরে ওখানে শান্তিপুর নিবাসী মমিনুদ্দিন ওস্তাগরের কাছে একটি হিন্দি কেতাব পেলেন। সেখান থেকে সব কিছু জেনে কলম ধরলেন। এবং

কাহিনী সমাপ্ত করলেন। কাহিনীটি সংক্ষেপে ওখানে এক হিন্দু রাজা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে শাহ সূফী সুলতানের যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে রাজা হেরে গেলেন।

বুঝহ তামাম লোক করিয়া খেয়ান
কেচ্ছা পীর ছিল সেই শা-সূফী সুলতান।

গরীবুল্লাহ ভূরশুট-মান্দারানের লেখক। ভূরশুট মান্দরান বর্তমান হুগলি-হাওড়া জেলার সঙ্গমস্থল। তখন ওটা একটি পরগণা বলে পরিচিত ছিল। তখনকার যুগে ভূরশুট মান্দারান মুসলমান কবি গোষ্ঠীর তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। ভূরশুট-মান্দারান সে যুগের মুসলমান কবিদের সূতিকাগারে পরিণত হয়েছিল। বহু ক্ষণজন্মা মুসলিম কবি-সাহিত্যিককে সে বক্ষে ধারণ করেছিল। কবি গরীবুল্লার নিবাস ছিল বালিয়া পরগনার হাফেজপুর গ্রামে। তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কবি। তবে তাঁর সঠিক জীবনকাল জানা যায় না। গবেষণার নিরিখে কিছু বোঝা যায়। গরীবুল্লার পরবর্তী যুগে আর একজন বড় কবি সৈয়দ হামজা ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে গরীবুল্লাহ লিখিত আমির হামজা কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়ন করেন। সুতরাং গরীবুল্লার জীবনকাল ১৭৯২-এর আগে। আর একটি কথা। কবি গরীবুল্লাহ তাঁর রচিত ইউসুফ জোলেখার উপসংহারে দেশের শাসকগণ সম্পর্কে যে কথার উল্লেখ করেছেন, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে তখনও দেশে ইংরেজ শাসন ঠিক মত বলবত হয়নি। অর্থাৎ মুসলিম শাসনের অন্তিমকাল।

গরীবুল্লাহ ছোট বড় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। মহাকালের গর্ভে এখন দুটো টিকে আছে। 'আমির-হামজার জঙ্গনামা' ও 'ইউসূফা-জোলেখা'। এই দুটো কাহিনী কাব্যেরই বক্তা দরিয়া-পীরবদর এবং শ্রোতা বড় খাঁ গাজী। ইসলামের বীরের ইতিহাসে মহাবীর হামজার নাম প্রসিদ্ধ। তিন ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধ ওহোদ প্রান্তরে হিজরীর তৃতীয় সনে ৬২৪ খ্রীস্টাব্দে একজন নিগ্রো ক্রীতদাস ওহশী কর্তৃক বর্শা ঘাতে শহিদ হন। তিনি জীবনে ইসলামের বহু যুদ্ধ করার সুযোগ পাননি। যেমনটি পেয়েছিলেন হযরত আলি (কঃ) তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'য়ূসূফ-ব-জুলয়খা' ফারসী কবি নুরুদ্দিন জামীর অনুসরণে লেখা।

নমুনা : বদর বলেন গাজী তোমাকে সমঝাই
ইউসুফ নবীর বাত শুন মেরা ভাই।
গাজী : ইউসুফ নবীর কথা কহ দস্তগীর
শুনিলে আল্লার রাহে হইব ফকির।
তখনবদর : আল্লার দরগায় বদব নোঙাইয়া মাথা
কহিতে লাগিল—ইউসুফ জোলেখার কথা।

কবি গরীবুল্লাহ বড় খাঁ গাজীর বাতেন বা অদৃশ্য সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

গরীব ফকির কহে কেতাবের বাত
বড় খাঁ বাতুনে যারে দিল মোলাকাত।

কবি তাঁর কাব্য লেখা শেষ করে তামাম মানুষের জন্য আল্লার কাছে রহমত ভিক্ষা করলেন। তখন এটা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখক ও কবিগণের প্রিয় প্রথা ছিল।

গরীব ফকীর কহে সব এয়াদগারে
সের সালামত আল্লা রাখ সবাকারে।

সৈয়দ হামজা :

সৈয়দ হামজা গরীবুল্লার অনুসরণ করেছিলেন। হামজার বাড়ি ছিল ভূরশুট পরগনায় উদনা বা অদুনা গ্রাম। ১১৯৯ সালে দামোদরের বন্যায় তাঁর বাড়িঘর ক্ষেতখামার সবই নষ্ট হয়ে গেলে তিনি বায়ড়া পরগনায় রানাঘাট গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। হামজার পিতার নাম হেদাতুল্লাহ, পিতামহ

আব্দুল কাদের, দুই ছেলে কালিমুদ্দিন ও কুতুবুদ্দিন। তাঁর রচিত জৈগুণ বিবির পুঁথি হতে এই পরিচয় পাওয়া যায়। পুঁথির উপসংহারে লিখিত :

রসুলের পাঙতলে সৈয়দ হামজা বলে
ঘর ছিল ভূরশুট উদানা
সন নিরানব্বুই সালে আমার কপাল জ্বলে
বাড়িতে পড়িল তিন হানা।
চাষবাস যত ছিল ঘরবাড়ি সব গেল
ভরাডুবি হৈল মাঝমাঠে
দেলেতে আফসোস বড়া হইয়া যে গাঙ ছাড়া
পরগনা বায়েড়া রানাঘাটে।.....
ভূরশুট পরগনা বিচে উজানা বাগের নিচে
বসবাস কদিমি মোকাম
আব্দুল কাদের দাদা তার বড় দেল সাদা
বাবা মেরা হেদাতুল্লা নাম।
কলমাদ্দি বড় বেটা কুতুবুদ্দি তার ছোটা
এই দুই মাসুম আমার
এহা সবাকার তরে যে কহে মেহের করে
আল্লাতালা ভালা করে তার।
তামাম হইল পুঁথি বাকি যে করিলেম ইতি
আশা পূর্ণ হইল আমার
এই পুঁথি যে পড়িবে আর যাহারা শুনিবে
খএর আল্লা করে তা সবার।।

ইসলামি বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় কবি সৈয়দ হামজা। তাঁর প্রথম রচনা পাই মধুমালতী। বহু মুসলমান কবি এ নিয়ে কাব্য রচনা করে গেছেন। হামজার দ্বিতীয় রচনা আমীর হামজার দ্বিতীয় খণ্ড। বহু মানুষ কবিকে অনুরোধ করেছিলেন আমীর হামজার কেচ্ছা শেষ করতে কবি তাদের অনুরোধে কলম ধরেন।

না পারিনু এড়াইতে লোকের নেহারা
এখাতেরে কবিতার খাহেশ হৈল মেরা।
পীর শাহ গরীবুল্লাহ কবিতার গুরু
আলমে উজালা যার কবিতার শুরু।

সৈয়দ হামজা তাঁর আমির হামজা পুঁথিটি পয়ারে লিখলেন। শেষে কৈফিয়তে ত্রিপদী জুড়ে দিলেন। উপসংহারে কবি যেমন নানা ভুল-ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা চেয়েছেন, ঠিক সমভাবে গ্রন্থমাঝে পাঠকের হস্তক্ষেপ নিষেধ করেছেন।

করিনু শায়েরি পুথি আখেরি কেচ্ছার
লেখা গেল শাহাদৎ আমির হামজার।
বার শও এক সালে আখেরী হিসাবে
বার দিন ছয় মাস হিসাবেতে হবে
চাঁদের তারিখ আছে পহেলা রমজান।

আচার্য সুকুমার সেন বলেন—"গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজার আমির হামজার জঙ্গনামা বিরাট বই, আকারে কাশীরাম দাসের ভারত-সংহিতার কাছে খাটো হবে না।"

সৈয়দ হামজার তৃতীয় রচনা 'জৈগুণের পুঁথি' হচ্ছে হানিফার জঙ্গনামা। এটার রচনাকাল ২৩ আশ্বিন ১২০৪ সাল (১৭৯৭ খ্রী.)।

ত্রিপদী করিয়া ছন্দ করিয়া তারিখ-বন্ধ
লেখা গেল তেইশে আশ্বিনে
বার শও চারি সালে জোম্মার নামাজকালে
বাকি সে মাসের সাত দিনে।

সৈয়দ হামজার চতুর্থ (বা শেষ?) রচনা হাতেম তাইর কেচ্ছা'। রচনার সমাপ্তিকাল ১২১০ সাল, (১৮০৪ খ্রীঃ)

এক শও একুশ লিখি তার পিঠে শূন্য রাখি
সনের ঠিকানা পাবে তায়
বাঙ্গালা আখের সালে গরমির বাহার কালে
পুঁথির তারিখ হেথা জায়।

শাহ এজ্জতুল্লা কবিকে অনুরোধ করেছিলেন হাতেম তাইয়ের কেচ্ছা লিখতে। কবি ফার্সী গ্রন্থ অবলম্বনে কাজ আরম্ভ করলেন। কিন্তু নানা কারণে কবি-মন স্তিমিত হয়ে এল। কবি-মনে সেই জোয়ার আর নেই। কাজ বন্ধ হয়ে গেল। তখন একদিন ভূরশুট পরগনার বসন্তপুর নিবাসী চাঁদ মোল্লার ছেলে কালু-মোল্লা (শেখকলিমুল্লাহ) কবিকে বললেন কাব্য অসম্পূর্ণ রাখা উচিত নয়। তখন কবি অ বার কলমের ঘোড়া খিঁচলেন। কাজ সম্পূর্ণ হল।

মিএগ শাহা এজ্জতুল্লা কহিলেন আমায়
হাতেম তাইর কেচ্ছা লিখ বাঙ্গালায়।....
নমুদ করিনু জবে পুঁথি শিখিবার
না মেলে ফোরছত্ জিউ না হয় কারার।....
এখাতেরে সেইখানে দিয়েছিনু খেমা
কলিমোল্লাহ কহিলেন করিতে তরজমা।.....
কালুর কথায় ফের খেচিনু কলম
আল্লা যদি করে পুঁথি করিব খতম।.....
খায়েস হইবে জবে কেচ্ছা শুনিবার
পড়িয়া শুনাবে কেহ কবিতা আমার।
পুঁথি ছাড়া সেকাএত করে যে আমার
হামজা বলে আকবতে হবে গোনাগার।

কাব্য রচনার প্রথম দিকে কবি কিছু নীতি-উপদেশ দিয়েছেন। ওই নীতি উপদেশ থেকে সে যুগের মুসলিম পরিবারের একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। তখনকার জীবনাদর্শ কত সুন্দর ছিল, তাও বোঝা যায়।

আল্লার হুকুম 'পরে রাখিবে ইমান
বাহাল রাখিবে যত নবীর ফরমান।
দীনদারি মফাজৎ রাখিবে বাহাল
মা বাপের খেদমত করিবে হামেহাল।

ওস্তাদ পীরের হক করিবে আদায়
দেখাইল রাহা যেই চিনিতে খোদায়।
পড়োস লোকের হক্কে না করিবে বদি
নেক নামি আল্লার হুজুরে লিবে যদি।
হামছায়ার হক ভাই আদায় করিবে
যাহাতে খোদায় তালা খোসাল হইবে।....
এতিম এছির যদি নজদিগে দেখিবে
আপনা লাড়কার মুখে বোছা নাহি দিবে।.....
না লিবে লোকের মাল হরণ করিয়া
কাঙ্গালের চিজ না খাইবে সাতাইয়া।.....
জেনাকারি সুদখুরি সে পিয়ে সরাব
হরঘড়ি দুষ্ট কহে খোদার খারাব।.....
লোকের খেদমৎ গারি বড় এবাদত
ভালাই করিলে ভাল হয় আকবত।.....
হামজা বলে বেফরমানি কৈনু দুনিয়াতে
না জানি কি হাল আল্লাহ্ করেন আকবতে।

সৈয়দ হামজার মানসশিষ্য :

সাহিত্যের কলম কত সুদূর প্রসারী হয়, সৈয়দ হামজার লেখনী তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সৈয়দ হামজার গুরু ছিলেন কবি গরীবুল্লাহ। পরবর্তীকালে সৈয়দ হামজার হাতেম তাই পড়ে ওড়িশার বালেশ্বর নিবাসী আব্দুল মজিদ খাঁ ভূঞা তাঁর রঙ্গবাহার কাব্যে সৈয়দ হামজাকে কাব্যগুরু বলে সম্মানিত করেছেন। তিনি কবি হামজার হাতেম তাই পড়তে পড়তে কাব্যপ্রেরণা পেয়েছিলেন। সেদিনটি ছিল ৩ বৈশাখ, শনিবার, ১২৬৮ সাল।

কবিতা করিনু শুরু...... সেইসে আমার গুরু
মোলাকাত নাহি মেরা সাথে
তার ধ্যান মনে রাখি... কেতাবে ছেফত দেখি
হাতেম তাইর কেচ্ছা হৈতে।
আল্লাতালা তার তরে বেহেস্ত নসিব করে
ওফাৎ হৈয়াছে বহুকাল
এয়সা কেহ্ বাঙ্গালার শায়ের না করে আর
যব তক দুনিয়া বাহাল।.....
রোজ আজ শনিবার তারিখ শুমার তার
বৈশাখ মাসের তিনদিন
করিনু আগাজ কেচ্ছা সনে তারিখ দিন আচ্ছা
বার শও আটষাট্ট একিন।
একদিন খুসি হৈয়া হাতেমের কেচ্ছা লিয়া
পড়িতে আছিনু বাঙ্গালাতে
শুনিবারে লোক কত বসেছিল শত শত
মেরা জমিদারি কাছারিতে।

লাড়কাই ওস্মর মেরা না জানি কবিতা ধারা
গণনাতে বাইশ বৎসর
ছৈএদ হামজা গুরু তার নামে করি শুরু
সেই হাতি আমি যে মচ্ছর।

আব্দুল মজিদ ছিলেন বাদশাহী আমলের জমিদার বংশের ছেলে। নিবাস ওড়িশার বালেশ্বর জেলার পদ্দা পরগনায়। সাত পুরুষ আগে কবিরা ছিলেন হিন্দু।

কবির রঙ্গবাহার রচনা শেষ হল ১২৭০ সালের আষাঢ় মাসে। সময় লাগান দুবছর দশ দিন। ফারসী সাহিত্যবিদ হাফেজ আলির ও বাংলা বিশারদ হিসামুদ্দিনের অনুমোদন ও প্রশংসা পেয়ে লেখক কলকাতায় এলেন বই ছাপতে। ১২৭১ সালে রঙ্গবাহার ছাপা হল। রঙ্গবাহারের কাহিনী ছিল সেদিনের প্রচলিত রূপকথার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফার্সী কাব্যের অনুসরণে লেখক আব্দুল মজিদ আরও কতকগুলো গ্রন্থ প্রণনয়ন করেছিলেন। যেমন দেলরোবা চার চামান ইত্যাদি। লেখক আব্দুল মজিদ নিজেই অমর কবি সৈয়দ হামজার অবদান। এখানেই লেখক হামজার কৃতিত্ব, অমরত্বও মাহাত্ম্য।

আদি ও আসল
ছহিহ বড় সাহানামা
মুন্সী মোহঃ খাতের
সন ১৩২ সাল, পৃঃ ৩৪৪

মহাকবি ফেরদৌসি :

বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে আজ পর্যন্ত যে কয়েকটি পুস্তক অক্ষয় স্থান অধিকার করে আছে, মহাকবি ফেরদৌসির শাহানামা তাদের অন্যতম। যতদিন মানুষ আছে, যতদিন ভাষা আছে, ততদিন শাহনামার অমরত্ব কেড়ে নেয়, মহাকাল আজও সে শক্তি অর্জন করেনি। এই শাহনামাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে বহু পুঁথি রচিত হয়েছে।

মহাকবি ফেরদৌসির প্রথম বা আসল নাম আবুল কাসেম। কবি হিসেবে রাজধানী গজনীতে গিয়ে সম্রাট সুলতান মাহমুদের দর্শন-প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু বিফল মনোরথ হয়ে পাগলের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। একদিন এক দরবেশের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি কবিকে সুলতানের দরবারে যাওয়ার সুযোগ করে দেন। অতঃপর দরবারে কবির পরীক্ষা হল।

কবি প্রথম গজনীর পান্থশালায় দিন কাটাতেন। বহু দিন পর দরবেশের সাহায্যে রাজমন্ত্রী মোহেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। মোহ্ক কবির অপরিমিত শক্তি লক্ষ্য করলেন এবং যথাসময়ে তা রাজগোচরে আনলেন। সম্রাট কবিকে রাজদরবারে আহ্বান জানালেন। আবুল কাসেম রাজদরবারে হাজির হলেন। তখন রাজদরবারে অন্য তিনজন রাজকবিও হাজির। এবার আসল পরীক্ষা শুরুর পালা। তিনজন কবি পারস্য ভাষাতে এমন তিনটি চরণ বললেন, যার চতুর্থ চরণ ওই ভাষাতে নেই বা হয় না। সম্রাট আপন আসনে, জ্ঞানী-গুণী ভর্তি, রাজদরবার মহাপরীক্ষায় নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ। সেই সময় সম্রাটের নির্দেশ পাওয়া মাত্র তিনজন সভাকবি পরপর সম্রাটকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন:

১। রাজকবি আনসারী : চন্দ্রও সুন্দর নয় তব মুখ-সম,
২। রাজকবি আসজাদী : বাগানে গোলাপ নাই হেন মনোরম,
৩। রাজকবি ফারুকী : তোমার চোখের জ্যোতি ধর্ম ভেদ করে,

৪। পথিককবি কাসেম : বর্শা যেথা গেঁও করে পুশন সমরে।

এবার মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় সম্রাট বলে উঠলেন—

৫। সম্রাট : হে ফেরদৌসি, তুমি সত্যিই আজ আমার সভাকে স্বর্গে পরিণত করেছ।

এইদিন থেকেই আব্দুল কাসেম হলেন মহাকবি ফেরদৌসি।

সুলতান মাহমুদের বহু দিনের ইচ্ছা ছিল, প্রাচীন পারস্যের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করা। আজ সেই ইচ্ছা পূরণের সুযোগ পেলেন। এর সময়সীমা ছিল পারস্যের প্রাচীনকাল হতে মুসলমান বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত। কলম ধরলেন ক্ষণজন্মা কবি ফেরদৌসি। একটানা তিরিশবছর কলম চলল। সম্রাট কবিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, প্রতিটি শ্লোক বা চরণের জন্য তাঁকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে। মহাকবির কলমে কাব্যের মহানদী গভীর খাদে খরস্রোত বেগে তিরিশবছর দুরন্ত ঘোড়ার ন্যায় ছুটল, উড়ন্ত পাখির ন্যায় উড়ল। যে নদী সর্বশেষে দিয়ে গেল পারস্যের জাতীয় কাব্য। মহাভারত নয়, মহাভুবন—'শাহনামা'। পৃথিবীর ইতিহাসে এই গ্রন্থটির দ্বিতীয়টি নেই।

আল্লার দেওয়া মহা প্রতিভা বিরল প্রতিভা বিশ্ব-প্রতিভা মহাকবি মহাবেগে এগিয়ে চললেন। কত আশা, কত উদ্দীপনা, কত প্রেরণা মহাকবিকে দান করাল কালজয়ী শক্তি। কিন্তু কোন মানুষই জানে না ভবিষ্যতের কোলে কোন জিনিস নিহিত আছে।

জানেনাক কেউ জীবনের পথে
জীবনের পটভূমি
গড়িতেছ মোর চলার পথে
পরের অধ্যায় তুমি।

কবি-জীবনের গগনাকাশে কাল মেঘ কীভাবে জন্মেছিল। প্রধানত দুটি দিক হতে কাল মেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। শাহনা মাতে আভিজাত্যের ছড়াছড়ি ছিল। কিন্তু সুলতান মাহমুদ ছিলেন দাস-বংশজাত সন্তান। মহাকবির কোন এক বন্ধু কবিকে এই বলে একবার সতর্ক করেছিলেন যে, তিনি যেন মনে রাখেন স্বয়ং সুলতান দাসবংশোদ্ভূত সন্তান। কিন্তু কবি তাঁর বিশ্ব-প্রতিভার তুলিতে সত্যের কোন অবমাননা পছন্দ করেননি। মহাকবি কোন ব্যক্তি-জীবনের সাময়িক মনোরঞ্জন করা পছন্দ করেননি। দ্বিতীয় কারণটি ছিল—সুলতানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা ময়মন্দী। তিনি তাঁর স্তাবকের দলকে খুবই পছন্দ করতেন। কিন্তু মহাকবি কোনদিনই কোন স্তাবকতা পছন্দ করতেন না। কবির বাসনা ছিল :

বুকেতে সদাই আমি তোমাকে বরি
চলিতে শক্তি চাই শির উচ্চ করি।

এই জগতে যাঁরা মহাশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা মহামানব, মহাপুরুষ, গরীয়ান, মহীয়ান। কোন একটি মানুষকে খুশি করা তাঁদের ধর্ম নয়। বিশ্ব-মানবই তাঁদের কাছে একটি মানব। মহাকবি ফেরদৌসি ওই একটি মানব, বিশ্বমানবের জন্য এসেছিলেন। যাঁর আসন মহাকালের কোলে চিরস্থায়ী। যাঁর গুণ-কীর্তনে ও প্রশংসায় একদিন বিশ্ব-জগৎ কলরব করে উঠবে, সেই মানুষ আপন দৈন্য হেতু দীনের বেশে কারও স্তাবকতা করতে পারেন না। তাঁরা চিরবীর, চির উন্নত শির। তাঁরা এক বাক্যে বলে বসেন—

মোর দেহ প্রাণ আল্লার প্রেম
তৌহিদে তৈরি
মম আসনের নীচাসনে থাক
শিখর হিমাদ্রী।

গেঁও = একজন বীর, পুশন = একটি সমরক্ষেত্র।

অধিকন্তু প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সুন্নী এবং মহাকবি ছিলেন শিয়া। এতে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ে গেল। প্রধানমন্ত্রীর হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা, পরশীকাতরতা, রাগ-রোষ, ফোঁস ইত্যাদি বাড়তেই থাকল। এমনকি একদিন তাঁকে হোঁস হারা করে দিল। ভাবীকালের ইতিহাসে মহাকবি হবেন পারস্যের জাতীয় কবি। তিনি কোন ব্যক্তি-মানুষের কবি নন। কোন শাহানশার কবি নন। তাই মহাকবি তাঁর অমর কলমের গতিধারাকে এতটুকুও বিপথগামী করেননি। এখানেই কবিমনের হিমালয় পরিচয় ফুটে উঠল। এখানেই কবির আগামী দিনে ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হল। কবি-জীবন একটিবারও চিন্তা করতে পারেননি যে, শাহানশাহ সুলতান মাহমুদ তাঁর প্রতি এরূপ কদর্য ব্যবহার করতে পারবেন। যাই হোক বিশ্ব-ঘটনারাশির অন্যতম ঘটনার দিন ও ক্ষণটি ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল। জগদ্বিখ্যাত শাহনামাতে মহাকবি তাঁর অমর লেখনীর যবনিকা টানলেন। কে জানত, সুদীর্ঘ তিরিশ বছর একটানা কঠোর পরিশ্রমের পর এই বার্ধক্য কালে কবি-চিত্তে নেমে আসবে এই অসহ বেদনা। এক-একটি শ্লোকের পরিবর্তে শাহানশাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এক-একটি স্বর্ণমুদ্রা। আজ কবির প্রাপ্য ছিল ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা। যদিও শাহানশার কাছে এটা কিছুই ছিল না।

মহাকবি ঘুণাক্ষরেও জানতেন না, এরূপ একটি অঘটন ঘটতে পারে। শাহানশাহ কি অভাবের তাড়নায় তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন। তা তো নয়। তবে কেন এরূপ হলো। সুলতান মাহমুদের মনের কোণে একটু কাল মেঘ দানা বেঁধেছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই সামান্য কাল মেঘটুকু হতে কবি জীবনে জুলুমের পানি শ্রাবণের বারি ধারার মতো নামত না। যদি না প্রধানমন্ত্রী শাহানশার মনকে একেবারেই বিষিয়ে না দিতেন। ফলশ্রুতি যা হওয়ার তাই হলো। সম্রাট ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে ষাট হাজার রৌপ্য মুদ্রা পাঠিয়ে দিলেন।

মহাকবি তাঁর মহান জীবনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আজ যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ক্ষণিকের মধ্যে মহাকবির সিংহচিত্ত গর্জে উঠল। তিনি যেন মর্মে মর্মে অনুভব করলেন, তিনি ভিখারি নন। তিনি জগদ্বিখ্যাত শাহনামার অমর রচয়িতা। ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কর লেন শাহানশার ষাট হাজার রৌপ্য মুদ্রা। বিলিয়ে দিলেন দীন-দরিদ্র মানুষের মধ্যে। শাহনামাতে ধরা পড়েছে মহাকবির মহান ছবি, শাশ্বত প্রতিভা এবং এই ঘটনাতে ধরা পড়ল সিংহপুরুষ, পুরুষসিংহ ফেরদৌসি। তিনি একদিকে ছিলেন মহাকবি, অন্যদিকে ছিলেন মহাবীর, মহামানব।

অতঃপর জল বহুদূর গড়িয়ে গেল। রাত্রি সমাগত। তন্দ্রাহীন নিদ্রাহীন মহাকবি। প্রস্থানের আর দেরি নেই। মহাকবি শাহানশাহকে কেবল জানিয়ে গেলেন, তিনি ছিলেন পুরুষ সিংহও। ভোরের আগেই সম্রাটের প্রার্থনাগারে একটি ছোট্ট কবিতা ঝুলিয়ে দিয়ে গেলেন।

রাজবংশে হত যদি জনম তোমার
বরষিতে স্বর্ণমুদ্রা মুকুট সোনার।
উচ্চমান নাহি যার বংশের ভিতর
কেমনে করিবে সে গুণীর আদর?
তিক্ত বীজ হতে যেই তরুর জনন
নন্দন কাননে তারে করহ রোপণ,
সিঞ্চন করহ মূলে মন্দাকিনী ধারা
মধু আর দুগ্ধে ভর খাদ্যের পসরা
তথাপি ফলিবে তার আপন বৈভব,
সতত সে তিক্ত ফল করিবে প্রসব।*

* পারস্য-প্রতিভা— মোহাম্মদ বরাতুল্লাহ

প্রভাতে শাহানশাহ এই কবিতাটি দেখে সিংহগর্জনে গর্জে উঠলেন। হুকুম দিলেন গ্রেপ্তার করার। হুকুম দিলেন প্রাণদণ্ডের। দেশজুড়ে ঢেঁড়া পড়ে গেল। বৃদ্ধ কবি প্রাণ-ভয়ে আজ এখানে, কাল ওখানে। এ যেন নিয়তির কি নিষ্ঠুর-পরিহাস। আবার জল বহুদূর গড়িয়ে গেল। শাহানশাহ বিশ্বের বিরল প্রতিভার অভাব যেন দিবারাত্রি অনুভব করতে থাকলেন। যেন কোন অন্তর জ্বালায় অবিরাম জ্বলতে থাকলেন। এ অন্তর-আগুন আজ কে নেভাবে। এ পানি যার হাতে সে পথিক আজ বহুদূরে। কোথায় সেই যৌবনের চির জাগ্রত সহচর। কোথায় সেই প্রৌঢ়ের হৃদয়বাণ বন্ধু, কোথায় সেই বার্ধক্যের বিজ্ঞ পরামর্শদাতা। যাঁর উপস্থিতি ও অমর লেখনী রাজধানী গজনীকে করল অমর। তাঁর রাজত্বকালকে করল কালের সাক্ষী। তাই শাহানশাহ আজ হৃদয় বেদনায় চরম ব্যথাতুর, ফেরদৌসিহীন শূন্য রাজসভায় আজ বন্ধুহীন। আজ তিনি যেন মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। তাঁর ধন-মান-যশ-গর্ব-খ্যাতি রাজত্ব বিশাল ধনভাণ্ডার, বিশাল সৈন্যবাহিনী একদিন সবই কাল-স্রোতে ভেঁসে যাবে। কেবল ভাসবে না—তাঁর ওয়াদা ভাঙার কথাটি। আবার জল বহু দূর গড়িয়ে গেল। তিরস্কৃত হলেন ওই প্রধানমন্ত্রী। যিনি মহাকবির বিরুদ্ধে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন।

পাপ ও পুণ্যের লীলা দেখ সব ঘেরি
সবেরে সময় দিয়ে কর কিছু দেরি।

সবশেষে অনুতপ্ত শাহানশাহ মহাকালের কাঠগড়ায় রেহাই পেলেন! বিদীর্ণ অন্তরে অতিব শ্রদ্ধার সঙ্গে কবির পাওনা সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা কবির জন্মভূমি তুস্ নগরে কবির সমীপে পাঠিয়ে দিলেন। বিশাল বাহিনী মহাসমারোহে তুস্ নগরে পৌঁছল। ক্লান্ত বাহিনী সামান্য বিশ্রামের জন্য নগরের বাহিরের এক বাগানবাড়িতে অপেক্ষমাণ। নগর হতে কিছু মানুষ একটি লাশ নিয়ে গোরস্তানে এলে সেনাপতি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—মহাকবির বাসটি কোথায়? তাঁরা সবিনয়ে উত্তর দিলেন—এই তো মহাকবি ফেরদৌসি, অন্তিম শয়নে চিরনিদ্রায় শায়িত।

আবার জল বহুদূর গড়িয়ে গেল। অনুতপ্ত চোখের জলে ওই সমুদয় স্বর্ণমুদ্রা-সহ সেনাবাহিনী কবির একমাত্র কন্যার সঙ্গে দেখা করল। তিনি ছিলেন কবির মূর্তিমতী কন্যা। পুত্রও এই কন্যার তুল্য নয়।' ৩ : ৩৬। কন্যা ওই সেনাবাহিনীকে গগনভেদী উত্তর শুনিয়ে দিলেন—"আমার পিতা তাঁর সারা জীবনের কঠোর পরিশ্রমের কত সাধ ও স্বপ্নের, কত আশা ও আকাঙক্ষার, কত কল্যাণামুখী পরিকল্পনার যে সম্পদ, তিনি নিজ হাতে স্পর্শ করারও সুযোগ পেলেন না, যে সম্পদ তিনি একবার আপন নয়নে প্রাণ ভোরে দেখতেও পেলেন না। যে সম্পদকে তিনি তাঁর জন্মভূমি সিরাজের মানুষের সম্পদ বলে গর্ববোধটুকুও করতে পেলেন না, মহাবিচারকের মহাবিচারের আশায় চির নিদ্রায় ঢলে পড়লেন। আমি ওই সম্পদ, ওই স্বর্ণমোহর হাতে নেওয়া দূরের কথা, আমার পদস্পর্শেও আমি ঘৃণা বোধ করি।"

আবার জল বহুদূর গড়িয়ে গেল। সেনাবাহিনী মহাকবির অন্তিম ইচ্ছা জেনে নিয়ে সমস্ত স্বর্ণ-মুদ্রা দ্বারা প্রথম তুস নগরের বাঁধ বাঁধলেন। পরে তাঁর বাকি ইচ্ছাগুলো পূরণ করলেন।

মহাকবি পুরস্কৃত হলেন, তাঁর বাসনাপূর্ণ হলো, প্রধানমন্ত্রী তিরস্কৃত হলেন। সুলতান কালের কলঙ্ক হতে মুক্তি পেলেন।

সারা বিশ্বের প্রবাদতুল্য মহাকাব্য 'শাহনামার' অমর কবি, সারা দুনিয়ার সর্বকালের এক মহান মহাজীবনকে আপন অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুধাবন করে সবশেষে সব বুঝে এইটুকুই বুঝলাম, ক্ষুদ্র তৃণলতা ও শুকনো জরাজীর্ণ বৃক্ষপত্র খরস্রোত বেগবান নদীর তরঙ্গায়িত স্রোতে খড়-কুটোর মত যেমন দুর্বার বেগে ভেসে যায়। ঠিক অনুরূপভাবেই প্রতিটি মানুষই এই সংসার-নদীতে ঘটনার নানা জানা অজানা বিড়ম্বিত স্রোতে নিয়তির অনিবার্য নির্দেশকে নত মস্তকে জীবনের পথে ও প্রতিটি

পদক্ষেপেই অপরিহার্য রূপে মেনে নিয়ে ওই ভাসমান জরাজীর্ণ তৃণলতা ও শুকনো বৃক্ষপত্র অপেক্ষাও অসহায়ভাবে ধাবিত হচ্ছে।

জানে নাক মানুষ জীবনের পথে
জীবনের পটভূমি
গড়িতেছ মোর চলার পথে
পরের অধ্যায় তুমি।
কোরআন—৩১ : ৩৩

রক্ষা কর

জগৎ আশ্রয়গুলো কত হীনতম
তোমার আশ্রয় পেলে তুল্য নাই সম।
রুখিতে মাথার 'পরে সমূহ বিপদ
তোমার আশ্রয় আল্লাহ্ অতি নিরাপদ
বিশাল দরিয়া বুকে অতি ক্ষীণতম
ডুবু-ডুবু তরী মোর ধরো প্রিয়তম।
খরস্রোত নদীবুকে তৃণলতা সম
সংসার-নদীতে ছুটে জীবন-মম।
ছুটিছে জীবন মম খড়কুটো সম
রক্ষা কর রহমান ওগো প্রিয়তম।
তোমারই আশ্রয় এক উত্তমতম
অকূল পাথারে আল্লাহ্ ভরসা মম।
—কাব্যকানন

ছহি বড় জঙ্গে ছোহরাব্
বাপ বেটার লড়াই
মুন্সী হবিব হোসেন
সন ১৩৬৯ সাল, পৃ ৪৮

ইসলামি বাংলা সাহিত্যে জঙ্গনামা অধ্যায়ে যে-সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া যায়, ছোহ্‌রাব রুস্তমের লড়াই তাদের অন্যতম। মহাকবি ফেরদৌসি রচিত পারস্যের জাতীয় কাব্য শাহনামার এটি একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। পিতা-পুত্রের লড়াই। পিতা হেরেও পুত্রের প্রাণনাশ করলেন। এখানেই এই গ্রন্থের মহিমা কাজ করেছে। এখানে একটি কথা বলা উচিত, এটা ইসলামি বাংলা সাহিত্যে স্থান পেল কেন? এই ঘটনাটি ইসলামের বহু পূর্বের ঘটনা। তবুও একে ইসলামি সাহিত্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। ইসলামি বাংলা সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও বহু আছে।

কাহিনী থেকে জানা যায়, কথিত আছে ছোহরাব মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় পিতা রুস্তম তাঁর স্ত্রী তহমিনাকে উপদেশ দিয়েছিলেন—যদি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহলে তার হাতে যেন তাঁর দেওয়া কবজটি বেঁধে দেওয়া হয়।

যথাসময়ে পুত্রসন্তান জন্মাল, নাম রাখা হল ছোহরাব। কিন্তু মাতা তহমিনা বিবি তাঁর স্বামীকে জানালেন—কন্যা সন্তানজন্মের কথা। পিতা জানলেন তাঁর কন্যা হয়েছে। দিন যায়, ক্ষণ যায়। পুত্র

বড় হল। এখন সে মহাবীর। সে চায় কোন বিশাল যুদ্ধে যোগদান করতে। বাড়ি থেকে বের হল। বিবাট যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী হলে রস্তমের বিরোধী পক্ষ তাঁকে টেনে নিলেন। পুত্র জানতেন তার পিতা রস্তমবীর। কিন্তু পিতা আদৌ জানতেন না যে তাঁর পুত্র আছে। মাতা তহমিনা বিবি, সত্য গোপন করেছিলেন যুদ্ধ এড়ানোর জন্য। কিন্তু বিধি লিখিত বন্ধন এড়ানো গেল না।

যথাদিনে যথাসময়ে পিতা-পুত্রে যুদ্ধ বেধে গেল। পুত্র ছোহরাব মহাবীর রস্তমকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করে ফেলেছেন। রস্তমের প্রাণ বধ করতে আর দেরি নেই। হেনকালে মানুষ কলরব করে উঠল— হায় রস্তম, হায় রস্তম। এই কলরব শোনার সঙ্গে সঙ্গে পুত্র ছোহরাবের হাত যেন একেবারেই অবশ হয়ে গেল। এই সুযোগে রস্তম তাঁর তরবারিখানি ছোরহারের বুকে বসিয়ে দিলেন। পিতা জানতেও পারলেন না তরবারি কার বুকে বসল। পরে সমস্ত ঘটনা জানাজানি হল। মহাকবি ফেরদৌসি তাঁর অমর কাব্য শাহনামাতে মাতা তহমিনার মুখে যে সকরুণ শোকগাথা ফুটিয়ে তুলেছেন তার কোন শেষ নেই।

এখানে একটি প্রশ্ন প্রাণে সাড়া তোলে। পুত্র ছোহরাব জন্মগ্রহণ করল। অতপর সে মহাবীরের শক্তি ধারণ করল। এটা একদিনে বা একবছরে হয়নি। কম করে ১৫ বছর প্রয়োজন হয়েছে। আমাদের জিজ্ঞাসা, এই ১৫ বছরে বীর রস্তম কি একবার স্ত্রী তহমিনার কাছে আসেননি। কেন তিনি জানতে পারলেন না, তাঁর পুত্রের কথা তাই মনে হচ্ছে কাহিনী সত্য, কিন্তু কাহিনীর বর্ণনাধারাতে অনেক বেনো জল ঢুকে গেছে।

আবার এমনও হতে পারে, সে যুগে বীরগণ দেশের নানা প্রান্তে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতেন। অনেক সময় অনেক বিজিত দেশের সুন্দরী রমণীগণকে এক রাতের জন্য বিয়ে করে তাঁর গর্ভে বাচ্চা দিয়ে জীবনে আর একদিনও দেখা দিতেন না। আবার অনেক সময় দাসী রূপে ব্যবহার করতেন। এইভাবে সে যুগে নানাভাবে রমণী-গর্ভে বাচ্চা জন্ম নিত। এমনকি ইসলামের যুগেও এরূপ ঘটনা দেখতে পাই। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের খেলাফথকাল। রিদ্দার যুদ্ধে ইয়ারুবু গোত্রের দলপতি মালিক বিন নুয়াইরা পরাজিত ও নিহত হলে তাঁর বিধবা পত্নী পরমা সুন্দরী লায়লাকে সেনাপতি খালেদবিন ওয়ালীদ পত্নীত্বে বরণ করেন। আমাদের মনে হয়, এইরূপ কিছু একটা ঘটেছিল। তবে মূল কাহিনীটি সত্য।

দশম অধ্যায়

ইসলামের সূফী ইতিহাস

ইসলামি বাংলা সাহিত্য সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একটি বিশাল অধ্যায় এবং বাংলার সূফীজগৎ ইসলামি বাংলা সাহিত্যের একটি বিরাট অধ্যায় জুড়ে আছে। এই সূফীজগৎকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় প্রচুর বই লেখা হয়েছে। এমনকি বহু আরবী পারসি বই বাংলা ভাষাতে অনুবাদও হয়েছে। সূফীজগৎ যেমন ইসলামের প্রাণস্বরূপ, সূফী-সাহিত্যও তেমনি ইসলামি বাংলা সাহিত্যের মধ্যমণি।

"সতর্ক হও। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বন্ধু (সুফি-অলি-আউলিয়া) তদের জন্য কোন ভয় নেই। তারা দুঃখিত হবে না।"

—কোরয়ান : সূরা ইউনুস ১০ : ৬২।

তুমি ও আমি

অন্তরতর ওগো অন্তরময়
তুমি-আমি দুই জন দুটি কেন রয়।
জলের তরঙ্গ কেন জলে খাড়া রয়
বুদ-বুদ জলে যেন ভেসে নাহি বয়।
রহমান্‌-রহীম তুমি ওগো দয়াময়
তুমি-আমি দুই যেন দুটি নাহি রয়।

অসীম-অনন্ত তুমি ওগো দয়াময়
তোমাতে মিলিলে মোরা সবাই অক্ষয়।
চলিতে চলিতে পথে জাগে যদি ভয়
জীবন সুদূরে তুমি করিও নির্ভয়।
অভয় আশ্রয় দিও ওগো দয়াময়
পথিক পথেতে যেন ব্যর্থ নাহি হয়:

মুক্ত রেখেছি মোর রিক্তহৃদয়
তুমি-আমি দুই যেন দুটি নাহি রয়।
হৃদয়খনিতে মোর ওগো দয়াময়
তুমি আমি দুই যেন দুটি নাহি রয়।
নির্ভয়ে বলিতে দাও জাগিলে সংশয়
তুমি-আমি দুই নই, ওগো বিশ্বময়।

যা কিছু জগতে আছে সে ধ্বংসময়
তুমি শুধু বাকি রবে সর্ব সারময়।
যত কিছু আছে মোর সব হোক লয়।
তোমার মিলনে মোর হোক মহাজয়।
গফুর-গফফার তুমি ওগো দয়াময়
তুমি-আমি দুই যেন দুটি নাহি রয়।

—কাব্যকানন

ইসলামের সূফী ও সূফী ইতিহাসের অন্তরালের ছবি :

সূফীবাদ বা তাসাউফ কি?

আভিধানিক অর্থে 'সূফী' শব্দটি আসলে 'সূফ' বা পশম এবং 'সাফী' বা পবিত্র হতে উৎপন্ন।

পরিভাষাগত অর্থে :

১। সূফীবাদ বা তাসাউফ মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে তাৎক্ষণিক মিলন।

২। সূফীবাদ একমাত্র পথ বা উপায়, যার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত আদর্শ শেষ লক্ষ্য ও আল্লার জ্ঞানে পৌছতে পারে।

৩। আল্লাহ সম্পর্কে মুসলিম ধ্যান-ধারণা বড়ই দুরূহ দূরত্ব। সূফীবাদ মানুষ ও আল্লার মাঝে ঐ সুবিশাল দূরত্বের মাঝে একটি সেতু।

৪। সূফীবাদ মানুষ ও আল্লার মাঝে কোন ব্যবধান বা পৃথকীকরণ স্বীকার করে না। (তাই সে সেতু স্বরূপ)

৫। সূফীবাদকে মুসলিম সমাজের রহস্য ভেদের নিগূঢ় শাস্ত্রও বলা হয়।

৬। ইসলামের সূফীবাদ আত্মসংযমতা।

৭। সূফীবাদ কোন বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম নয়। এটি নৈতিক চেতনা।

৮। সূফীবাদ মানব অন্তরকে সমস্ত আবিলতা হতে রক্ষা করে। তাই সূফী-অন্তর হয় আবিলতা ও মলিনতাশূন্য।

৯। সূফীবাদ মানব অন্তরের পবিত্র ধন।

১০। সূফীবাদের শেষ লক্ষ্য আল্লাহতে মিলন ও বিলীন।

সূফীবাদ মানব-অন্তরকে করে একেবারেই নির্মল। এবং নির্মল-অন্তরযোগে মানুষ তার দেহ ছেড়ে আত্মাকে নিয়ে পরমাত্মাতে বা আল্লাহতে মিলিত হয়। অন্তরজগতের তরী প্রস্তুত না হলে আত্ম-নদীতে পাড়ি দেওয়া যায় না। সুতরাং ওপারে নির্বিঘ্নে পাড়ি দেওয়ার প্রথম ও প্রধান সোপান সূফীবাদ।

সূফীসমাজ :

ইসলামে সূফীসমাজ বলে কোন সমাজ নেই। তবে দল বা গোষ্ঠী আছে। এই সূফী-গোষ্ঠী বা দল গড়ে উঠেছে এক একটি মানুষকে কেন্দ্র করেই। যেমন হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কাদেরী গোত্র। হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তী (রঃ)-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে চিস্তী গোত্র। এইরূপ আরো বহু গোত্র-গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় আছে। ওইগুলোকে একত্রে কোন সমাজ বলা যাবে না। একটি মহান সূফীকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে তাঁর অনুচর বা শিষ্যদের দ্বারা গড়ে উঠেছে এক-একটি গোত্র এবং এই গোত্রের তরীকার সঙ্গে বা নিয়মাবলীর সঙ্গে অন্য গোত্রের কোন বিশেষ মিল পাওয়া যায় না। তাই এখানে সমাজ দানা বাঁধেনি। তবে ইসলামের সূফীকুলকে সূফীসমাজ বললেও তেমন কোন বিশেষ অসুবিধেও নেই। ইসলামের দুটো দিক। দেহ ও প্রাণ। দেহ শরিয়তে বা অনুষ্ঠানে পরিবেষ্টিত এবং প্রাণ তরিকতে বা সূফীতে অধিষ্ঠিত।

দেহ ও প্রাণের লীলা জগৎ প্রান্তরে
ইসলাম বহিরাবরণ ঈমান অন্তরে।

কে সূফী :

সূফী শব্দ মূলে আরবী 'ইসমু-জামিদ' বা মূল বিশেষ্যপদ। ইহা 'সোফ' হতে নিষ্পন্ন। এর অর্থ পশম। যাঁরা ইসলামের প্রথম যুগে সংসার নির্লিপ্ত হয়ে পশমী বস্ত্র পরিধান করতেন, তাঁদের সূফী বলা হত। এ ছাড়াও এর নানা ব্যাখ্যা আছে।

সূফীদের নিজ কথায় সূফী শব্দের ব্যাখ্যা মেলে একদা তাপস মোহম্মদ ওয়াসা সোফ নামক স্থূল কম্বল বিশেষ পরিধান করে কতিবা নামক এক সাধা পুরুষের কাছে হাজির হন। কতিবা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কেন 'সোফ্' পরিধান করেছেন। ওয়াসা কোন উত্তরা না দিলে কতিবা আবার বলেন—কেন উত্তর দিলেন না। তখন ওয়াসা বলেন—"যদি বলি বৈরাগ্যবশত পরিধান করেছি, তাহলে আত্মশ্লাঘা করা হয়। যদি বলি দারিদ্র্যতাবশত, তাহলে আল্লাহ নিন্দা করা হয়। তাই নীরব ছিলাম। সুতরাং এখানে সূফীদের আপন কথায় বুঝতে পারছি, সূফীরা একদিকে ছিলেন বৈরাগী ও অন্যদিকে ছিলেন দরিদ্র মানুষ। প্রখ্যাত সূফী জুনিদ বাগদাদী বলেন—"সূফী পবিত্র আত্মা, মৃত্তিকাবৎ। তাঁর উপর সমুদয় আবিলতা নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু তা হতে সমস্ত কল্যাণ বহির্গত হয়, তিনিই সূফী। সূফীবর সহল তস্তরী বলেন—"তিনিই সূফী, যিনি মালিন্য হতে মুক্ত। কোরআন ২০ ঃ ৭৬, ১২২, ২৩ ঃ ১, ৮৭ ঃ ১৪, ৯১ ঃ ৯, ২৬ ঃ ৮৯।

সূফীগণের উৎপত্তির কারণ :

ইসলাম জগতের বর্তমান যে-সূফীসমাজ, তার জন্ম আরবে। পরে পারস্যে ও অন্যান্য স্থানে। (তবে ইসলামকে যদি হযরত আদম (আঃ)-এর সময় হতে ধরা যায়, সে কথা স্বতন্ত্র।) ইসলাম ধর্মে এই সূফীগণের উৎপত্তির কারণ কি? ইসলাম ধর্মের মূলে কি সূফী-বীজ নিহিত ছিল, না এটা আগাছা মাত্র!

সূফীবাদ ইসলামে আগাছা নয়। এটি ইসলামের মূলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বয়ং হযরত মহম্মদ (সাঃ) সকল সূফীর শ্রেষ্ঠতম সূফী। একথা তিনি নিজেই বলে গেছেন। তাঁর সময়ে এমন একদল মানুষ ছিলেন, যাঁরা সবসময় মসজিদে-নববীতে থাকতেন। অত্যন্ত দরিদ্র বেশে, অত্যন্ত সাধারণ ভাবে, অত্যন্ত সাধনাযোগে সময় কাটাতেন। তাঁদের ঘরসংসার বলে কিছু ছিল না। তাঁদের সম্মুখে দুটো কাজ ছিল। একটি আল্লার পথে সাধনা, অন্যটি ছিল ইসলামের প্রচারে ও প্রসারে! মহানবীজীকে (সাঃ) তাৎক্ষণিক সাহায্য দান। মহানবীজী ছিলেন ইসলামের মহীরুহ। ওই বিশাল বৃক্ষতলেই ইসলামের সূফীবাদ জন্ম নিল। বলতে গেলে মহানবীজীই (সাঃ) ছিলেন ইসলামের সূফীবাদের জনক। ইসলামের সূফীবাদ সম্পর্কে একথা যেমন নির্ভেজাল, তেমনি নির্ভুল।

৫৭০ খ্রীস্টাব্দে মহানবীজীর (দঃ) জন্ম। ৬১০ খ্রীস্টাব্দে নবুয়ত বা ঐশী লাভ। ৬২২ খ্রীস্টাব্দে হিজরত বা মদিনা গমন। ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন। এর পরবর্তী যুগ ৬৩২-৬৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ। তাঁরা মহানবীজীকে (দঃ) অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করেছিলেন, তাঁদের জীবন ছিল অত্যন্ত অনাড়ম্বর, বিলাসহীন, শান্তি ও সাম্যের প্রতীক। তাঁদের একজনও সংসার বিরাগী ছিলেন না। মহানবীজী (সাঃ) ঘর-সংসার করে গেছেন। মানবজীবনের এমন কোন দিক নেই, যে-দিকটিতে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম নজির স্থাপন করে যাননি। তাঁর খলিফা চতুষ্টয় নিখুঁতভাবে তাঁকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁরাও ছিলেন এক একজন শ্রেষ্ঠ সূফী। তবে তাঁদের সঙ্গে পরবর্তীকালের সূফীগণের কিছু অংশে কিছুটা পার্থক্য ঘটে। কেননা বহু সূফী ঘরসংসার পালন করেননি। আবার অনেক সূফী পাওয়া যায়, যাঁরা সংসারধর্ম পালন করেও ছিলেন আদর্শ সূফী। ইসলামের যে শিক্ষা, তা এই আদর্শের শিক্ষা। ইসলাম কোন দিকটিকেই একেবারে বাদ দেয় না। তাই ইসলাম সামঞ্জস্যের ধর্ম (Balanced religion)। মহানবীজী (সাঃ) বলেন—

'ইসলামে বৈরাগ্য নাই বড় গুণ যার
সমাজজীবন তার সব হতে সার,
সুষ্ঠু সংসার ধর্মে ফলিবে যে ফজিলত
তার বড় নাই আর উপাসনা এবাদত্।

ইসলামের সংজ্ঞাই হল—সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে আল্লার পথে একটি সমুন্নত জীবন ব্যবস্থা। এই ইসলামি ব্যবস্থা পথে মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পরলোকগমনের পর তাঁর চার খলিফার সময়কাল পর্যন্ত ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ। এর পর এল ইসলামের নকল যুগ না হলেও আসল যুগ নয়, বিকৃত যুগ না হলেও অবিকৃত যুগ নয়। অর্থাৎ মুসলমান নামধারীগণই ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস পাল্টিয়ে দিল। এর বহু পরে এরই করুণ পরিণতি হিসেবে অমুসলমানগণ মুসলমানদের মূল ইতিহাসটিই দেশে দেশে বদলে দিতে থাকল। এই ধারা আজও চলছে। বিশ্ববুকে মহানবীজীর (দঃ) ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস কমই থাকল।

খোলাফায়ে রাশেদিনের শেষদিকে অর্থাৎ হযরত আলির (কঃ) খিলাফত কালেই উমাইয়া বংশের নেতা আবু সুফিয়ানের পুত্র মোয়াবিয়া রাজ্যলাভের নেশায় মেতে উঠলেন। আসল কথা বলতে গেলে, ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের (রাঃ) খেলাফতের শেষার্ধে তাঁর বার্ধক্যের সুযোগ নিয়ে খলিফার জামাতা মারওয়ান ও ভাইপো মোয়াবিয়া শক্তির আস্বাদন করেই ফেলেছিলেন। এই আস্বাদনের করুণ পরিণতি হযরত আলির শাহাদত। ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস তখন (৬৬১ খ্রীঃ) অন্যদিকে মোড় নিল। আমাদের মনে হয় যদি শের-ই-খোদা হযরত আলি বিনা বাধায় নির্বিঘ্নে নির্বিবাদে খেলাফত চালানোর সুযোগ পেতেন, তাহলে আজ ইসলামের বিশ্ব-ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। চরম অশান্তির ভেতর দিয়েই শের-ই-খোদা শহিদ হলেন।

হযরত আলির (কঃ) শাহাদতের সঙ্গে সঙ্গেই মহানবীজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র আমির মুয়াবিয়ার হাতেই প্রাণ হারাল। তখন রাজ্যের কর্ণধারগণের কাছে ইসলাম হল গৌণ, রাজ্য হল মুখ্য, দেখা দিল এক সকরুণ পরিস্থিতি।

এ কোন পরিস্থিতি দেখা দিল! যার পরিণতি হল সুদূরপ্রসারী। স্বয়ং মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ) নিজ হস্তে ইসলামের মহীরুহের বীজটি মক্কাতে বপন করেছিলেন এবং যে শিশু চারাটি শত শাখা-প্রশাখায় মদিনাতে লালিত হল পরে দামাস্কাসে তার কাণ্ডটি ব্যতীত সব শাখাই মণ্ডিত হল। এবং বাগদাদে সেই কাণ্ডটিও প্রাণ হারাল। এই কারণেই বলতে পারি অবিকৃত ইসলামের জন্ম ৬১০ খ্রীস্টাব্দে মক্কায় এবং তা (৬২২-৬৩২) মদিনায় লালিত, পরে দামাস্কাসে (৬৬১ খ্রীঃ) তার মৃত্যু এবং (১২৫৮ খ্রীঃ) বাগদাদে তা দাফন কাফন বা কবরস্থ।

৬৫৬-৬৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যখন অবিকৃত ইসলামকে বিকৃত করার জন্য ইসলামের উপর প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা চলছে, তখন ইসলামের রাজধানী কুফা নগরী। শের-ই-খোদা হযরত আলি (কঃ) তখন মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছেন ইসলামের অবিকৃত কম্পমান দীপটিকে আপন বুক দিয়ে রক্ষা করতে। অন্যদিকে কুখ্যাত রাজনীতিবিদ আমির মুয়াবিয়া তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন—শের-ই-খোদাকে পরাস্ত করতে। এই কুখ্যাত কাজে আমির মুয়াবিয়াকে পর ব্যক্তি সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা চারজনই ছিলেন তদানীন্তন আরব মেধা—১। আমর-ইবনুল আস, ২। মুগিরা বিন শুবাহ, ৩। যিয়াদ বিন আবিহ, ৪। উকবা বিন নাফি। বিশ্বাসঘাতকদের হাতে শের-ই-খোদা শহিদ হলেন। অবিকৃত ইসলামের উপর ঝাপটার পালা এখানেই শেষ হল।

হে শের-ই-খোদা :

লড়িতে ছিলে রাখিতে শুধু নবীর ইসলাম জ্যান্ত
শয়তানের ফেরে শেরে খোদা আজ শহিদের পাটে শান্ত।

নবীর ঝাণ্ডা রাখিতে উঁচু হওনিক রণক্লান্ত
শয়তানের ফেরে শেরে খোদা আজ শহিদের পাটে শান্ত।

দ্বীনের পতাকা ধরিতে কোথাও হওনিক রণক্লান্ত
শয়তানের ফেরে শেরে খোখা আজ শহিদের পাটে শান্ত।
লড়িয়া গেলে রাখিতে শুধু নবীর খেলাফত জ্যান্ত
শয়তানের ফেরে শেরে খোদা আজ শহীদের পাটে শান্ত।

(লেখকের হযরত আলী (কঃ) গ্রন্থ হতে)

হযরত আলি (কঃ) শতদিকে শতচেষ্টা করছিলেন অবিকৃত ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখতে। এবং আমির মোয়াবিয়া সহস্র দিকে অন্যায়ের সব দরজাই খুলে দিয়েছিলেন রাজ্যলাভের জন্য। মহানবীজীর (দঃ) জন্মের বহু পূর্ব হতেই হাশেমি ও উমাইয়া গোত্রের কলহ চলতেই ছিল। সেই কলহ আজ আবার মাথাচাড়া দিল। আজ উমাইয়াগণ প্রতিশোধ নিল। হযরত আলি (কঃ)-কে শহিদ করল। খেলাফত ছিনিয়ে নিল। গঠন করল রাজ্য। আরোহণ করল রাজসিংহাসনে। বাতিল হল নবীজীর (দঃ) গণতন্ত্র। খারিজ হল পবিত্র খেলাফতের সব রীতি-নীতি। চালু হলো অজ্ঞতা যুগের বহু কিছু। এই সময়ে যে মহাপরিবর্তন হলো, তার কয়েকটি—১। নির্বাচন প্রথা রহিত হল, ২। সরল জীবন ও সরলতার সমাধি হল, ৩। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল, ৪। রাজপ্রাসাদ তৈরি হল, ৫। আল্লাহতন্ত্রের বিলোপ হল, ৬। বায়তুল মাল ব্যক্তিগত হল, ৭। ধর্মচেতনা লোপ পেল, ৮। গোত্রকলহ জেগে উঠল, ৯। অন্ধকার যুগের অনেকেই আবার প্রতিষ্ঠিত হল। ১০। এককথায় সৎ খলিফাদের ইতিহাসের পট পরিবর্তন হল।

সমাজের এই অভাবনীয় ও আকস্মিক পট পরিবর্তন দেখে বহু মানুষ বিচলিত হয়ে উঠলেন। বহু মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন। বহু মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত হলেন। সেই সময়ও বেশ কিছু মানুষ ছিলেন, যাঁরা সমস্ত কিছুব উর্ধ্বে ইসলামকেই স্থান দিতেন ও ভালবাসতেন। স্বয়ং মহানবীজীর (সাঃ) তিরোধানের পর ইসলামের টালকে সামলিযে নিয়েছিলেন খোলাফায়ে রাশেদিন। এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের শেষ খলিফার শাহাদতের পর সমাজের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ হতাশার কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ইসলামের প্রাণশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একেবারেই বদ্ধপরিকর হলেন, সেদিনের ওই বদ্ধপরিকর ব্যক্তিগুলোই আজকের সূফী সমাজের 'জনক ও পথিকৃৎ'।

চরমপন্থী :

এই ভয়াবহ পরিবেশ ও করুণ পরিস্থিতিতে আমাদের সম্মুখে যেন দুটো চরমপন্থী দল দেখা দিল, অধিকাংশ রাজা-বাদশাহগণ ইসলামের আধ্যাত্মিক বা মুক্তির পথকে যেন একেবারেই বর্জন করে রাজ্য ও রাজনীতিতে মেতে উঠলেন। তখন বহু সূফী রাজা-বাদশাহদের এই অহেতুক ও অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য মর্মে মর্মে নিদারুণ আঘাত পেয়ে কেবলমাত্র ইসলামের শাশ্বত প্রাণশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংসারকে একেবারেই ত্যাগ করে ইসলামের রূহয়ানী শক্তির জন্য মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন প্রতিজ্ঞা নিয়ে আল্লার পথে বের হলেন। এঁরাই হলেন ইসলামের সূফীকুল ও সূফীসমাজ। এঁদের জন্য আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে উচ্ছ্বসিতভাবে ঘোষণা করেছেন—তাঁদের কোন ভয় নেই, চিন্তা নেই। ২ঃ১৫৪, ১০ঃ৬২। এই সময় আমরা আরও একটি তৃতীয় দল লক্ষ্য করি। এই দলটির নাম শ্রদ্ধেয় আলেমকুল, উলামাকুল। এই দলটি ইসলামের শরীয়ত বা অনুষ্ঠানগত দিকটিকে সেই দিন হতে আজও পর্যন্ত তাঁদের নিরলস সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার দ্বারা বাঁচিয়ে রেখেছেন। আজ বিশ্বের কোটি কোটি আধুনিক শিক্ষিত মানুষ ও শরীয়তের পায়াবন্দ। এটা শ্রদ্ধেয় উলামাগণেরই অশেষ ও অকৃত্রিম চিরস্থায়ী অবদান। সুতরাং আমরা তিনটি চরমপন্থী লক্ষ্য করলাম—রাজবাদশাহ, সূফীকুল, উলামাকুল। কিন্তু ইসলাম পৃথক পৃথক রূপে তিনটি দল চায় না। সে চায় সকলের সমন্বিত রূপ।

মহানবীজী (সাঃ) তাঁর মহান জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ইসলামের মধ্যে সমন্বয়ের রূপ দেখিয়ে গেছেন। রাজনীতিতে তিনি শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিবিদ, শরীয়তে তিনি শ্রেষ্ঠতম এবাদী। তরিকতে তিনি শ্রেষ্ঠতম সূফী। সুতরাং তিনি ছিলেন জীবন্ত কোরয়ান, জীবন্ত ইসলাম। একমাত্র তাঁকে অনুসরণ করাটাই মুসলমানদের একান্ত কাজ। তাঁর 'মায্হাবই' মুসলমানদের মাযহাবা। তাঁকে বাদ দিয়ে মুসলমানগণ যাঁকেই অনুসরণ করুক, তা সবই বেদাত বা আগাছা।

পীরবাদ :

পীর শব্দটি ফার্সী, এর অর্থ বৃদ্ধ। বৌদ্ধ থের শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। সংস্কৃত স্থবির শব্দের অর্থও বৃদ্ধ। বহু প্রাচীনকালে বৌদ্ধদের মধ্যে 'থের' পূজার প্রচলন ছিল। মনে হয় এই পূজার অর্থ ছিল প্রবীণকে মানা ও গণ্য করা। হয়তোবা এই মানা কোন কোন ক্ষেত্রে সীমা লঙঘন করেছিল। বেদের বহু পরে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব। বেদ যখন বালুচাপা প্রায়, তখনই এলেন গৌতম বুদ্ধ। সমাজে সাড়া পড়ল। অগণিত মানুষ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হল। প্রায় এক হতে দেড় হাজার বছর অতিক্রান্ত হল। বৌদ্ধ ধর্মও আবার স্তিমিত হল। আবার হিন্দুধর্ম মাথাচাড়া দিল। এবার বৌদ্ধগণ নির্যাতিত হতে থাকলেন। সামনে হাজির হল ইসলাম ধর্ম। সাম্যবাদী ইসলাম ধর্মের আহ্বানে অগণিত মানুষ পতঙ্গের মতো ধাবমান হল ইসলামের প্রতি। দলে দলে বৌদ্ধ ভিক্ষু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকলেন। বৌদ্ধগণ যাঁদের হাতে হাত দিয়ে সাম্যবাদী নবধর্ম ইসলাম গ্রহণ করলেন, তাঁরা ছিলেন ইসলামের সূফীকুল।

ইসলামের সূফীকূল যাঁদের ইসলামে দীক্ষা দিতেন, তাঁদের ধর্মের বাড়াবাড়িতে কষ্ট দিতেন না। অনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের জন্যও চাপ দিতেন না। অনেকেই মহান সূফীর হাতে হাত দিয়ে কেবলমাত্র কালমা তৈয়বটি মুখে উচ্চারণ করেই রেহাই পেতেন। অতঃপর অনেকেই আপন আচার-আচরণেও অবিকৃত থেকে যেতেন। বৌদ্ধগণ সাধারণতঃ 'ন্যাড়া' থাকতেন। এই নাড়া বৌদ্ধগণ যখন দলে দলে সাম্যবাদী ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন হিন্দুগণ তাঁদের 'ন্যাড়া মুসলমান' বলতেন। কখনও নেড়ে মুসলমান, কখনও বা 'পাতি নেড়ে' ইত্যাদি বলে অবহেলার চোখে দেখতেন। ওই জনশ্রুতি আজও সমাজ থেকে বিদায় নেয়নি। তবে ওই ধারা এখন ক্ষীণপ্রায়।

যে সমস্ত বৌদ্ধ বা অন্যান্য নির্যাতিত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন, তাঁরা তাদের পূর্ব সংস্কৃতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে পারেননি। তাঁরা আরবীয় মুসলমান হতে পারেননি। তাঁরা ভারতীয় মুসলমান হয়েছিলেন। সারা পৃথিবী জুড়ে ইসলাম যেখানেই প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সকল স্থানেরই অধিবাসীগণ ইসলামকে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে তাকে আপন দেশজধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। কেউই আরবের ইসলামকে গ্রহণ করেননি। সকলেই এক আল্লার ইসলামকেই গ্রহণ করেছেন। স্থান-পাত্র-কাল ভেদে ইসলাম সব জায়গাতেই আপনাকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এটাও ইসলামের অসাধারণ ও অভাবনীয় কৃতিত্ব। স্থান-কাল-পাত্রে তার কিছু আসে যায় না। তাই ইসলাম চিরন্তন, তাই ইসলাম সর্বকালের ও সর্বজোড়া। সে কোন বিশেষ দেশের ইসলাম নয়, সে কোন কালের ইসলাম নয়। সে সর্বকালের সর্বদেশের।

এই কারণেই ইউরোপীয় ইসলামের সঙ্গে এশিয়ার ইসলামের সংস্কৃতিগত আচার-আচরণে মিল নেই। আহারে-বিহারে, পোশাকে-পরিচ্ছদেও মিল নেই। সারা দুনিয়ার মুসলমানের বিচিত্র মানচিত্রে এই কারণেই নানা বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। ইসলামকে আপন আপন দেশের জলবায়ু আবহাওয়া, আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও রুচি-অভিরুচি অনুযায়ী আপন করে নিয়েছে। ইসলাম কোন দেশেই আজ আর অতিথি নয়, সে আজ আপনজন। এখানেই অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে ইসলামের বিশেষ ব্যবধান। এখানেই ইসলামের সাম্যবাদী মাহাত্ম্য। এখানেই ইসলাম চিরন্তন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মুসলমান হলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সংস্কৃতিগত 'থের' বা বুদ্ধ পূজা ছাড়তে পারলেন না। এখানে পূজা করতেন অর্থাৎ শ্রদ্ধা জানাতেন। এই দৃষ্টান্ত মুসলিম সমাজে আরও বহু

আছে। অনেকেই মুসলমান, কিন্তু আপন অতীতের বদ্ধ সংস্কারে আজও আবদ্ধ। অনেক মুসলমান সাপ নাচান, অনেকে বাঁদর নাচান, অনেকে রোজার কাজ করেন। আমি আমার গবেষণাকালীন অবস্থাতে বহু পল্লীগ্রামে লক্ষ্য করেছি বহু মুসলিম বাড়িতে তুলসীগাছ। অনুরূপভাবেই একদিন ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত নব বৌদ্ধ মুসলমানগণ তাঁদের প্রিয় 'থর' শব্দটিকে 'পীর' শব্দে রূপান্তরিত করে আপনাদের পূর্বধারা জিইয়ে রাখলেন। এইভাবে অনায়াসেই একদিন 'পীর-বাদ' ইসলামে জন্ম লাভ করে কালের গর্ভে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। বৌদ্ধ-মুসলমানগণের এই 'থের তথা পীর বাদ' ইসলামের সূফী রাজ্যেই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেল। ইসলামের অন্য কোন অধ্যায়ে এরা স্থান পায়নি। কিন্তু প্রকৃত কোন মহান সূফী এই প্রথা প্রবর্তন করে যাননি। যদিও তাঁরা যোগ্য ব্যক্তিকে তাঁদের খেলাফত দান করে গেছেন।

ইসলামে পীরবাদে' ·ান স্থান নেই। কোরআন ও হাদিস মতে তিনিই মুসলমান, যিনি এক আল্লার উপাসনা বা এবাদত করেন।

বর্তমান মুসলিম সমাজে পীরবাদ এমন একটা স্থান অধিকার করেছে, যেখানে বহু মুসলমান জড়িত। ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধার্মিক-অধার্মিক, আলেম-উলামা, বহু জনই পীরবাদে জড়িত। জীবন্ত পীর, সাধক-সূফী, অলি-আউলিয়া, দরবেশ-দীনদার ব্যাক্তিমূহের সান্নিধ্য যে ভাল জিনিস, এ কথায় সন্দেহ নেই। মনসুর-হাল্লার্জ, শামশ্ তবরীজ, বাযজিদ বুস্তামী, আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ), খাজা মুঈনুদ্দীন চিস্তি (রঃ) এবং আরো অনেকে যে মানবকুলের চির-ভূষণ ছিলেন, এ কথায় কি কোন সন্দেহ আছে। যাঁদের জন্য মানুষের দেওয়া কোন সার্টিফিকেটেরই প্রয়োজন নেই। আল্লার কোরআনই তাঁদের জন্য যথেষ্ট। ২ ঃ ১৫৪, ১০ ঃ ৬২। এ কথা কি এক বাক্যেই স্বীকার করা যায় না। তাঁরা না থাকলে, জীবন-মরণ পা করে বিশ্বের কোণায় কোণায় কে ইসলাম প্রচার করতেন? বিশ্বজোড়া আজ ইসলামের যে প্রচার ও প্রসার, তা তো নিঃসন্দেহে তাঁদেরই অবদান। রাজা-বাদশাহ ও আলেম-উলেমার অবদান এখানে খুবই ক্ষীণ। রাজা-বাদশারা সূফীকুলকে সাহায্য করেছেন, আবার কোথাও কোথাও আঘাতও দিয়েছেন বশ্যতা মানাতে। আলেমকুল শরীয়তকে ধরে রেখেছেন। এটাও প্রশংসাই।

কিন্তু যে সমস্ত মহান সূফী মারা গেছেন, তাঁদের কবরটিকে ঘিরে তাঁর অযোগ্য বংশধর বা অপদার্থ শিষ্যগণ যা করেন, তাকে এক কথায় পেটপূজা ব্যতীত আর কি বলা যেতে পারে? এর অপেক্ষা জঘন্য কাজ ইসলামে আর কিছুই নেই। জ্ঞান নেই, গরীমা নেই, শিক্ষা নেই, সাধনা নেই, সত্যের অনুভূতি নেই, আল্লাহতে আকুলি নেই, রসুলে ব্যাকুলতা নেই। ইনসানিয়াতের নাম নেই, ইখ্ওয়ানিতের গন্ধ নেই, পারদর্শিতার চিহ্ন নেই, দূরদর্শিতার লক্ষ্মণ নেই ; কেবল আছে ধোঁকা বাজী, ধান্দা বাজী, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, এই সমস্ত মানুষ মানুষের মাঝে সত্যের উপলব্ধি ও বিবেকের বোধোদয় জাগিয়ে দেবে, এটা কি বিশ্বাস করা যায়? কখনও না। এই প্রবঞ্চকের দল ইসলামের জারজ সন্তান। তাই বলে মহানসূফীকূলকে এতটুকুও ছোট বা খাটো করা যাবে না। আল্লার নিকট তাঁদের সম্মান ও সম্ভ্রম এতই বেশী, যেখানে নবী-রসুলগণও থা পান না। একথা তো স্বয়ং মহানবীজীরই (দঃ)। এই পৃথিবীতে যদি আল্লার কোন খাসদল থেকে থাকেন, তাঁরা হলেন মহান সূফী কুল, অলিকুল, আউলিয়া কুল, দরবেশ কুল। ৫৮ ঃ ২২। নবী ও রসুলগণ ছিলেন স্বয়ং আল্লার প্রেরিত পুরুষ। এবং সূফীকূল ছিলেন একমাত্র আল্লাহতেই নিবেদিত প্রাণ।

নিবিড় রহস্যঘেরা সূফী-আচরণ
আত্মার উন্নতি পথে শ্রেষ্ঠ বিচরণ।
সূফী মতে নাহি যার আত্মার বিকাশ
মনুষ্য-জীবন তার শুধু পরিহাস।

যে জন অক্ষম এই তাসাউফ জ্ঞানে
জীবনের তিক্ত হতে মিষ্ট নাহি জানে।
মুমূর্ষু ধরার বুকে সূফী মতামত
ব্যাধিগ্রস্ত ধরণীর চির মুক্তি পথ।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম, ইসলামের পীরবাদটি বৌদ্ধধর্মের 'থের' বাদ থেকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত না হলেও বহুলাংশেই যে প্রভাবান্বিত এতে কোন সন্দেহ নেই। সারা বিশ্বজুড়ে বহু মানুষের বিচিত্র সংস্কার উদার ইসলামে প্রবেশ করেছে। তবে যত সংস্কারই ইসলামে আসুক, সবশেষে একটি কথা মনে রাখতেই হবে, ইসলামে একমাত্র উপাস্য 'এক আল্লাহ' এবং একমাত্র পথপ্রদর্শক 'মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ)।

দেহ ও প্রাণের লীলা জগৎ প্রান্তরে
'শরীয়ত' বহিরাবরণ 'সূফ' তো অন্তরে।

সূফী ও রাজ-সংঘর্ষ :

ইসলাম জগতে এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা একদিকে জগদ্বিখ্যাত সূফী ও অন্যদিকে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত। যাঁদের তুলনাহীন সাধনা ও জ্ঞান সমগ্র মনুষ্যজগৎকেই ধন্য করেছে। যাঁরা কোনদিনই কোথাও এক আল্লাহ ব্যতীত কারও কাছে মাথা নত করেননি। যেমন ইমাম-আজম হযরত আবু হানিফা (বাঃ), ইমাম শাফী (রাঃ) ইমাম মালেক, (রাঃ) ও ইমাম আহমদ-ইবনে হাম্বল (রাঃ) এবং আরও অনেকে। এই সমস্ত ক্ষণজন্মা সাধক ও সূফী পণ্ডিতদের অনেক সময় অবুঝ রাজা বাদশাগণ নিজপথে ও মতে আনার জন্য ভীষণ চাপ সৃষ্টি করেছেন। তখন বেধেছে সংগ্রাম, বেধেছে সংঘর্ষ। একদিকে রাজার অপরিমিত শক্তি, অন্যদিকে আত্মার বলে বলীয়ান সাধক।

এই সমস্ত সূফী-সাধকগণ অবলীলায় জীবন দিয়েছেন, কিন্তু কখনো আপন নীতিকে ত্যাগ করেননি। তাঁরা তাঁদের অন্তরজগতে এমনি শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন, বিশাল রাজাধিরাজের অন্যায় আবদারকে অবজ্ঞা করতে এতটুকুও দ্বিধা করেননি। সমূহ বিপদ মাথায় নিয়ে মহান সূফীকুল আপন মনে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে জীবনহারা হলেও নীতি হারা হননি। এঁরাই হলেন অমরতার জীবন্ত সাক্ষী। জগদ্বিখ্যাত ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) কারাবাস ও কারাগারে মৃত্যুবরণ, বিশ্ববিখ্যাত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রাঃ) বেত্রাঘাতে প্রাণনাশ, সূফী সাম্রাজ্যের সিংহপুরুষ মনসুর হাল্লাজের প্রাণদণ্ড, সূফীপ্রাণ সারমাদের প্রাণনাশ, এছাড়াও বিশ্বজোড়া অগণিত সূফী দরবেশের জীবন নিয়ে রাজা-বাদশাগণ যে ছিনিমিনি খেলেছেন, তা জগতের কলঙ্ক-ইতিহাস ব্যতীত আর কি? কিন্তু তারা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বলে গেছেন, গেয়ে গেছেন মহান আল্লার একত্ববাদ ও তৌহিদের গান—

মোর দেহ প্রাণ আল্লার প্রেম
তৌহিদে তৈরি
মম আসনের নীচাসনে থাক
শিখর হিমাদ্রি।

রাজা-বাদশারা অনেক সময় নিজদের মসনদকে শক্ত করার জন্য সূফী ও পণ্ডিতদের দ্বারা নানা অহেতুক ফতোয়া জারি করতে চাইতেন। এবং অনেক সময় তা করতেনও। ইসলামকে বিকৃত করার পেছনে রাজা-বাদশাদের অবদানই বেশি। মুসলিম সমাজের কোন কোন অংশে তিন তালাকের যে প্রচলন, তা রাজা-বাদশাদেরই অবদান। এই জঘন্য প্রথা কোরআনেও নেই, হাদিসেও নেই। তবুও সমাজে আজও চলছে। ইসলামই প্রথম নারীকে নরের সম-মর্যাদা দিল। কিছু বাদশাহ ও কিছু আলেম

সেই দেওয়া মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করল। আবার বহু বাদশাহকে দেখছি, যাঁরা ইসলামের মহান সূফীকুলকে প্রাণভরে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারে সূফীকুলের যে প্রশংসনীয় ভূমিকা, ওই ভূমিকাতে যেখানে বাদশাহগণের সাহায্য মারাত্মকভাবে কাজ করেছে। সেখানে সূফীকুল দশদিনের কাজ একদিনেই সামাধা করেছেন।

ইসলাম প্রচার :

সারা বিশ্বে তথা ভারতে ইসলাম প্রচারে প্রধানত পাঁচটি শাখা লক্ষ্য করি। (১) সংসার বিরাগী মহান সূফীকুল, (২) সংসারধর্মী দরবেশগণ, (৩) বণিকশ্রেণী সওদাগরগণ, (৪) কিছু শরীয়তপন্থী আলেম সম্প্রদায়, (৫) কিছু রাজা-বাদশাহ। প্রধানত প্রথম তিনটি শ্রেণীর দ্বারাই বিশ্ববুকে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়। ইসলামের মানবতাধর্মী সাম্যবাদী আদর্শের দিকে মানুষ দলে দলে পতঙ্গের মত ছুটতে থাকে। সকল মানুষই যে এক, একথা ইসলামই সর্বপ্রথম ঘোষণা করল। শুধু যে ঘোষণাই করেছিল, তা নয়। কাল যে পতিত ছিল, যে-ক্রীতদাস ছিল, আজ সে মুসলিম জাহানের তাজ, মসজিদ ই-নববীর স্বনামধন্য মুয়াজ্জীন। কত পতিত কত সেনাপতির পদ অলঙ্কৃত করল, কত ক্রীতদাস কত শাহানশার পদ অল ঙ্কৃত করল। এ সবই ছিল মানবতাবাদী, সাম্যবাদী ইসলামের দান।

বিশাল শক্তির অধিকারী রাজা-বাদশাহগণ যেখানে অকৃতকার্য হলেন, যাঁদের ইঙ্গিতে বিশ্বের নাড়ীস্পন্দন থেমে যায়, যাঁদের সামান্য ইঙ্গিতে শত পণ্ডিতের মুণ্ডু গড়াগড়ি যায়। যাঁদের পদভারে ধর ণী কম্পিত হয়, স্থলচর-জলচর সবই যাঁদের আজ্ঞাবহ, কেন তাঁরা সরাসরি ইসলাম প্রচারে সফলতা লাভ করলেন না? এ তো বড়ই মারাত্মক জিজ্ঞাসা। এ সদুত্তর আমরা খুঁজে পেয়েছি পবিত্র কোরআনের মধ্য হতেই। কোরআন বলে ধর্মে বল প্রয়োগ নেই। ২ : ২৫৬, ১০ : ৯৯, ১০০, ২৭ : ৯২, ৯৩, ২৮ : ৫৫, ৮০ : ১১, ১২, ৮৮ : ২২, ১০৯ : ৩। সুতরাং ইসলাম যে বলপ্রয়োগে প্রচার হবে না, এটা তো ইসলামেরই প্রাণের কথা, মুখের ভাওতাবাজি নয়। তাই ইসলাম কোথাও বল প্রয়োগে প্রচারিত হয়নি।

সমভাবে শাস্ত্রবিদ ইসলামের উলামাকুলও ইসলাম প্রচারে সফল হননি। যে-উলামাকুল ইসলামের আদি-অন্ত সম্পর্কে মহাজ্ঞানী, সুপণ্ডিত, যাঁরা ইসলামের দর্শনশাস্ত্রে এক একজন জ্ঞান জগতের পিরামিড, যাঁরা ইসলামের ব্যাখ্যা ও অনুব্যাখ্যাতে এক-একজন জ্ঞানের সাগর তুল্য, ইসলামে এমন অনেক পণ্ডিত জন্মিয়েছেন, যাঁরা জগৎ-প্রতিভাকে ম্লান করে দেন, তবুও তাঁরা ইসলাম প্রচারে ও ইসলামের প্রসারে সম-সফলতা লাভ করলেন না। এ তো বড়ই কঠিন জিজ্ঞাসা। কেন উলামাকুল সাধারণ অগণিত অমুসলমানের মধ্যে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হলেন। এখানেও আমরা পবিত্র কোরআন থেকে এর মীমাংসা পেয়েছি। ইসলাম কোনদিনই ধর্মের শুকনো কচকচানি ভালবাসেনি। ধর্মের অনুষ্ঠান তাঁর কাছে বড়, কিন্তু ধর্মের হৃদয় বা প্রাণ তার কাছে অনুষ্ঠান-সর্বস্ব দেহ অপেক্ষা অনেক বড়। তাই ইসলামের মাযহারধারী, এবং শতমতে শতধাবিভক্ত স্পর্শকাতর উলামাগণও ইসলামের সার্বিক প্রচারে সম-সাড়া জাগাতে পারলেন না, বা পারেননি। তাই ইসলাম কোথাও কারও দ্বারাই সংকীর্ণ ও গোষ্ঠীগত অনুষ্ঠান ধর্মে বা শাস্ত্রবিহিত নিছক শৃঙ্খলাবিধানেও প্রচারিত হয়নি। এখানেও পবিত্র কোরআনের সতর্কবাণী কাজ করেছে। যে বাণীর সঠিক মূল্যায়ন হয়তো বা উলামাকুল দ্বারা হয়নি। কোরআন বলে—"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোতে তোমাদের কোন পুণ্য নেই", ইত্যাদি ইত্যাদি। ২ : ১৪৪, ১৪৮, ১৭৭, ৩ : ৯২, ১০৭ : ১-৭।

আমাদের নবীজী (সাঃ) চেয়েছিলেন, মক্কার কাবাকে কেবলা রূপে পেতে আল্লাহ পাক তাঁর পছন্দমতো তাই করে দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন এবং দিক নির্ণয়ের রহস্যভেদ করে দিলেন,

এই বলে—"তোমরা সৎকর্মের দিকে ধাবিত হও।" ১৪৮। আবার আরও পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন, "পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই।" ২ : ১৭৭। এ রহস্যরেখা ও ক্রান্তি সীমা অধিকাংশ আলেমই অতিক্রম করতে পারেননি। তাই ইসলাম প্রচারে ও প্রসারে তারা তাঁদের শ্রমের ফসল ঠিক আশানুরূপভাবে তুলতে পারেননি।

ইসলাম-প্রচারে ও প্রসারে সূফী-অলি-আউলিয়া, দরবেশ ও সওদাগরগণের কথা একেবারেই স্বতন্ত্র। এঁদের উদার বাণী, ভালবাসার বাণী, স্নেহের বাণী, অভয়ের বাণী, আশ্রয়ের বাণী, আপন করার বাণী, মানবতার বাণী, মনুষ্যত্বের গান, প্রেমের হাত, প্রীতির স্পর্শ, দরিদ্রের সেবা, আর্তের সাহায্য, অসহায়ের আশ্রয়, নিরন্নের অন্ন, বস্ত্রহীনের বস্ত্র, সবার উপর রাস্তার পতিতকে আপনার পাশে বসানো, দূরকে নিকট করা, অপরকে আপন করা, জাতি ধর্ম বর্ণ-দেশ-কাল-পাত্র ভেদে অসংখ্য মানুষকে নিয়ে, যারা গতকাল পর্যন্ত ছিল মনুষ্য সমাজের বাইরে, বহু দূরে ; ওই হতভাগাদের কেউ ভুল করে কোন উচ্চশ্রেণীর রান্না ঘরে একবার না রাখলেই সমুদয় রান্না খাবার ফেলে দেওয়া হত, ওই সমস্ত হতভাগাদের নিয়ে এক সঙ্গে বসা, এক সঙ্গে ওঠা, এক সঙ্গে খাওয়া, এক সঙ্গে শোয়া, বিশ্ব-সমাজের সুপ্ত-নিস্তব্ধ তরঙ্গে তরঙ্গাভিঘাত জাগিয়ে তুলল, মানব-সমাজের মহাসমুদ্র যেন আবার অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায় জেগে উঠল, পতিত মানবসমাজ আবার স্পন্দিত হল, বন্দিত হল ; নন্দিত হল মানব মহিমা। সারা বিশ্ব-বুকে এ কার দান! বিশ্বজোড়া নিবিড় অন্ধকারে কে জ্বালল মানবতার এই দিগন্তহীন মশাল। স্বর্গ-লোকের কোন ফেরেস্তা মর্ত লোকের এই অচিন্ত্যনীয় কাজ সমাধা করলেন! কার গগনভেদী চিৎকারে জগৎ-পতিত বিশ্বদরবারে স্থান পেল! এই বুকের পাটা, এই স্পর্ধা কারা দেখালেন! কাদের আহ্বানে, কাদের আলোড়নে, কাদের আন্দোলনে শত সম্রাট তাঁদের সম্বিৎ ফিরে পেলেন! কাদের দ্বারা বিশ্ব-মানব সমাজের মোড় ফিরল! কাদের দ্বারা মানবতার মরা গাঙ্গে বান ডাকল! এঁরাই তো ইসলামের সূফীকুল, অলিকুল, আউলিয়াকুল, দরবেশকুল, ও সওদাগরকুল। হে সুফীকুল—

বিশ্বজুড়া মানবতার রুখে দিয়ে মৃত্যুবাণ
মরণমুখী মনুষ্যত্বে সঞ্চারিলে বীরের প্রাণ।

সূফী-সংসর্গ :

সূফীদের দ্বারা এত বেশি মানুষ মুসলমান হল কি করে বা কি কারণে। এর প্রধান কারণ সূফীদের মধ্যে এমন গুণ ছিল, যা সকল শ্রেণীর মানুষকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল। এর পশ্চাতে তিনটি কারণ লক্ষ্য করি প্রধানত।

প্রথম, অধিকাংশ সূফী ছিলেন সংসারে বিরাগী পুরুষ। আবার যাঁরা সংসারী ছিলেন, তাঁদেরও সংসারের আবিলতা ও মলিনতা তাঁদের স্পর্শ করতে পারেনি, যে আবিলতা ও মলিনতা মানুষের মনকে করে ছোট ও সংকীর্ণ। যখন মানুষকে মানুষের কাছে করে অবিশ্বাসী, প্রতারক, প্রবঞ্চক, অনুদার ও অত্যাচারী। সূফীগণের এই সমস্ত বালাই মোটেই ছিল না। মানুষের কল্যাণ কামনাই ছিল তাঁদের মূল কামনা। মানুষ মাত্রেই ছিল তাঁদের প্রিয়জন। সুতরাং মানুষও তাঁদের দিয়েছে প্রাণের অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি।

দ্বিতীয়, মানুষের সুখে-দুঃখে তাঁরা এত অকৃত্রিম প্রাণে গভীরভাবে সাড়া দিতেন, মানুষ তাঁদের দেবতার ন্যায় দেখতেন। আবার দেখি, মানুষ যখনই কোন বিপদে পড়ত, ছুটে যেত সূফীর আস্তানায়। সূফীগণ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ খুলে তাঁদের জন্য দোয়া করতেন। তাঁরা স্রষ্টার এতই প্রিয় ছিলেন, তাঁদের দোয়া ব্যর্থ যেত না। এমনকি অনেক সময় সূফীগণকে মুখে কোন কথা বলার দরকারই হত

না। তাঁরা ইচ্ছা করলেই, তা আল্লার দরবারে গৃহীত হত। তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাইক ধরে বক্তৃতা করতেন না। এমনকি অনেক সূফী বেশিরভাগ সময় নীরবতাই পালন করতে ভালবাসতেন। তাঁদের মধ্যে একটি মহা গুণ ছিল, যা অসংখ্য মানুষের হৃদয়কে ক্ষণিকের মধ্যে জয় করে নিত।

তৃতীয়, সকল একেশ্বরবাদীর মধ্যে যে কারণে হানাহানি-খুনোখুনি ও মারামারি দেখা যায়, সেটা আপন আপন ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি নিষ্ঠা নামের গোঁড়ামি। সকলেই যেন বলতে চান, এক স্রষ্টাকে পেতে তাঁদের পথ ও পদ্ধতিটাই একমাত্র পথ। আরগুলো কিছুই না। সৌভাগ্যবশত ইসলামের সূফীকুলের মধ্যে এই মারাত্মক দুর্ভাগ্যটা দেখা যায়নি। তাঁরা কোনদিনই ধর্মের বাহ্যিক দিকটাকে তাঁদেব আস্তানায় বড় করে দেখাননি। যার ফলে যে কোন একেশ্বরবাদীর পক্ষে তাঁদের উদার প্রাঙ্গণে যোগ দিতে এতটুকুও অসুবিধে হয়নি। অগণিত মানুষ এসেছে। মহাতাপসের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছে। দীক্ষা নিয়েছে তওহিদের। হয়েছে মুসলমান। তারপর সব খতম। যে যেমন সে তেমন। বাড়ি ফিরল মুসলমান হয়ে। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে আপন পূর্ব সংস্কারমতই চলতে থাকল। পরবর্তীকালে এঁরাই হলেন ইসলামের সংস্কারগত মুসলমান।

সূফী ও সংস্কারগত মুসলমান :

মহান সূফীগণ কোনদিনই ধর্মের বাহ্যিক বা শরীয়তগত দিক নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। এক আল্লার অসীম প্রেমে তাঁরা মগ্ন থাকতেন। তাঁরা অসংখ্য মানুষকে তৌহিদের বাণী শুনিয়ে দিতেন। কলমা তৈয়ব শিখিয়ে দিতেন। এই পথে লক্ষ লক্ষ পথহারা নর-নারী তাদের পথ খুঁজে পেয়েছিল। মহান সূফীর হাতে হাত দিয়ে পেয়েছিল দুর্লভ মানব-জীবনের স্বাদ, পেয়েছিল জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের মর্যাদা। মহান সূফীগণের আস্তানায় এসেছিল জীব-রূপে এবং সূফীর হাতে হাত দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল মানুষ রূপে। অধঃপতিত মানবকুলকে এই সম্মান সূফীগণ ব্যতীত আর কেউ দিতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এই সম্প্রদায়গুলো আজও আপন আপন সংস্কারে রত, যেমন খাঁ, ধোপা,, ধোওয়া, মাল, বাজিকর, পাখমারা, চুড়িওয়ালি, লেটোদল, মানিক পীর দল, সত্যপীর দল, মাদার পীর দল এবং আরো বহু দল। এঁরা মুসলমান হলেন ঠিকই, কিন্তু আপন আপন অতীত সংস্কারেই রয়ে গেলেন। এঁরাই ইসলামের সংস্কারগত মুসলমান। এঁরা মুসলমান হলেন ঠিকই, কিন্তু না পেলেন সূফীর অধ্যাত্মচেতনা, না পেলেন উলামাদের শরীয়ত জ্ঞান। তবুও তাঁরা মুসলমান। এছাড়াও সারা বিশ্ব-মুসলমান আরবের ইসলামকে আপন আপন দেশের দেশজ ইসলাম বানিয়ে নিয়েছেন। এখানেই ইসলামের বড় কৃতিত্ব। সে সর্বকালে সর্ব দেশের সাথেই নিজকে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। এখানেই ইসলাম চিরন্তন, সর্বজনীন। এখানেই পবিত্র কোরআন অতীত হতে বর্তমানের সমস্ত ঐশীগ্রন্থের শেষ মূল্যায়ন ধারণ করে। এখানেই কোরয়ান সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ। এবং মহানবীজী (সাঃ) সর্বশেষ নবী, শেষ রসুল।

সূফী ও রাজাবাদশাহ :

মহান সূফী-সাধকগণ অধিকাংশ সময় রাজা-বাদশাহগণের সঙ্গে এক হতে পারেননি। রাজা বাদশাহগণ চাইতেন সূফীগণের দ্বারা নিজদের মতমত ফতোয়া জারি করে সুখ-স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করতে। এবং সূফীগণ চাইতেন সারা বিশ্ব বুকে ইসলামের নিখুঁত প্রচার ও ব্যাপক প্রসার ইত্যাদি। এর ফলে পরিণতি যা দাঁড়াত, অনেক সময় সূফীগণ অকুতোভয়ে বাদশাহগণকে বুড়ো অঙ্গুলি দেখিয়ে দিতেন। আবার অনেক সময় বাদশাহগণ তাঁদের উপর জুলুম চাপিয়ে দিতেন। কোন কোন বাদশাহ সূফীগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা জানাতেন। সেখানে বাদশাহ ও সূফী মিলে যেতেন। তবে এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই কম। সব রকমই দেখা যায়।

সূফী ও আলেম সম্প্রদায় :

তদানীন্তন সূফীসমাজে এমন অনেক উচ্চমার্গের সূফী জন্ম নিয়েছিলেন, যাঁরা নিজেদের সাধনার এমনি উচ্চমার্গে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, যেখানে তাঁরা আল্লাহ ও নিজদের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান লক্ষ্য করতে পারেননি। এই পর্যায়ে তাঁরা অনেক সময় শরীয়তের বিধিনিষেধকেও তেমন কোন গুরুত্ব দেননি। এই সম্পর্কে মহাকবি সাদি (রহঃ) বলেন আল্লার সান্নিধ্যলাভে যে পর্যায়ে পৌছলে মানুষ বা সাধক তার চেতনা হারায়, সেই পর্যায়ে শরীয়তের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। তিনি আরও বলেন—ধরাবাঁধা অফিসিয়াল ফর্মে অর্থাৎ কেবল শরীয়তগত প্রার্থনায় বা ইবাদতে ইবাদী যতদিন বন্দী থাকবে, ততদিন আল্লার সাক্ষাৎ বা চরম সান্নিধ্য পাওয়া যাবে না। এ কথা খুবই সত্য।

অনেক সূফীগণও তাই ওই পর্যায়ে পৌছিয়ে হয়তো বা তাঁদের অবচেতন মনেই শরীয়তকে কিছুটা অবহেলার চোখে দেখেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা ইসলামকে ছোট করতে চেয়েছেন। জেলে বা মাঝি যখন মাছ ধরতে নেমে রুই-কাতলা পেয়ে যায়, তখন ছোট মাছগুলোকে একটু অবহেলার চোখেই দেখে। এটা স্বাভাবিক। এখানে শরীয়তপন্থী আলেমগণ খুবই চটে বসতেন।

আবার অনেক সময় অনেক সূফী এমন কথা মুখ দিয়ে বের করতেন, যা প্রকাশ্যে ইসলামবিরোধী। তখন শরীয়তপন্থী আলেমগণ রাজবিচার প্রার্থী হতেন। রাজা, মুফ্‌তি মহোদয়ের উপর বিচার ভার ছেড়ে দিতেন। তখন মুফ্‌তিগণ ইসলামের বাহ্যিক বিধি অনুযায়ী অনেক সূফীর প্রাণদণ্ডের জন্য সুপারিশ করতেন এবং বাদশাহগণ সেই সুপারিশ অনুমোদন করলে জল্লাদ প্রাণদণ্ড সমাধা করত। ওই কথাগুলো—মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) বলেন—'আনাল হক'—আমিই সত্য, রায়জিদ বুস্তামী (রহঃ) বলেন—'আনা সোবহানী' আমিই পবিত্র।

এই ভীষণ কথাগুলো উচ্চারণ করার সাহস তাঁরা কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন। আমরা লক্ষ্য করছি সূফীকুলের জড় ছিলেন হযরত আলী (কঃ)। তিনিই একদিন বলেছিলেন—'আমিই ব্যঞ্জনাময় কোরআন।' আবার যিনি ইসলাম জগতের মহান কাণ্ডারী, যাঁর সঙ্গে কোন মানুষেরই তুলনা হতে পারে না। যিনি শ্রেষ্ঠ ও শেষ রসুল। তিনিও বলেন—'আমিই মহাকাল।' এই কথার দ্বারা বোঝতে পারছি, মহান সূফীকুল ভিত্তিহীন নন।

তবে এ প্রসঙ্গে সবশেষে এইটুকু বলতে পারি, ইসলাম প্রাণ পেয়েছে সূফীকুল দ্বারা এবং দেহ পেয়েছে আলেমকুল দ্বারা। ইসলামের প্রাণপ্রদীপটি জ্বালিয়ে দিতে সূফীকুলের দানের যেমন কোন শেষ নেই, অনুরূপভাবে ইসলামের আচারঅনুষ্ঠানের দেহরক্ষায় আলেমকুলেরও অবদানের কোন শেষ নেই।

বঙ্গীয়-ভারতীয় এবং আরবীয় ও পারস্য সূফী :

আমাদের দেশের সূফীগণের জীবনী আলোচনা করে দেখা যায়, বঙ্গীয় এবং ভারতীয় সূফীগণের চিন্তাধারা প্রায় এক। কেননা অধিকাংশ বঙ্গীয় সূফী উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের সূফীগণের উত্তরাধিকার বা তাঁদের ধারাবাহিকতা। সুতরাং চিন্তাধারাটা এক হওয়াই স্বাভাবিক। আবার আরবীয় সূফী অপেক্ষা পারস্য সূফীগণের সঙ্গে তাঁদের মিলটা বেশি লক্ষ্য করি। কারণ স্বরূপ দেখি, অধিকাংশ সূফী পারস্য থেকে ভারতে আসছেন। সে তুলনায় সরাসরি আরব থেকে ভারতে কম এসেছেন। এই কারণেই পারস্য সূফীদের সঙ্গে ভারতীয় সূফীদের মিলটা বেশি। তবে আরবের সূফীধারা পারস্যে এসে পারস্যের রূপ নিয়েছে, ভারতে এসে ভারতের রূপ নিয়েছে, এমনকি বঙ্গে এসে বঙ্গের রূপ ধারণ করেছে। অর্থাৎ জলের গ্লাস বদলিয়েছে, কিন্তু জলটা একই আছে—আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং হযরত মহম্মদ (সাঃ) তাঁর প্রেরিত পুরুষ। ইসলাম অখণ্ড মানুষের জন্য মানবতার ধর্ম।

সূফীগণের সামাজিক স্বরূপ :

সূফীগণ সমাজজীবনের কোন একটি বিশেষ গোত্রের সীমারেখায় সীমাবদ্ধ ছিলেন না। বা অনেকগুলো সূফী মিলে কোন একটি দলের বা গোষ্ঠীরও সৃষ্টি করেননি। এই ছিল তাঁদের সামাজিক স্বরূপ। পরবর্তীকালে এক-একজন মহান সূফীকে কেন্দ্র করে তাঁর ভাবনা-চিন্তাকে কেন্দ্র করে এক-একটি সূফী-গোষ্ঠী বা দল গঠিত হয়েছে। যেমন—চিস্তি, কাদেরী, ইত্যাদি।

সূফীগণের আসল কর্ম ও প্রধান অবদান :

সূফীগণের আসল কর্ম বলতে প্রধানত দু'ভাগে লক্ষ্য করছি। আপন ব্যক্তি-সাধনার মাধ্যমে আত্মার চরম উন্নতি লাভ করা এবং অন্যকেও লাভ করিয়ে দেওয়া। আত্মার চরম উন্নতি মানেই আল্লার মুখোমুখি হওয়ার চরম সৌভাগ্য লাভ করা। মানবজীবনে এর অপেক্ষা বড় পাওয়া আর কিছুই নেই। সুতরাং সূফীকুল মানবসমাজকে দিয়েছেন তার সর্বাপেক্ষা বড় পাওয়া। তাই সূফী-সাধকগণের কর্মময় জীবনের এক অংশে লক্ষ্য করি দুর্লভ মানবজীবনে ঐ অতীব দুর্লভ জিনিসটিকে (স্বয়ং স্রষ্টা) পাওয়া এবং অন্যকেও পাইয়ে দেওয়ার পথ করে দেওয়াটাই ছিল তাঁদের মহান জীবনের মূল সাধনা বা আসল কর্ম।

তাঁদের কর্মময় বা সাধনাময় জীবনের অন্য অংশে লক্ষ্য করি, যেখানেই দেখা গেছে মানুষ নির্যাতিত-লাঞ্ছিত, শোকে-দুঃখে ম্রিয়মাণ, বিলাপের বুকফাটা ক্রন্দন, আল্লার আকাশভেদী আর্তনাদের সকরুণ আহজারি, এককথায় যেখানেই দেখেছেন মনুষ্যত্ব অপমানিত, মানবতা নিষ্প্রাণ, পশুশক্তি জাগ্রত ; সেখানেই ইসলামের মহান সূফীকুল অসহায় মানুষের মাঝে মানবতার ত্রাণকারী ও শান্তির দূত রূপে হাজির হয়ে আমরণ আপসহীনভাবে অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করে গেছেন। এইটাই ছিল তাঁদের জীবনের দ্বিতীয়াংশের অদ্বিতীয় কর্ম।

ইসলামের মহান সূফীকুল মানবসমাজকে বারবার সতর্ক করেছেন মানবসেবা ও সমাজসেবা সম্পর্কে। তাঁরা বারবার বলেছেন, মানুষ যেন কখনোও ওই কাজ করতে না যায় নিজেকে প্রস্তুত করার পূর্বে। তাঁরা বলেছেন মানুষ প্রথম নিজেকে প্রস্তুত করুক, পরে সে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দেবে। নচেৎ যোগ্য শিক্ষা দীক্ষা বা ট্রেনিং ব্যতীত সে নিজেও নষ্ট হবে, তার কাজও নষ্ট হবে, তাঁরা নিজেকে প্রস্তুত করা মানে বোঝাতে চেয়েছিলেন, সে যেন সবার আগে তার চরিত্রকে ঠিকভাবে গঠন করে। সাঁতার শেখার আগেই যেন সমুদ্রে ঝাঁপ না দেয়। তাঁদের মোদ্দা কথা ছিল, মানুষ সর্বপ্রথম মানবতার দীপ জ্বেলে অন্তরজগৎ কে আলোকিত করুক, পরে উৎপীড়িত অসহায় অন্ধকার মানব-সমাজে মানুষের সেবায় যথাযথভাবে আত্মনিয়োগ করুক। তাঁদের ধর্মের মধ্যে, তাঁদের জীবন সাধনায় তাঁরা এই দুটো কাজই লক্ষ্য করেছিলেন তাঁদের মহানজীবনের ব্রত হিসাবে।

মানবতার দীপটি জ্বালো তর চরিত্র মাঝ
ধর্মে যদি থাকে দুটো এই একটি কাজ।
তোমার সেবায় গড়ে তোলো তোমার পাশের সমাজ
ধর্মে যদি থাকে দুটো এই একটি কাজ।

সুতরাং ইসলামের মহান সূফীকুলের মূলকর্ম বা জীবন সাধনা ছিল সর্বশক্তিমান সর্ববিরাজিত আল্লাহকে পাওয়া, এবং মূল অবদান ছিল মর্ত্যের মুমূর্ষু-প্রায় মানবতাকে জীবন দান করা।

বিশ্বজোড়া মানবতার রুখে দিয়ে মৃত্যুবাণ
মরণমুখী মনুষ্যত্বে সঞ্চারিলে বীরের প্রাণ।

ইসলাম প্রচারে সাহাবী রূপে সূফীর ভূমিকা :

তখন স্বয়ং মহানবীজীর (সাঃ) সময়। ৬২৪-৬২৯ খ্রীঃ, মহানবীজী (সাঃ) বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শাসনকর্তাদের প্রতি ইসলামের আমন্ত্রণ পাঠাতে আরম্ভ করেছেন। যে সমস্ত সাহাবা মহানবীজীর (সাঃ) দূত রূপে বিভিন্ন স্থানে তবলিগের কাজে যেতেন, তাঁরা যেতেন অমুসলমানদের কাছে, বিপদ -সঙ্কুল স্থানে। তাদের কোন মুসলিম অধ্যুষিত স্থানে যেতে দেখছি না। সেদিনের সাহাবীগণ পরবর্তীকালের সূফীদের মতো জীবনবিপন্ন করে ইসলাম প্রচারে বা তবলিগে বের হতেন। পরবর্তীকালে ওই সব সাহাবীগণের উত্তরাধিকার রূপেই আমরা বর্তমান ইসলামের সূফীকূলকে দেখতে পাই বা পেলাম।

৬২৯ খ্রীস্টাব্দে ইসলামের যে 'মোতা' বা 'মউতা' যুদ্ধ, তার পেছনে আছে ইসলামের তবলিগ জামাত। মহানবীজী (সাঃ) একবার ১৫ জন ও অন্যবার ৭৫ জন সাহাবীকে ইসলাম-প্রচারে পাঠিয়েছিলেন। এবং তাঁদের সামান্য কয়েকজন ছাড়া সকলেই শহীদ হন। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই মহানবীজী (সাঃ) তখন তিন হাজার বাহিনী প্রেরণ করেন রোমানদের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধেই বিজয়ীবীর হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ মহানবীজী (সাঃ) কর্তৃক সাইফুল্লাহ বা আল্লার তরবারি উপাধি লাভ করেন।

বর্তমানকালের তবলিগের সঙ্গে সেদিনের তবলিগ জামাতের এই ব্যবধানটুকু লক্ষ্য করছি। তবে বর্তমান যুগের তবলিগ-জামাত অমুসলিমদের কাছে না গেলেও ভাল কাজই করছেন। এতেও সন্দেহ নেই।

মনীষী গিরিশচন্দ্র সেন সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআনের বঙ্গানুবাদ করেন। এবং তাঁর আর একটি অমর কীর্তি পারস্যের বহু জনপ্রিয় গ্রন্থ 'তাজকেরাতুল আউলিয়া'-র বঙ্গানুবাদ। তিনি বাংলা অনুবাদে এর নাম দিয়েছেন 'তাপসমালা'। পারস্য ভাষায় যার অর্থ আউলিয়া বা সূফীগণের স্মরণ। এখানে শতাধিক সূফীর জীবনী বা বাণী আলোচনা করা হয়েছে। বইটি পড়ে মনে হয় না অনুবাদ। এতই সুন্দর হয়েছে। যাঁরা সূফীকুল বা সূফীজগৎকে চিনতে ও বুঝতে চান, তাঁরা যেন একটিবার এই গ্রন্থটি পড়েন। এটা ইসলামি বাংলা সাহিত্যেরও একটি অমূল্য সম্পদ।

সূফীদের কথায় মানুষের উন্নতি আছে বিনয়ে, পুরস্কার সততায়, গৌরব খোদাভয়ে, মহত্ত্ব ধৈর্যে, শান্তি বৈরাগ্যে, সম্পদ আল্লাহ্ নির্ভরে।

সূফী মনের মর্মবাণী

(১) আমার বক্ষের 'পর আমিই তুমি
অমৃত অন্তরে তাই তোমাই চুমি
আমার বক্ষের 'পর তুমিই আমি
অমৃত অন্তরে তাই তোমাই নমি।

(২) তব দ্বারে যাই
বহু কিছু পাই,
সে পাওয়া, পেয়ে শেষে
তবু কেন জুঝি
পাই না মনের মতন
যে-রতন খুঁজি।

(৩) তোমার জগৎ নয় তোমাকেই চাই
সদাই সঙ্গেতে যেন তোমাকেই পাই।
তোমার নিকট হতে কোন কিছু নয়
তুমিই একান্তভাবে কাম্য নিশ্চয়।

তব দেওয়া কোন কিছু নহে মোর দাবি
তোমাকে পেতেই শুধু দাও মোরে চাবি।
(৪) বলো হে বিজয়ী বীর আমার সে আল্লাহ্
ধরিবে মিযান যেই জীবনের পাল্লা।
ঝঞ্ঝা বিপদে যেই তরণীর মাল্লা
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা শরীক আল্লাহ্।
মানবের তরে শুধু মানুষ তো হিল্লা
করিবে যাহাই করুক করিবে সে আল্লাহ্
প্রাণ যে পাথারে ভাসে সে সাগরে মাল্লা
'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ লা-শরীক আল্লাহ'।

সামান্য কাজেতে দেখি বাড়ে মোর কল্লা
সকল স্থানেতে যিনি নাহি তার হল্লা
বলো হে পুণ্যের দাঁড়ি ভারি হবে পাল্লা
'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' লা-শরীক আল্লাহ'।
(৫) বড়ই আপন জেনো পরোয়ারদেগার
বড়ই দুশমন জেনো নাফ্স্ আপনার।
দু'চোখ বুজিয়া তুমি দেখ নিরাকার
দেখিবে এমন দৃশ্য সবই একাকার।
বড়ই পরম বন্ধু পরোয়ারদেগার
বড়ই পরম শত্রু নাফ্স্ আপনার।
(৬) আল্লাহ্-আল্লাহ বলো বান্দা, মুখে আল্লাহ বলো
হর্-দমে আল্লার নাম নিতে কেন ভুলো।
(৭) দাও হে প্রাণের পটে প্রভাত কিরণ
দিয়েছ অমূল্য যেই মানব জীবন,
তোমার কিরণ দানে কর হে প্রভাত
জীবন গড়িতে দাও তোমার সাক্ষাৎ।
(৮) দেখি না তোমারে বিনা কোথাও ভূমি
আকাশ পাতাল মর্ত সবই যে তুমি,
ধরিব তোমারে ছেড়ে কাহার দুয়ার
আকাশ-পাতাল-মর্ত্য সবই যে তোমার।
কোথাও কাহারে যদি ধরিতেই হয়
ধরিব তোমারে আমি এ মোর প্রত্যয়।
(৯) যাদের প্রাণে ধর্ম শুধু অনুশাসনের অন্ধরব
ধর্ম তাদের দেয়নি ধরা দিয়েছে ধরা তারাই সব।
যাদের কাছে নাই ভেদাভেদ অনুষ্ঠানের আড়ম্বর
আর কোথাও কি ধর্ম আছে তাদের ধরাধর্ম-পর।

মনুষ্যত্বের মহান রূপই ধর্মে যাদের লক্ষ্যস্থল
সত্য জয়ী মরণজয়ী তারাই ধরার ধর্ম বল।

ধর্মে যদি স্বাদ পেল কেউ, সেই মহাপুরুষ সেই হৃদয়
এক ধর্মের দীক্ষা মাঝে সব ধর্মের সত্য জয়।

(১০) হৃদয় আমার সবার লাগি সকল স্বরূপ ধরে
যারাই আমার প্রেম করেছে তাদের ঘরে ঘরে।
পথপন্থা তাদের ব্যাপার তাতেই তারা তুমি
অনুষ্ঠানের অন্তরালে প্রেমেই আমি খুশি।
অনুশাসনের অন্ধকারে কতই বাছাবাছি
প্রেমই আমার ধর্ম জেনো প্রেমেই আমি আছি।

—কাব্যকানন

(১১) তুমি ও আমি

অন্তরতর ওগো অন্তরময়
তুমি-আমি দুই জন দুটি কেন রয়।
জলের তরঙ্গ কেন জলে খাড়া রয়
বুদ্-বুদ্ জলে যেন ভেসে নাহি বয়।
রহমান রহিম তুমি ওগো দয়াময়
তুমি-আমি দুই যেন দুটি নাহি রয়।
আছে দেহ আছে প্রাণ আছে লয় ক্ষয়
তুমি রবে তব গুণে একাকী অক্ষয়।
যা কিছু জগতে আছে সে ধ্বংসময়
তুমি শুধু বাকি রবে সর্ব সারময়।
মুক্ত রেখেছি মোর রিক্ত হৃদয়
তুমি-আমি দুই যেন দুটি নাহি রয়।

অসীম-অনন্ত তুমি ওগো দয়াময়—
তোমাতে মিলিলে মোরা সবাই অক্ষয়।
চলিতে চলিতে পথে জাগে যদি ভয়
জীবন সুদূরে তুমি করিও নির্ভয়।
অভয়-আশ্রয় দিও ওগো দয়াময়
পথিক পথেতে যেন ব্যর্থ নাহি হয়।
হৃদয় খনিতে মোর ওগো দয়াময়—
তুমি-আমি দুই যেন দুটি নাহি রয়।
নির্ভয়ে বলিতে দাও জাগিলে সংশয়
তুমি আমি দুই নই ওগো বিশ্বময়।
যত কিছু আছে মোর সব হোক লয়
তোমার মিলনে মোর হোক মহাজয়।
গফুর গফ্ফার তুমি ওগো দয়াময়
তুমি-আমি দুই যেন দুটি নাহি রয়।

—কাব্য কানন

কোরয়ান : ২ : ২৪৫, ২৫৫, ১৩ : ৩০, ২৬ : ১০২, ৫৫ : ২৬-২৭

(১২) **হৃদয়-সায়র**

হৃদয় সয়েরে মোর ভেসে ওঠো তুমি
চক্ষু জুড়াতে দাও প্রাণভরে চুমি।
মন্থন করিতে দিয়ে জীবন-বোধে
ননী রূপে ভেসে ওঠো জীবন-দুধে।
একবার এ-জীবনে প্রাণভরে চুমি
হৃদয়-সায়রে মোর ভেসে ওঠো তুমি।

সাগরে তিমির মতো তুমি দেখা দিয়ে
অতল সমুদ্র হতে পাড়ে তুলে নিয়ে,
নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে এসো বিরতিবিহীন
যেখানে কালের বুকে নাহি রাত-দিন।
জীবন-সাগরে মোর পবিত্র ভূমি
হৃদয়-সায়রে মোর ভেসে ওঠো তুমি।

এ মোর আত্মাতে আছ অন্তরে মিলে
নয়নে সাক্ষাৎ যোগ সামান্য দিলে
ধরণীতে ধন্য হবো তোমাকে দেখায়
প্রশান্তি মিলিবে ফের কবর গুহায়
দেহাতীত করে এই দেহের ভূমি
হৃদয়-সায়রে মোর ভেসে ওঠো তুমি।
বারে বারে ধরা দাও প্রাণভরে চুমি
হৃদয়-সায়রে মোর ভেসে ওঠো তুমি।

—কাব্যকানন

(১৩) **একটি ডাল**

তব সৃষ্টি নক্সে আল্লাহ্ তব নাম স্মরি
উঠেছি সুউচ্চ বৃক্ষে একটি ডাল ধরি।
এসেছি এককে দেখে একাকী চ'ড়ে
এবার দেখিও তুমি না যাই প'ড়ে।
ধরেছি একটি ডাল প্রাণপণে ক'ষে
দেখ আল্লাহ দয়া করে না পড়ি খ'সে।

দু'চোখে দেখিনি কিছু করি দৃষ্টিপাত
চারিদিকে দেখেছিনু—ঘনীভূত রাত।
দেখিলাম বহু ডাল বহু গাছপালা
তারাই তো প'ড়ে যায় ঝটিকা বেলা।
গভীর নিশীথ রাতে একাকী ব'সে
ধরেছি, দেখিও আল্লাহ না পড়ি খ'সে।

চড়িতে চড়িতে বৃক্ষে, এই পড়ি পড়ি
পড়িতে পড়িতে এনু এতদূর চড়ি।
যে-কথা অন্তরে জাগে শোনাবার মত
পড়িতে পড়িতে আমি রক্ষা পেনু কত।
ধরি নাই বহু ডাল এক ডালে বসে
ধরেছি একটি ডাল, না পড়ি খসে।
জীবন বিপন্নকালে অন্য ডাল ধরি'
কখনো জাগেনি চিন্তা তাকে রক্ষা করি।
এ জীবনে একটি ডালই ধরেছি সদা
এক ডালেই টিকি যেন হে মহান খোদা।

—কাব্যকানন

(১৪) ধরা দাও

তোমার পাতানো এই সংসারভূমি
বলেছ বৈরাগ্য নিয়ে ছেড়ো না তুমি।
আবার বলেছ তুমি ডুবো না সংসারে
সংসার সমুদ্রে তুমি রহিবে সাঁতারে।
সার্থক সুন্দর হয় তারই অভিযান—
যে-তরী নদীতে থাকে সদা বহমান।
তোমাকে করে না ছোট তোমার সংসার
সমুদ্রে তলিয়ে দেয় ষড়রিপুভার।
ছিঁড়িতে মিলন ডোর মহান খোদার
মোহান্ধ করে না যেন তোমার সংসার।

তব পথ কোন পথ সেই পথে নাও
সেই পথে চালিবারে মহাশক্তি দাও।
দেহ-মন প্রাণপাখী-সদা যেন ধায়
যে দিকে তুমিই শুধু অন্য কিছু নাই।
বিশ্বাসই যথেষ্ট নয় ধরিতে তোমায়
বিবেকে বুঝিতে দাও ন্যায় ও অন্যায়।
ধরিলে মিলিতে পারি যদি ধরা দাও
যদি তব দয়া গুণে কৃপা করে নাও।
ধরা দাও তুমি মোরে মম তপস্যায়
সংসারের নানা কাজে নানা সমস্যায়।
অনন্ত অসীম তুমি ওগো দয়াময়
মিলিতে মিশিতে দাও মহান হৃদয়।

—কাব্যকানন

(১৫) **খলিফা**

সকল ধর্মের প্রাণ আদি সত্য রূপ
শরীয়ত-তরীকত-মারিফতে তাসাউফ্
যে জন অক্ষম এই তাসাউফ-জ্ঞানে
ইসলামের তিক্ত হতে মিষ্ট নাহি জানে।
যে জন অক্ষম এই জীবন জিজ্ঞাসায়
পড়ে না তাহার মন প্রভু মহিমায়।
মানুষ আল্লার ভেদ তিনি ভেদ তার
তাই তো আদম হয় খলিফা খোদার।
করেছি মানব সৃষ্টি আমার আশ্বাস
মানুষ করিবে মোর গৌরব প্রকাশ।

মানুষ সবার উপর সব কিছু তার
বিকাশ ঘটিলে শুধু মনুষ্যত্ব আত্মার।
বিবেকের জয় যেথা আত্মার উত্থান
মানুষ ফেরেস্তা হতেও শ্রেষ্ঠ মহীয়ান।
দ্বারী হয়েও হও যদি মানুষ মহান
দেখিবে দুয়ারে তব দাতা দণ্ডায়মান।
বাড়ে যদি শক্তি তব বিশুদ্ধ আত্মার
জিজ্ঞাসা করিবে আল্লাহ্ কি চায় তোমার।
ঈমান-আমান সহ মোর দাস-দাসী
যে-রাখে আমার মান সেই তো বিশ্বাসী।

নিবিড় রহস্য-ঘেরা সূফী-আচরণ
আত্মার উন্নতি পথে শ্রেষ্ঠ বিচরণ।
সূফী মতে নাহি যেথা আত্মার বিকাশ
মনুষ্যজীবন তার শুধু পরিহাস।
দুর্লভ মানব জন্মে যার ইতিহাস—
প্রকৃতির কোলে সে যে প্রবৃত্তির দাস।
যে জন অক্ষম এই সূফী-সত্তজ্ঞানে
জীবনের তিক্ত হতে মিষ্ট নাহি জানে।
সম্মানের শীর্ষে তোলে অলিরে কোরআনে
সমগ্র জগৎ-জনে করেছে সাবধান।
আমার মহিমা যত করিতে প্রকাশ
করেছি মানব সৃষ্টি এই মোর আশ।

বিকাশ ঘটিলে শুধু মনুষ্য আত্মার
কত যে আপন তুমি দেখিবে আল্লার।

মানুষ আমার ভেদ আমি ভেদ তার
তাই তো মানুষ হয় খলিফা তেমার।
সযত্নে মানুষের করেছি বিকাশ
সে আমারে সগৌরবে করিবে প্রকাশ।
মানুষ আমার ভেদ আমি ভেদ তার
আমার সৃষ্টির বুকে খলিফা আমার।

—কাব্যকানন

কোরআন : ২ : ২৫, ৩০, ৮ : ১৪, ১০ : ৬২, ১৮ : ১০৭, ২৩ : ১, ৬২ : ১০, ৮৯ : ২৭-৩০।

একাদশ অধ্যায়
বাংলা সাহিত্যে পীর-মাহাত্ম্য গাথা

ইসলামের সূফীবাদ বা সূফীসমাজ সারা বিশ্বজুড়ে পরিচিত। শুধু পরিচিতই নয়, ইসলামের প্রকৃত প্রাণ বলতে ওই সমাজ। ইসলামের প্রকৃত প্রচার ও প্রসার বলতেও ওই সমাজ। কিন্তু পীর মাহাত্ম্যগাথা বলতে ইসলামি বাংলা সাহিত্যে যা দেখা যায়, ইসলামে তার ইতিহাস বড়ই সকরুণ। ওখানে লক্ষ্য করি সূফীসমাজ ইসলামকে যত উন্নত করেছে, পীর-গোত্র তত অবনমন ঘটিয়েছে। পীর মাহাত্ম্যগাথা লিখতে গিয়ে লেখকগণ এমনসব অদ্ভুত-আজগুবী কাহিনীর অবতারণা করেছেন। যা পড়লে মাথা হেঁট হয়ে যায়। ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ সংস্কারক মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ)-ও কিছু কিছু মোজেজা বা অলৌকিকতা বিশেষ বিশেষ ক্ষণে দেখিয়েছেন। কিন্তু তা বড়ই সীমিত। তিনি সব সময়ই নিজকে মানুষ রূপেই পরিচয় দিতে ভালবাসতেন। কর্মভিত্তিক জীবনকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। পরবর্তী তাঁর খোলাফায়ে রাশেদিন ও ওই একই পথ অবলম্বন করেছেন। তারও পরবর্তীকালে ইসলামের মহান সূফী অলি-আউলিয়া-দরবেশগণ বেশ কিছু কেরামত বা অলৌকিকতা দেখিয়েছেন। কিন্তু সেগুলো ছিল ইসলামের প্রচার ও প্রসারার্থেই। বড়ই দুর্ভাগ্যজনক, পীর-মাহাত্ম্য গাথাতে অধিকাংশ স্থানেই লক্ষ্য করি সারহীন, সত্তাহীন, সত্ত্বহীন, তত্ত্বহীন ও তথ্যহীন কতকগুলো বাগাড়ম্বরময় কাহিনী মাত্র। এরা ইসলামের কলঙ্ক।

পীর ফরিদুদ্দিন আত্তার
পাঞ্জা নামা

অনুবাদ : মৌলবী আব্দুল কাদের আহমদ
সন ১৩১১ সাল পৃ. ৪০

প্রাচীনকালে আমাদের দেশের সকল সমাজেই এমন কতকগুলো মানুষ থাকতেন, যাঁরা সর্বমানবের কল্যাণার্থে একজন কতকগুলো বাণী দিয়ে যেতেন, যেগুলো মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হত। পরে যেগুলো সমাজে প্রবাদ বাক্যের সম্মান লাভ করত। এই উপদেশগুলোর বহু শ্রেণীবিভাগ থাকত। যারা সমাজের সকল অধ্যায়কে পরিবেষ্টন করে থাকত। পীর ফরিদ ঐ রূপ একটি গ্রন্থ। পীর ফরিদের নাম আমাদের সমাজে বড়ই সুপরিচিত।

নমুনা :

ভয় : যে জন মণেতে সদা করে খোদাভয়
তারে দেখে ভয় পায় সকলে নিশ্চয়।

চারিটি বস্তু ক্ষুদ্র জেন না :

চারজন হয় জান বড়ই প্রধান
গোচরেতে বোধহয় বিন্দুর সমান।
শত্রু আর অগ্নি এই জান দুই জন
তৃতীয় বিমারী বাবা রাখহ স্মরণ।
চাহার আগে জ্ঞান যিনি দিয়েছে তোমায়
ইহাদিকে ক্ষুদ্র নাহি ভাবিহ কোথায়।

ইমানদার নেকবিবির কেচ্ছা

মুন্সী গরীবুল্লাহ

১৩২৬ সাল, ২৮ পৃ.

বিবি ফাতেমা ও কাঠুরিয়ার স্ত্রী :

এই পুঁথিতে কয়েকটি কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। প্রথম কাহিনী কাঠুরিয়ার স্ত্রী ও বিবি ফাতেমা। এখানে কাঠুরিয়ার স্ত্রীর কাছে বিবি ফাতেমাকে স্বামী খিদমতের সবক দেওয়া হয়েছে। পড়ে মনে হয় কাল্পনিক।

দেল রওশন বিবি ও পীর ফরিদ :

দেল রওশন বিবি মাতাল স্বামী খিদমতের জোরেই পীর ফরিদকে উপযুক্ত শিক্ষা দিল। এও কষ্টকল্পিত।

নেক বিবি ও আমির কামার :

নেক বিবি পেটের জ্বালায় আমির কামারের নিকট সাহায্য চাইলে, কামার তার দেহ চায়। নেক বিবি কথা দিয়ে সাহায্য নিল। পরে দেহ দানের সময় জেনার ভয়ে কাঁদতে থাকায় কামার তাকে মুক্তি দিল। এর পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাকে এমন শক্তি দান করেন, সে বিনা হাতুড়ীতে জ্বলন্ত লোহা হাতে ধরতে পারত।

এ সবই কল্পনাভিত্তিক বলে মনে হয়।

বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুঁথি

শ্রী হরিদাস

১৩৪৫ সাল, পৃ : ২২০

মুসলমানদের সত্যপীর ও হিন্দুদের সত্যনারায়ণ মূলে এক। আজ পল্লীবাংলাতে ঘরে ঘরে সত্যপীরের নাম শোনা যায়। সত্যপীরের দল দেখা যায়। অনেক গ্রামে এখনও নাকি সত্যপীরেব ঝাণ্ডাও দেখা যায়। সত্যপীর নাকি ওই ঝাণ্ডা দ্বারা মানুষকে আশীর্বাদ করতেন। তবে দিন দিন ওই সব পীর-পিরাণীদের প্রভাব কমে আসছে।

হিন্দু-মুসলমানের সত্য-নারায়ণ ও সত্যপীরে যে মিলটা দেখা যায় তা স্বাভাবিক। উভয় ধর্মের তীর্থযাত্রা, উপবাস, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, জন্ম-অনুষ্ঠান, মৃত্যু-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বহু মিল পাওয়া যায়। উভয় ধর্মে অসংখ্য মিল আছে। তবে আমরা মিলটা না খুঁজে গরমিল খুঁজি। তাই গরমিলটাই চোখে পড়ে।

ছহি বড় জঙ্গে শাহমাদার ও বড় পীরের লুকোচুরি

ছায়াদ আলি খোন্দকার

সন ১৩৩৪ সাল, পৃঃ ৫০

বাঙলা দেশের বহু পল্লীতে এখনো মাদার নাচ দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি মাদারতলাও চোখে পড়ে। দম্ মাদার একজন বড় সূফী ছিলেন। কিন্তু এঁদেরকে কেন্দ্র করে বহু অবান্তর কাহিনীও রচিত হয়েছে।

সত্যপীর পাঁচালি
দ্বিজ গুণনিধ
সন ১৩০১

সতী বিবির কেচ্ছা
মুন্সী আয়জদ্দিন আহমদ
১৩২১ সাল, পৃঃ ৪৪

সত্যপীর পাঁচালি
চন্দ্রকেতু পালা
লালমোহন
১২৭৫ সাল।

সত্যপীর পাঁচালি
শ্রীদয়াল
১৩২০ সাল

সত্যবিবির কেচ্ছা
মুন্সী আয়জদ্দিন
১৩২১ সাল, পৃঃ ৪৪

এই পুঁথিটিতে একটি জিনিস লক্ষ্য করার মতো, যদি কোন সতী নারী তার সতীত্ব রক্ষা করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হয়, তাহলে তার সতীত্ব আল্লাহই রক্ষা করেন।

সত্যপীর পাঁচালি—চন্দ্রকেতুপালা
লাল মোহন
সন ১২৫৭ সাল,

সত্যপীর পাঁচালি—শঙ্কর গুড়্যা পালা
শ্রীদয়াল
১৩২০ সাল

সত্যপীর পাঁচালি
মদনসুন্দর পালা
বল্লভ দাস
১৩২২ সাল

মানিক পীরের কেচ্ছা
মুন্সী মোহাম্মদ পিজিরুদ্দিন
১৩২৭ সাল, পৃ : ৩৮

মানিক পীরের জহুর নামা
জয়রদ্দি
১২২৪ সাল

মানিক পীরের জহুরনামা
লেখক অজ্ঞাত
১২২৭ সাল

মানিক পীরের জহুর নামা
লেখক অজ্ঞাত
১২২৯ সাল

হুকুম পীরের গীত
শঙ্কর
১২২৮ সাল

পীরের কালাম
হৃদয়রাম
১২২৭ সাল

ছহি মোর সেদনামা
মুন্সী আয়জদ্দিন আহাম্মদ
১৩২৩ সাল

পীর-মাহাত্ম্য গাথা : প্রসঙ্গ আলোচনা

সূফীসমাজ থেকে পীর-মাহাত্ম্য গাথাকে পৃথক করার সর্বাপেক্ষা যেটি বড় কারণ তা আচার্য সুকুমার সেন মশাইয়ের ভাষায়—কোন কোন রূপকথা কাহিনী পশ্চিমবঙ্গের কবিদের হাতে পীর-মাহাত্ম্য কাহিনীতে উন্নীত হয়েছিল। এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে, মুসলমানদের 'পীর মাহাত্ম্য' কাহিনী উভয় বঙ্গের উভয় সমাজের কবিদের হাতে রূপকথায় পরিণত হয়েছে।'

এ অধ্যায় আলোচনা করে যা দেখলাম, সবই প্রায় রূপকথায় পরিণত হয়েছে। সূফী-অলি আউলিয়া ও দরবেশগণের অলৌকিক কাহিনী অনেক আছে। পরবর্তীকালে কবিগণ ওই সমস্ত কাহিনীগুলোকে জোবড়া রঙ্গের ছোবড়া লাগিয়ে এমনভাবে ঢালাই করেছেন, যেখানে আর বাস্তবের বিন্দু নেই। এমনকি কবিকল্পনা অনেক সময় এমন মার্গে উঠেছে যে, স্বয়ং আল্লাই মুশকিলে পড়েছেন। এই সমস্ত কথা লেখা তো দূরের কথা, বলাটাও ইসলাম-বিরুদ্ধ।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি কেউ জঙ্গে শাহমাদার একবার পড়েন, তাহলে যদি তাঁর ইসলাম সম্পর্কে এতটুকুও জ্ঞানগরিমা থাকে, তাহলে তিনি কয়েকবার 'সুবহান-আল্লাহ্ ও আস্তাগফেরুল্লাহ' পড়বেন।

আবার অতি অল্প সংখ্যক কবিও লক্ষ্য করেছি, যাঁরা হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেরই কবি, যাঁরা সত্যভিত্তিক কিছু লিখেছেন। যা উভয় সমাজেরই শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। এই শ্রেণীর লেখাগুলো মানুষকে শ্রদ্ধাচারে ও মনুষ্যত্ব ও মানবতার জয়গানে অনুপ্রাণিত করেছে। এই লেখাগুলোর সামাজিক মর্যাদা কিছুটা আছে। তা অস্বীকার করা যাবে না।

এই অধ্যায়ে লক্ষ্য করার মতো বিষয়-রমণীগণ গতিপরায়ণা হলে কি অফুরন্ত মর্তবা লাভ করে, তা দেখার ও বলার মতো জিনিস। রমণীগণকে এই সবক দিতে দিতে কবিগণ ক্লান্ত হয়ে উঠেছেন। সেখানে স্বয়ং বিবি ফাতেমাও বাদ পড়েননি। কাঠুরিয়ার বিবির কাছে তাঁকেও শিক্ষা নিতে হল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়ে, এর বিপরীত দিকটা মোটেই লক্ষ্য করা গেল না। স্ত্রীদের কর্তব্য আছে স্বামীর প্রতি ঠিকই, কিন্তু স্বামীগণেরও তো দায়িত্ব আছে স্ত্রীগণের ওপর। কেননা পবিত্র কোরআন বলে—'একজন অন্যজনের পোশাক স্বরূপ। ২ : ১৮৭। পীর-মাহাত্ম্য গাথা অধ্যায়ে লেখকদের এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হয়েছে। নর-নারী সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য পাশাপাশি স্থান পেয়েছে।

এক যদি হয় গরীয়ান তবে অন্য সে গরীয়সী
এক যদি হয় মহীয়ান তবে অন্য সে মহীয়সী।

অন্য একটি বিশেষ জিনিসও এই অধ্যায়ে লক্ষ্য করলাম। বেশ কিছু হিন্দু-কবিও এই অধ্যায়ে কলম ধরেছেন। তাঁরা হিন্দু হলেও মুসলমান পীর-মাহাত্ম্য কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে দুটো জিনিসের পরিচয় তুলে ধরেছেন ভালভাবেই। প্রথমটি, হিন্দুদের দেবদেবীদের মাহাত্ম্য কাহিনীগুলোর বর্ণনাতে যে শ্রদ্ধার কলম ধরেছিলেন, ইসলামি অধ্যায়ে তা এতটুকুও মলিন হয়নি। বরং চরম আন্তরিকতায় তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়টি বর্ণনাভঙ্গি ও শব্দচয়ন। প্রয়োজনমতো প্রচুর ইসলামি শব্দ দ্বারা নিজদের রচনা সম্ভারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। তবে তাঁদের রচনাতে দেশজ শব্দও অনেক স্থান পেয়েছে। এবং মুসলমান নর-নারী সেগুলোকে সাদরে বরণ করেছে। কেননা তারা এই দেশেরই সন্তান। ওই শব্দগুলো তাদেরও।

ইসলামি বাংলা সাহিত্য বলতে নিছক কিছু মুসলমানের ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে শাস্ত্রকথা বা তত্ত্বকাহিনীই নয়, ইসলামি ভাবধারাকে কেন্দ্র করে, বহু লেখক, বহু কবি দ্বারা এ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। যদি কোন লেখা অনৈস্লামিক হয় এবং সেটা কোন সৈয়দ মুসলমানও লেখেন, তাহলেও সেটা ইসলামি (বাংলা) সাহিত্য নয়। পক্ষান্তরে যদি কোন লেখা কোন অমুসলমানও লেখেন এবং তা যদি ইসলামি ভাবধারাতে পূর্ণ হয়, তা ইসলামি (বাংলা) সাহিত্য। অর্থাৎ ইসলাম কোন সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর সম্প্রদায়গত বা গোষ্ঠীগত সম্পদ নয়। ইসলাম সর্বকালের সর্বদেশের সর্ব মানবের জন্য উন্মুক্ত দরবার। ওই দরবারের মালিক কেউই নয়, একমাত্র আল্লাহ্ এবং ওই দরবারটির শেষ সংস্কারক, শেষ প্রধান প্রচারক মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ)। তাঁর পরবর্তী সকলেই সহ বা উপপ্রচারক মাত্র।

দ্বাদশ অধ্যায়
বাংলা সাহিত্যে শাড়ি-জারি ও নাটগীত

শাড়ি, জারি ও নাট্যগীত সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের গবেষণাচার্য সুকুমার সেন বলেন—'বাঙলাদেশের পুরনো নাটগীত-রীতির বিশুদ্ধ লৌকিক রূপটি মুসলমান জনগণের মধ্যেই যথাসম্ভব অবিকৃত ছিল সেদিন পর্যন্ত। পুরাতন 'নাটুয়া'-র আধুনিক উত্তরাধিকারী 'নেটো' পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদেরই একচেটে ছিল। 'শাড়ি' (এখন যাকে 'সারি' বলা হয়) গান বিগত শতকের আগেই পশ্চিমবঙ্গ ছেড়েই পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। ইসলামি 'সারি' গানের একটি খাঁটি নিদর্শন উদ্ধৃত করছি।

আল্লার হুকুম ভাই সাহেব দুনিয়া ভরি
ওকে খোদার দোস্ত মহম্মদ করিল জারি।
দুনিয়াত হইল পয়দা ঈশা পেগাম্বর
ইঞ্জিল নামে যাহার কেতাব ফেরিঙ্গির আদর।
বহুত বহুত পেগাম্বর দুনিয়াতে পয়দা হৈল
আল্লার কুদরতে মক্কায় মহম্মদ জন্মিল।
ভেস্তে যদি যাইবে কোরানের কথা ধর
এক চিত্তে পাঁচ ওক্ত নেমাজ পড়।
ত্রিশ রোজা কর এক দিল এক-জানে
হরদমে আল্লার নাম জপ মনে মনে।
—ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী (১৩০১) পৃ: ১৩৫০-৫১।

ভাটিয়ালি দেহতত্ত্ব গানের নমুনা ঃ

ভবের বাজার ভেঙে গেল রে মন আমার
ও তুই ভবের ঘাটে কি করিলি রেপার।...
একা আলি একা যাবি ভোজের বাজি এ সংসার।
যদি করতে চাইস ফতে
তবে চল ধরমপথে
খোদাতাল্লার কুদরতে খএর হবে তোয় এবার।
ভুখারে দিও ভাত তিয়াইসে রে পানি
নেংটারে দিও বস্ত্র ভেস্তের নিশানি।

'জারি' পালাগান এখন পূর্ববঙ্গেই সীমিত। তবে কিছুকাল আগেও পশ্চিমবঙ্গেও এ গান অপরিচিত ছিল না। নমুনা

কারবালাতে যখন হোছেন খল খয়ে শহিদ হল
হোছেনের শির নিয়ে কাফের দামেস্কাবাদে এল।...
ছের নিএেত কাফের গেল নেজায় চড়িএগ
কারবালাতে হোসেনের ধড় থাকল পড়িএগ।...
কোথা হতে এসো তোমরা কোথা যাহ চলিয়া
দেখেছ কেউ আনাত্তে মোর বাবাজীকে ফিরিয়া।

সেদিনের নাটুয়া বা নেটো বা যাত্রা পালাগানের নমুনা :

মোনাইর ছওয়াল :

পালন করেন কোন মুরশিদ বল তাহা মোরে
কাছাড়িল কোন মুরশিদ মোর তরে মারে
কোন মুরশিদ জোটে ছোট হয়তো আমার
পাও তলে কোন মুরশিদ রহে কহ তত্ত্ব সার।

সাইজির জওয়াব :

মা মুরশিদ লালন-পালন তোমায় কৈল
সে মুরশিদ তব পিতা কাছাড়ে মারিল।
জোটের ছোট ছোট ভাই মুরশিদ তোমার
জমিন মুরশিদ পায়ের নীচে কৈনু সমাচার।

সেদিনের 'সারি' গান কতদূর জনপ্রিয় ছিল, কবি নজরুল কণ্ঠে তা প্রতিভাত হযে উঠেছে।

আবুবকর উসমান উমর আলি-হাইদর
দাঁড়ি যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
দাঁড়ি-মুখে সারি গান 'লা শরীক আল্লাহ্'।

আল্লাহ :

মানুষের তরে শুধু মানুষ তো হিল্লা
করিবে যাহাই করুক করিবে সে আল্লাহ্।
বলোহে, বিজয়ী বীর আমার সে আল্লাহ্—
ধরিবে 'মিযান' যেই জীবনের পাল্লা
ঝঞ্ঝা বিপদে যেই তরণীর মাল্লা
বলোহে মুমিন ভাই আমার সে আল্লাহ্।
দেহ তো দেখার লাগি নেপথ্যে হিল্লা
প্রাণ যে পাথারে ভাসে সে সাগরে মাল্লা—
'লা-ইলাহা ইল্‌লাল্‌াহ্ লা-শরীফ আল্লাহ'।
মোদের সাক্ষাৎ শুধু সরবেতে চেল্লা
সকল স্থানেতে যিনি নাহি তাঁর হল্লা,
লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্ লা-শরীক আল্লাহ্।

হও হে যাহাই হবে বালক কি বালিকা
হও হে যাহাই হবে সেবক্ কি সেবিকা,
হও হে যাহাই হবে যুবক কি যুবতী
মনেতে থাকে না যেন কোনদিন কম্‌তি,
হও হে যাহাই হবে পুরুষ কি মহিলা
বলো হে পুণ্যের দাঁড়ি ভারী হবে পাল্লা—
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা-শরীফ আল্লাহ্।

কোরআন—২ : ৫৫, ৬৫ : ৩, ১০১ : ৬।

সাহিত্য

যে সাহিত্য মেটাতে চায় আপাত মধু
ও-গুলো সৃষ্টি নয় অনাসৃষ্টি শুধু।
সজীব সাহিত্য সদা দুরন্ত-নদী
কাল হতে মহাকালে চলে নিরবধি।
খরস্রোত গতি তার নাহি মানে বাধা
এ-কূল ভাঙ্গিয়া গড়ে ও-কূল সদা।
জোয়ারে ভাঁটাতে দেয় সবুজ-সঙ্কেত।
দুদিনেই গড়ে উঠে শস্যাভরা খেত।
যে সমাজ নূতন চিন্তা করিয়াছে রদ
সে সমাজ নজরবন্দী শেওলাভরা নদ,
নিজ হাতে করে তারা নিজকে বরবাদ
বিধাতা স্বয়ং সেথা সাধে যেন বাদ,
রুই-কাতলার কোনদিন আর দেখা নাই
পচা জলে, পচা নদে পোঁকামাকড় ধায়।
সাহিত্যের শতগুণে গুণান্বিত দান—
আল্লার ঐশী বাণী পবিত্র কোরয়ান,
ভাবেতে ভাষাতে যাহা তুলনাবিহীন
সজীব সবুজ প্রাণ রবে চিরদিন।
এ-সাহিত্য বেগবান সদা ধাবমান
চিন্তায় চেতনায় যাহা চির বহমান।
শক্তি দাও মুস্‌লিমেরে হে মহান প্রভু—
কলমে কালিতে ভুল নাহি করে কভু,
রচিতে কালের খাতায় যা নবীন নিত্য
সমৃদ্ধি শান্তিতে তাই অমর-সাহিত্য।
—কাব্যকানন

শোক্‌র

দুই হাতে কত দিলে বলিতে না বলিতে
দুই পায়ে দিলে বল হাঁটিতে না হাঁটিতে।
দুই কানে দিলে শ্রুতি শুনিতে না শুনিতে
দুই চোখে দিলে শোভা দেখিতে না দেখিতে।
দিলে বল কলমেতে লিখিতে না লিখিতে
দিলে শিক্ষা দিল্‌-মাঝে শিখিতে না শিখিতে।
দিলে সাড়া নিজ হতে ডাকিতে না ডাকিতে
দিলে তুমি কত মাল সব কিছু বাকিতে
দিলে জ্ঞান দিলে বোধ বুঝিতে না বুঝিতে
দিলে দেখা দুর্দিনে খুঁজিতে না খুঁজিতে।

স্থলে জলে দিলে বল দরিয়াতে চলিতে
কত ঝড় ঝাপটাতে নাহি দিলে টলিতে।
অতীতের দিনগুলি আজও যাহা স্মরণে
জীবনের মহাক্ষণে ভুলিব কি মরণে!

প্রভাতে উঠিয়া দেখি ঘর ভরা আলো
রাতেতে কিছুই নাই সব দেখি কালো।
প্রভাতে জীবন পাই মহা কলরোলে
মরণের স্বাদ পাই রাতের কোলে।
প্রতিদিন বাঁচি আর প্রতিদিন মরি
মরিতে বাঁচিতে মাঝে তোমাকে স্মরি।
আমার পাপেতে রবে কোথাও সীমা
তোমার দয়াতে নাই কোন পরিসীমা।
রয়েছে জীবনে মোর শত পাপ জমা
তোমার দুয়ারে আছে লক্ষ-কোটি ক্ষমা।

সদাই শোকর করি ওগো রহমান
দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করো দোষে- ভরা প্রাণ।
ভুলে-ভরা এ জীবন ভ্রান্তি নাহি নিও
দয়া করে ক্ষমা করে রেহাই দিও। ২ : ২৮৬

—কাব্যকানন

লেখকের অন্যান্য বই

শাশ্বত ইসলাম এগারো খণ্ডে :

১।	কোরয়ান শরীফ—বঙ্গানুবাদ	৫০ টাকা
২।	কোরয়ান শরীফ—বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা (তফসির)	১০০ টাকা
৩।	কোরয়ানের নৈতিকতা—(তফসির)	৪৫ টাকা
৪।	চরিত্র ও সমাজ গঠনে কোরয়ান শরীফ (তফসির)	১৮০ টাকা
৫।	চরিত্র ও সমাজ গঠনে হাদিস শরীফ	১৪০ টাকা
৬।	ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ	১৫০ টাকা
৭।	ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি	৯০ টাকা
৮।	ইসলাম জগৎ ও সূফীসমাজ	
৯।	কাব্যকানন (ইসলামি কবিতামালা)	
১০-১১।	প্রকাশের পথে	

ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস সাত খণ্ডে :

প্রথম খণ্ড	মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)	১০০ টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড	হযরত আবু বকর (রাঃ)	৪০ টাকা
তৃতীয় খণ্ড	হযরত ওমর (রাঃ)	৪০ টাকা
চতুর্থ খণ্ড	হযরত ওসমান (রাঃ)	৪৫ টাকা
পঞ্চম খণ্ড	হযরত আলি (কঃ)	৪৫ টাকা
ষষ্ঠ খণ্ড	উমাইয়া খেলাফত	৬০ টাকা
সপ্তম খণ্ড	আব্বাসিয়া খেলাফত	